মানব সভ্যতার ধ্বংস কি আসন্ন ?

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

শরৎ পাবলিশিং হাউস
১৮/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ :
মহালয়া ১৩৭২
প্রকাশক :
সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮/এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রক :
শ্রীসরোজ কুমার রায়
শ্রীমুদ্রণালয়
১২, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রচ্ছদশিল্পী :
কুমার অজিত
বাঁধাই
ফেন্সী বাইণ্ডার্স

এই লেখকের

অঙ্গুষ্ঠ (কবিতা)
একটি ধানের শীষের উপরে
(জাপানী কবিতার অনুবাদ)
কার্ল স্যাণ্ডবার্গের একমুঠো (কবিতা)
হ্যামারশোল্ডের কবিতা
স্মৃতিতে সত্তায় (কবিতা)
হয়তো গোলাপ (কবিতা)
নতুন করে পাব বলে (স্মৃতি চিত্র)
আধুনিক বাংলা কবিতা ও দ্বন্দ্ববাদ
(আলোচনা)
কালব্যাধি ক্যানসার (বিজ্ঞান)
বৈষ্ণব কাব্যে প্রেম (আলোচনা)
হিরোসিমা (জাপানী কবিতার অনুবাদ)
ইজু নর্তকী (জাপানী গল্প)
ওগো দুখ জাগানিয়া (গীত সংকলন)
সৌন্দর্যতত্ত্ব (যন্ত্রস্থ)
নির্বাচিত কবিতা

শ্রদ্ধাভাজন

পান্নালাল দাসগুপ্তকে

যিনি

যাদের কিছু নেই,

তাদের কথা ভাবতে গিয়ে

সমস্ত মানুষের কথা ভেবেছেন।

ভূমিকা

কি করে এই বইখানি লিখতে সুরু করলাম, সেই কথা বলেই ভূমিকাটা সুরু করি। সুরুটা হল, এই বইয়ের প্রকাশক, শরৎ পাবলিসিং হাউসের শ্রীমান দুলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে একটি টেলিফোন পেয়ে। বইখানির বিষয়-বস্তুর উল্লেখ করে, তিনি এই বইটি লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। শুনেই মনে হল, এ বই লেখার যোগ্যতা আমার আছে কি? নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, পদার্থবিজ্ঞানী, রাসায়নিক, পুষ্টি ও খাদ্য বিশারদ, এইরকম কারুর বা কয়েকজনের একযোগে এ বই লেখার কাজে হাত দেয়া উচিত—এ কথাও দুলালবাবুকে বললাম। কিন্তু তাঁর বক্তব্য হল যে আমি যেহেতু, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ক্যানসার থেকে সুরু করে, জাপানীকবিতা, বৈষ্ণবসাহিত্য. মার্কসিয় দ্বন্দ্ববাদ, সৌন্দর্যতত্ত্ব, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে কলম চালিয়েছি তাই এ রকম একজন জ্যাক—অফ—অল ট্রেডকেই তিনি লিখতে বলেছেন। আমার নিজের দিক থেকেও একটা কথা ছিল। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে, এই বইয়ের বিষয়বস্তু, একটি প্রশ্নের আকারে যেন আমাকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছিল। আমার নিজের জন্যই দরকার ছিল একটা উত্তর খোঁজা। সেই খোঁজাই নিয়েছে এই বইয়ের রূপ।

একদিন পৃথিবী সৃষ্টি হল। আবার তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক তেমনিই ঘটবে মানুষ ও তার সভ্যতার। এই চিন্তা পৃথিবীর সর্বদেশে প্রাচীন মানুষের মনে উঁকি দিয়েছে। সবদেশের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে এর ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে যেন আর একটি আশাময় ইঙ্গিতও দেখি "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী", তার চলাও ধ্বংস বা শেষ হয়ে যাবে না। ওদের চলা চিরকালের। তারই অনুরণন যেন শুনি রবীন্দ্রনাথের সেই বাণীর মধ্যে। যেখানে তিনি বলছেন,

"জয় হক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।"

পুরাণের কথা উঠল বলে, নেহাৎই দুচার কথায় একটু বলি। আঠারোটি পুরানের উল্লেখ আছে এগুলি হল, (১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) শিব,

(৫) ভাগবত, (৬) নারদ, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বরাহ, (১৩) স্কন্দ, (১৪) বামন, (১৫) কূর্ম (১৬) মৎস, (১৭) গরুড়, (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

সব পুরাণগুলিতে কিন্তু পৃথিবীর উৎপত্তি ও ধ্বংসের কথা নেই। প্রাচীনত্বও সবগুলির সমান নয়। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সৃষ্টি ও ধ্বংস সম্পর্কে পুরাণে বিভিন্ন মনুর কথা আছে। এক একটি কাল, এক একজন মনুর অধিকৃত। এক মনুর কাল শেষ হয়ে, পরবর্ত্তি মনুর কালের সূচনাকে বলে মন্বন্তর। মন্বন্তরকে বলা যায়, এক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে, আর এক সভ্যতার অভ্যুদয়। চলতি সভ্যতার পক্ষে মন্বন্তর পরম দুর্দিন। মনন্তরে সভ্যতা, প্রাণী, মানুষ সব নষ্ট হয়ে যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১ থেকে ৯৩ অধ্যায়কে দেবীমাহাত্ম্য অংশ বা চণ্ডী বলে। এখানে আছে,

"সাবর্ণি সূর্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ,
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম"

অর্থাৎ, সূর্যতনয় সাবর্ণি, যিনি হলেন অষ্টম মনু, তাঁর উৎপত্তি সম্পর্কে সবিস্তারে বলছি; তা শোন।

শাস্ত্রে মনুর সংখ্যা চৌদ্দ। এঁরা হলেন, (১) স্বায়ম্ভুব—ইনি ব্রহ্মার মানষপুত্র, (২) স্বারোচিষ প্রথম মনুর নাতি এঁর বাবা প্রিয়ব্রত, (৩) ঔত্তম-প্রিয়ব্রতর নাতি ও উত্তমের পুত্র, (৪) তামস—প্রিয়ব্রতর ছেলে, (৫) রৈবত—প্রিয়ব্রতর ছেলে, (৬) চাক্ষুষ—অঙ্গরাজের ছেলে, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি (১১) ধর্মসাবর্ণি, (১২) রুদ্রসাবর্ণি, (১৩) দেবসাবর্ণি, (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। শাস্ত্র অনুসারে, এই চৌদ্দজন মনু একের পর এক জগতের অধিশ্বর হন। বর্ত্তমান কাল বৈবস্বত মনুর কাল। আবার ব্রহ্মার যে দিন ও রাত্রি, এর এক একটিকে এক একটি কল্প বলে। এর মধ্যে দিনরূপ কল্পে সৃষ্টি, আর রাত্রি রূপ কল্পে প্রলয় হয়।

প্রলয়ের অবস্থাটা কিরকম হয়, তারও বর্ণনা আমরা পুরাণে পাই। যেমন মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অংশেই আছে, যে যখন ব্রহ্মার দিবাবসান হল, তখন সারা বিশ্বপৃথিবী, এক কারণবারির সমুদ্রে পরিণত হল। সেই সমুদ্রের উপর, অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করে, ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন। বিষ্ণুর নাভির উপরের নাভিপদ্মে, পদ্মাসনে বসে, ব্রহ্মা।

এ বইটি বিজ্ঞানেরই বই। সেই দৃষ্টি নিয়ে যদি আমরা উপরোক্ত ছবিটির দিকে তাকাই, তা হলে এর প্রতীকগুলির দিকেই দৃষ্টিটা পড়ে। যেমন কারণবারি কথাটি। যেখান থেকে আবার নতুন সৃষ্টির উদ্ভব হবে, সেই জল, সৃষ্টির কারণ বলেই তার প্রতীকধর্মী নামটা হল কারণবারি। নাগ বা সাপ, সৃষ্টি ও বীর্যের প্রতীক। এটা ফ্রয়েড ও ইয়ুংয়ের আমলের মত ছিল। এই প্রতীক, সেই অনন্তনাগের উপর, তাই বিষ্ণু শুয়ে। বিষ্ণু পালন কর্তা। প্রলয় হবার পর তাঁর আর কাজ রইল না। তখন তিনি নিষ্ক্রিয়। আবার বিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রতীক। প্রলয়ে এই বিশ্ব হয়ে উঠল, তমোগুণের আধার। তাই বিষ্ণু তখন কাজ না থাকায় যোগনিদ্রা মগ্ন হলেন। যে দেবী শক্তির প্রতীক, তিনিই আবার এখানে যোগমায়া। সেই মায়ার প্রভাবেই বিষ্ণুর যোগনিদ্রা।

প্রলয়ের মধ্যে কি অবস্থা, শান্ত ছিল? তাও নয়। বিষ্ণুর কানের যে ময়লা, তা থেকে মধু আর কৈটভ নামে দুজন অসুর উৎপন্ন হল। তারা ব্রহ্মাকেই হত্যা করতে উদ্যত হল। ব্রহ্মা তখন আত্মরক্ষার জন্য বিষ্ণুকে জাগাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু যোগনিদ্রা গ্রস্থ বিষ্ণুকে জাগানো সম্ভব হল না। তখন ব্রহ্মাকেই যোগনিদ্রারূপা শক্তিকে স্তবে তুষ্ট করে তবে বিষ্ণুকে জাগান সম্ভব হল। যোগনিদ্রা ভঙ্গ হতে বিষ্ণু, মধু ও কৈটভের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বিনষ্ট করলেন। মধু আর কৈটভকে বিনষ্ট করার সময়, তাদের মেদে, কারণসমুদ্র পূর্ণ হল। এই থেকেই কারণ সমুদ্রে নতুন সৃষ্টির উদ্ভব হল। আর মেদেপূর্ণ বলে পৃথিবীর নাম হল মেদিনী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে প্রলয় ও প্রলয়ের পর নবজীবনের, নতুন পৃথিবীর উন্মেষের কথা বললাম। এ বইয়ের পরবর্ত্তি অধ্যায়ে, পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম উন্মেষ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের মতামতও আলোচনা করা হয়েছে। পাঠক দেখতে পাবেন যে, পুরাণের স্রষ্টার উর্বরা কল্পনা যেন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অনন্ত মননশক্তির কাছাকাছি। অবশ্য একে ঠিক ততটুকুই গুরুত্ব দিতে হবে, বিজ্ঞানের দিক থেকে ঠিক যতটুকু দেয়া দরকার। এ কথা বলছি এই কারণে যে, যা প্রাচীন, অতীত, তার সম্পর্কে আমরা একটু মোহগ্রস্থ হয়ে পড়ি। কিন্তু বিজ্ঞানে কোন রকমের মোহেরই স্থান নেই।

পুরাণের মত অনুসারে সৃষ্টি আর ধ্বংস বা প্রলয় চলেছে একসঙ্গে। প্রলয়ের আবার রকমফেরও আছে যেমন, নিত্য; নৈমিত্তিক; প্রাকৃত; আত্যন্তিক।

প্রত্যেকদিন আমাদের যা কিছু, তার যে ক্ষয় ক্ষতি, তাকেই বলে নিত্য প্রলয়। এমনকি আমরা যখন ঘুমিয়ে আছি, সেই সুপ্ত অবস্থাকেও বলে নিত্যপ্রলয়। কিন্তু যখন প্রাণী সুপ্ত অবস্থায় নিত্যপ্রলয়ে অবলুপ্ত, তখনও তার অস্তিত্ব বাসনারূপে রয়েছে। যা থেকে সে আবার জেগে ওঠে। নৈমিত্তিক বলা হয়, যে প্রলয়কে, তার কথা উপরের প্যারাগ্রাফে আলোচনা করেছি। নৈমিত্তিক প্রলয়ের পরে, কি ভাবে আবার সৃষ্টি হয় তাও বলেছি। পুরাণের মতে এ প্রলয়ের কালে বিশ্ব প্রজাপতি ব্রহ্মার অন্তর্গত হয়ে থাকে। প্রাকৃত প্রলয় আরো অনেক ব্যাপকতর। হিরণ্যগর্ভের বিনাশে যখন বিশ্বের তত্ত্বগুলিও বিনষ্ট হয়, সেই অবস্থাকে বলে প্রাকৃত প্রলয়। এই প্রলয়ে নিখিল প্রপঞ্চও বিনষ্ট হয়। এ প্রলয়কে মহাপ্রলয়ও বলা হয়। আর যোগীর ব্রহ্মে যে স্থিতি, তাই হল আত্যন্তিক প্রলয়।

পুরাণে বিবিধ রকমের যে প্রলয়ের চিন্তা আছে, তার মধ্যে একটা জিনিস নজরে পড়ে। এ চিন্তায় প্রলয় হবার পরও সব কিছু যেন থেমে বা শেষ হয়ে যায় না। যত বড়দেরেরই হক না প্রলয়, তারপর আবার নতুন করে হবে বিশ্বপ্রপঞ্চের উদ্ভব। এই ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ তাই বলছেন,

"দেবশূন্য কালশূন্য জ্যোতিশূন্য মহাশূন্য পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান
সহসা আনন্দ সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া
আদিদেব খুলিলা নয়ান।
মুখ হতে বাহিরিল বাণী
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।"

আনন্দ ব্রহ্মার চারটি মুখে যে বাণী দিল, তাই সৃষ্টির অগ্রদূত। আবার যেদিন জীবন হবে প্রলয়ে অবলুপ্ত, তারও কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ,

"বিধাতা কি আবার বলবেন সাধনা করতে
যুগ যুগান্তর ধরে—
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন
"কথা কও, কথা কও"
"বলবেন "বলো, তুমি সুন্দর"
বলবেন " বলো, আমি ভালবাসি ?"

ভারতীয় শাস্ত্রপুরাণ এ সবের যা বক্তব্য তা রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়ে যাই। তার সৌন্দর্যটুকু আমাদের মুগ্ধ করে। মুগ্ধ হই যখন দেখি সৃষ্টির মূলে আনন্দ। তার মধ্যে সৌন্দর্য আর ভালবাসা। বিজ্ঞানের চোখে এ সত্য যাচাই করে নেবার চেষ্টা করেছি এই বইয়ে।

এই প্রসঙ্গে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থ বিজ্ঞানীর একটি কথা মনে পড়ছে। একটি সমীকরণ সম্পর্কে তাঁকে আর একজন পদার্থবিজ্ঞানী বলেছিলেন যে ওটি সত্য হিসাবে দাঁড়াবে কিনা? তাতে তিনি বললেন, যে তাতে কি আসে যায়? সমীকরণটি কি সুন্দর নয়? সেটাইতো যথেষ্ট। ভারতীয় চিন্তায় এ সৌন্দর্য-টুকু, আমাদের দেখতে হবে বিজ্ঞানের আলোয়। সেই চেষ্টাই করেছি এই বইখানিতে।

কোরানেও প্রলয়ের কথা আছে। কোরানের একটি অধ্যায় আছে, যার নাম সুরা ইনফিতার। সুরা কথাটির মানে হল অধ্যায়, আর ইনফিতার মানে হল বিস্ফোরণ। এর ভিতরকার বক্তব্য হল, আসমান বিদীর্ণ হয়ে সব তারা খসে পড়বে। সকলের সমাধি খুলে যাবে। সমুদ্র উত্তাবে উচ্ছ্বসিত হবে। সেদিন প্রত্যেকে জানতে পারবে, কার জীবনে কি সঞ্চয়। যে প্রভু তোমাকে সৃজন করেছেন, তাঁর কাছ থেকে কিসে তোমাকে দূরে রাখবে? তাঁর রক্ষীরা সর্বদা নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁর হিসাবের রক্ষকদের কাছে কিছুই অজানা থাকে না। যারা পুণ্যবান, সৎকাজ যারা করেছে, তারা থাকবে পরম আহ্লাদে। আর দোজখে যাবে কু ব্যক্তিরা। রোজ কিয়ামত এলে সেদিন হবে এ বিচার। পাপীরা আর লুকাতে পারবে না দোজখে গিয়ে প্রবেশ করবে। রোজ কিয়ামত, শেষ বিচারের দিন। সেদিন একমাত্র খোদার হুকুম ছাড়া কিছুই জারি থাকবে না। সেদিন সব মানুষকে হতে হবে একা, নিঃসহায়।

প্রলয়ের পর কারণ সলিলে যেমন বিশ্ব পূর্ণ হয়ে গেল, এর সঙ্গে কিছুটা মিল আছে, এ রকমের কাহিনী, বাইবেলেও নোহর কাহিনীতে পাই। তখন প্রশ্ন জাগে কেন? কি করে এলো এই মিল? বিজ্ঞানের দিক থেকে প্রশ্নটা দেখা দরকার। এ রকম বিবিধ পৌরাণিক কাহিনীর বৈজ্ঞানিক বিচার বইয়ের মধ্যে করার চেষ্টা করেছি। তাই ভূমিকায় সে প্রসঙ্গে বিষদ কথন অনাবশ্যক।

বইখানিতে বিজ্ঞানভিত্তিক দিক থেকে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, সব জায়গা থেকেই মালমশলা সমান ভাবে গ্রহণ করে, তার ফ্রিটবেক

বা ব্যবহার করা হয়েছে বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে। কারণ আমার মনে হয় প্রয়াত স্নো সাহেব যে "টু কালচারের" কথা বলেছিলেন, সেই টু কালচার আজ ওয়ান হিউম্যান কাল্চার হবার পথে। তবে কি আবার সব মানুষ সব কিছু জানবে? না। একটি বিষয়ে অনেক জানার থাকবে বলে, অনেক বিষয়ে জানা হয়ে উঠবে না, ঠিকই। তবু এক দলের সঙ্গে আর এক দলের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল, যখনই একদল গেল বি-এ পড়তে ও অপর দল গেল বি-এস-সি পড়তে; এটা হয়ত বন্ধ হবে। তখন একটি ফ্যাকালটি, বিজ্ঞান ফ্যাকালটির আওতায় আসবে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস থেকে সুরু করে, রসায়ন পদার্থবিদ্যা, সব। এ কথাটা এখানে বললাম শুধু এই কারণে যে, সেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীই এ বইখানির দৃষ্টিভঙ্গী।

এ বইখানি লিখতে বসে, অনেক লেখা পড়ার মাধ্যমে যখন মাল মশলা সংগ্রহ করেছি, তখন আমি নিজেও আশা নিরাশার দোলায় দুলেছি। কোন বইখানি পড়ে মনে হয়েছে, যে মানব সভ্যতার সামনে তো আর কোন আশা ভরষা নেই! আবার অন্য একটি বই পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে যে, না এত হতাশ হবার তো কিছু নেই। এই দোলাচল শুধু আমারই ছিল না, এ দ্বিধা মানব সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই। আরো মনে হয়েছে যে বেশী লোক, এ চিন্তায় অংশ গ্রহণ করলে তাতে মানব সমাজের ভাল হত। এই বিষয়ে লেখা পড়া করতে গিয়ে আরো একটি জিনিস দেখলাম। তা আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের দৈন্য। আমার এ রচনার বিষয়বস্তুর কাছাকাছি বিষয়ে, লেখা ইংরাজি ও অন্য ইউরোপীয় ভাষায় রয়েছে। সেই জায়গায় ভারতীয় ভাষায় এ রকম বই কোথায়? আমার মতে এ দীনতা, ভারতীয় ভাষা বা ভারতীয় সাহিত্যিকদের নয়। এ দীনতা ভারতীয় পাঠকের। তাঁরা থান ইটের ওজন ও সাইজের উপন্যাস পড়তে ও কিনে উপহার দিতে রাজি। কিন্তু মানবজাতীর আসন্ন সমস্যা নিয়ে লেখা কোন বই পড়তে রাজি হবেন না।

মনের যে দোলাচলের কথা বললাম, ক্রমশঃ আরো মাল মশলা সংগ্রহ করতে করতে যখন এই বইটি লেখা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন যেন দেখলাম মনে হতাশার বদলে একটা আশা। মনে হল এখনি অবিলম্বে যদি আমরা পূর্ণতম সহযোগীতা ও ভালবাসা নিয়ে কাজ সুরু করি, তা হলে আশা আছে। এ কথাটা ভূমিকাতেও বলা প্রয়োজন।

ধন্যবাদ দিতে গিয়ে, প্রথমে মনে পড়ছে, অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ সরকারকে ; ইনি কি করেছেন, তা আমিই জানলাম, সেই ভাল। বন্ধুবর সরিৎশেখর মজুমদার ও শুদ্ধসত্ত্ব বসুর উৎসাহ, আমাকে এই বই লিখতে সাহস দিয়েছে। পরিশেষে প্রকাশক দুলাল চট্টোপাধ্যায় ; ভদ্র, নম্র, কৃতবিদ্য, সদাহাস্যময় এ মানুষটিকে ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সাধারণ প্রকাশকদের তুলনায়, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে ইনি কত ভিন্ন।

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

মানব সভ্যতার ধ্বংস কি আসন্ন ?

এ পৃথিবী মহাকাশ যান

মানব সভ্যতার অবসন্ন যে গোধূলি আমরা কি আজ সেইখানে? যা কিছু দেখছি, তা কি সেই গোধূলির আলোতে? এই প্রশ্ন বর্ত্তমান যুগের সব চেয়ে বড় প্রশ্ন। ঠিক এই প্রশ্নই হয়ত এর আগেও জিজ্ঞাসিত হয়েছে। কিন্তু আজ এই জিজ্ঞাসা অনেক বেশী বাস্তব কেন? সেই কথাই বলি।

যখন দর্পণ ছিল না। তখন স্থির জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে, মানুষ নিজেকে চিনেছে। তারপর দর্পণে দেখে, সে পরিচয় আর একটু গভীর হল। তারপর দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য সব কিছুর স্বচ্ছতায়, সব কিছুর আলোতে মানুষ নিজেকে দেখেছে, নিজেকে জেনেছে, ক্রমশ আরো বেশী করে। সেই জানাতেই আজ এ প্রশ্ন অনেক বেশী বাস্তব হয়ে উঠেছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে আমেরিকার দূত হিসাবে স্বনামধন্য এডেলাই ষ্টিভেনশন আমাদের এই পৃথিবীকে স্পেস-সিপ বা মহাকাশ যান বলে বর্ণনা করেছিলেন। কথাটা উপর উপর বলা নয়। নিঃশ্বাসের বাতাস থেকে শুরু করে জল, খাদ্য সব কিছুই মহাকাশ যানে যেমন সীমাবদ্ধ তেমনিই আমাদের এই পৃথিবীতে মহাজাগতিক সমগ্রতায় যদি আমাদের এই পৃথিবীকে দেখি, তা হলে দেখা যায় মহাকাশে সূর্যের চারিধারে পৃথিবী পরিক্রমা রত। পরিমণ্ডলে যে বাতাস রয়েছে, তা থেকে সুরু করে, পৃথিবীর আবহমণ্ডলে, কি সাগরে কি নদ, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণীতে কি মাটির তলায় যে জল আছে, পৃথিবীর ভিতরের সমস্ত ধাতব পদার্থ, সব, সবকিছুই সীমিত পরিমাণে।

এই সীমাবদ্ধ সম্পদ সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী নামের মহাকাশ যানে চড়ে, কিছু জীবিত উদ্ভিদও প্রাণী পরিক্রমা করে চলেছে। আজকের বিজ্ঞান এই কথাটিই আমাদের ভাল করে বুঝতে শিখিয়েছে।

এই প্রাণী আর উদ্ভিদ বিভিন্ন দিক থেকে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। মোটের উপর প্রকৃতির নিয়মে প্রাণী, উদ্ভিদ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সমস্ত বস্তুর মধ্যে একটা পারস্পরিক সামঞ্জস্য চলে এসেছে। এই সামঞ্জস্য ছিল বলেই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণী ও উদ্ভিদ বেঁচে রয়েছে। এক কথায়, পৃথিবীতে প্রাণ রয়েছে। কথাটা যখন উঠল, তখন এর একটু বিষদ আলোচনা করা যাক।

ধরা যাক সেই সময়ের কথা, যখন সূর্য থেকে অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃহস্পতি, শনি, বুধ, পৃথিবী, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহগুলির জন্ম হয়েছে। কোটি কোটি বছর আগের সেই পৃথিবীর চেহারা আর অবস্থাটা কি ছিল ?

সূর্যের চারিধারে যে গ্রহগুলি, যার মধ্যে পৃথিবীও একটি, তাদের সৃষ্টি কি ভাবে হল, এ সম্পর্কে একাধিক থিয়োরি ও মতবাদ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি হল এই, যে আমাদের সূর্যের কাছে হয়ত আর একটি সূর্য, যার আয়তন ও মাধ্যাকর্ষণের টান এত বেশী ছিল, যে তা সূর্যের অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিভিন্ন আয়তনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি থেকে শনি, বৃহস্পতি, বুধ, পৃথিবী, মঙ্গল, এই সব গ্রহগুলির উদ্ভব হয়েছে। এই থিয়োরীর পক্ষে একটা বড় সমর্থন পাওয়া যায় এই থেকে, যে সেই কারণেই সূর্যের প্রতিটি গ্রহ ঘুরছে একই দিক থেকে, আর তাদের সূর্যের চারিদিকে আবর্তনের যে সমতল, তাও সূর্যের কাছাকাছি।

তা ছাড়াও আর একটা দিক আছে। স্পেক্ট্রোস্কোপের সাহায্যে সূর্যের আলোর বর্ণগুলিকে অনুশীলন করে দেখা গেছে যে আমাদের পৃথিবী যে সব মৌলিক পদার্থ দিয়ে গঠিত, সেইগুলি সূর্যেও আছে।

স্বাভাবিক ভাবে কিন্তু সূর্যের ভিতরে এতগুলি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ, বিশেষ করে যে গুলির আনবিক গুরুত্ব বেশী, সে গুলি থাকার কথা নয়। এর কারণ, সূর্যের উত্তাপ, জায়গা বিশেষে পাঁচ হাজার, দশ হাজার কি বিশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হতে পারে। কি মারাত্মক উত্তাপ! আমরা জানি ফুটন্ত জলের উত্তাপ মাত্র একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

মনে প্রশ্ন জাগা খুবই স্বাভাবিক যে সূর্য এই অসামান্য উত্তাপ কি ভাবে সৃষ্টি করে ? আমরা হাইড্রোজেন বোমার কথা শুনেছি। সূর্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত এমনি বহু হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটছে। যখন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটে, তখন মৌলিক পদার্থের মধ্যে সব চেয়ে হালকা, হাইড্রোজেনের দুটি দুটি অনু, অপেক্ষাকৃত আনবিক ভার বিশিষ্ট একটি হিলিয়ামের অনুতে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে হালকা মৌলিক পদার্থ গুলি থেকেই ক্রমশঃ আনবিক ভার বেশী; এরকম মৌলিক পদার্থগুলির উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং এই একটু আগে যে বলেছে যে স্পেক্ট্রোস্কোপ দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে আমাদের পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলিই সূর্যে রয়েছে, তা থেকে বৈজ্ঞানিকরা

মনে করেন যে আমাদের সূর্য অতি প্রাচীণ। একসময়ে এটি ঠাণ্ডা হয়ে, আনবিক গুরু মৌলিক পদার্থগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর কোন নতুন ও অজানা ধরনের সৌঃ ঘটনায় আমাদের এই সূর্য আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই নতুন সক্রিয়তায় আমাদের পৃথিবী ও গ্রহ উপগ্রহ গুলি, আমাদের এই সৌরজগতে সৃষ্টি হয়েছে। সেই কথাই একটু আগে বলেছি।

যাই হক, এবার ফিরে আসি, সেই সময়ের কথায়, যখন আমাদের এই পৃথিবী সবেমাত্র তৈরি হয়েছে। এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন পৃথিবীর জন্ম হল, তখন পৃথিবী অসম্ভব গরম ছিল। এ উত্তাপ সূর্যের গায়ের উত্তাপের সমান। সূর্যের মধ্যে যেমন চলে তেমনি আনবিক ভাঙ্গা গড়া ও তার ফলে, তাপ ও আনবিক শক্তি বিকিরণ চলছিল। কিন্তু পৃথিবী সূর্যের তুলনায় হাজার হাজার গুণ ছোট। তাই সেই সময়কার উত্তপ্ত পৃথিবী ক্রমশঃ তাপ বিকিরণ করতে করতে ঠাণ্ডা হতে লাগল। এ সময়টাও কম নয়। হাজার-হাজার, লক্ষ লক্ষ বছর। অবশ্য আমাদের সূর্যের আয়তনের তুলনায় এ সময়টুকু কিছুই নয়। তাই পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে, আমরা তার কোলে বিচরণ করার উপযুক্ত হলেও, সূর্য এখনও তেমনি উত্তপ্ত থেকে আমাদের তাপ, আলো দিয়ে যাচ্ছে। আর ভাগ্যিস তাই দিচ্ছে। তাই আমরা আছি।

সৌর বিবর্ত্তনে, সূর্য ও তার গ্রহ উপগ্রহের আয়তনটাও বড় কথা। যেমন সূর্যের আয়তন যদি আরো ছোট হত, তা হলে সূর্যের আলো ও উত্তাপ এত দিনে শেষ হয়ে যেত। আবার বড় হলে উত্তাপ ও আলো এত বেশী হত যে তার ফলে, পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবই হত না।

আমাদের পৃথিবীর দেহের আয়তন খানিও একেবারে খাপে খাপে সঠিক এর ফলে অনেক কিছুই সম্ভব হয়েছে। অন্য কথা আলোচনা না করে একটি কথায় আসছি। পৃথিবী যদি আয়তনে ছোট হত, তা হলে তার মাধ্যাকর্ষণ অনেক কম হত। ফলে পৃথিবীর আবহাওয়াতে যে বায়বিয় গ্যাস অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রয়েছে, তা মহাকাশে পালিয়ে যেত। আরো অনেক বেশী হালকা বলে, এ গ্যাস দুটির আরো আগে পালাত হাইড্রোজেন গ্যাস। হাইড্রোজেন গ্যাস পৃথিবীর আবহাওয়াতে ছিল প্রচুর পরিমানে। তখন উত্তপ্ত পৃথিবীতে আনবিক বিকিরণ ছিল প্রচুর। অক্সিজেনও হাইড্রোজেন সেই বিকিরণে জলীয়

বাষ্পে পরিণত হল জলীয় বাষ্প জল হতে পারছিল না, কারণ পৃথিবী তখন ভীষণ গরম। সেই গরমটা ঠাণ্ডা হতেই লেগে গেল কয়েক হাজার বছর।

লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার বছর যে বলছি, তার সঠিক হিসাবে নেই। গ্রহ, তারাদের আয়তন, বিকিরণ, এ সব থেকে একটা মোটামুটি হিসাব বড় জোর করা চলে।

পৃথিবীর কথায় ফিরে আসি সেই সময়কার পৃথিবী, যে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে সুরু করেছে ধীরে ধীরে বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী শ্রীমতী র‍্যাচেল কারসনের একখানি বই The Sea Around Us এ পৃথিবী যখন ঠাণ্ডা হতে সুরু করেছে, সেই সময়কার একটি অপূর্ব বর্ণনা আছে। উত্তপ্ত পৃথিবীর আবহাওয়াতে জমে থাকা জলীয় বাষ্পের কথা বলেছি। আমাদের চা খাবার কেটলির নল থেকে যে জলীয় বাষ্প বার হচ্ছে তা জমলে যেমন কয়েক চামচ মাত্র জল হবে, এই পৃথিবীর বাষ্প কিন্তু ছিল লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টন। কত শত কোটি, তার হিসাব করা শক্ত।

পৃথিবী যথোপযুক্ত ঠাণ্ডা হতে এই বিশাল পরিমান জলীয় বাষ্প, পৃথিবীর আবহলোকে মেঘের মত জমতে লাগল। আমাদের কালবৈশাখী কি বর্ষার মেঘ যেমন কিছুক্ষণের মধ্যেই জমা হওয়ার কাজটা সেরে নিতে পারে; সে যুগের পৃথিবীর সেই সুবিশাল প্রথম মেঘ, জমতে লাগল বছরের পর বছর ধরে। কত বছর যে, তাও কেউ সঠিক হিসাব করতে পারবে না।

সারা পৃথিবীর আবহলোকের সর্বত্র এই মহামেঘ জমা হল। পৃথিবীতে এ-রকম মেঘ সঞ্চার, পৃথিবীর কোন কালিদাস কোনদিন দেখেন নি। এমনকি কল্পনাও করতেও পারবেন না। বৈজ্ঞানিকরা তাই এর গুণগত দিকটা কল্পনা করার চেষ্টা না করে শুধু পরিমানগত দিকটা নিয়েই গণিতচর্চার চেষ্টা করেছেন। সেটাও খুব সাপটা ভাবে। এই কথাগুলি থেকে, সেই মহামেঘের পরিমান কিছুটা আন্দাজ করা যাবে।

মেঘ তো জমল। তারপর? মেঘের পর বৃষ্টি। মেঘ জমতে লাগল আর এদিকে উত্তাপও কম হতে লাগল। তারপর যখন তাপ আর মেঘ জমা হওয়া রাসায়নিক দিক থেকে একটা বিশিষ্ট সমানুপাতে পৌছল তখন সুরু হল বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি! বাইবেলের নোহর সকল বৃষ্টি আর প্লাবনের বর্ণনা আছে। সদাপ্রভু নোহর জাহাজটিকে মাত্র বাঁচিয়ে, আর সব কিছু ধ্বংস করবার জন্য

চল্লিশ দিন ক্রমাগত বৃষ্টি দিলেন। কিন্তু পৃথিবীর সেই প্রথম বৃষ্টি তার তুলনায় বাইবেলে বর্ণিত বৃষ্টি সমুদ্রের কাছে একটি শিশির বিন্দুর মত নগণ্য।

পৃথিবীর সেই প্রথম বৃষ্টি হতে লাগল তো লাগল। দিন, মাস বছর শুধু বৃষ্টি, বৃষ্টি, আর বৃষ্টি। সে বৃষ্টি থামতে জানে না। সে বৃষ্টির মাঝখানে কোন বোদ নেই, কোন ছুটি, ছাটা, থামা, এ সবের বালাই নেই। শুধু ক্লান্তিহীন বর্ষণ। চলেছে তো চলেছেই।

যে পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই বিরাট বর্ষণ চলছিল, তার খবরটাও একবার নেয়া দরকার। ক্রিকেট বলের মত পৃথিবীপৃষ্ঠ চকচকে প্লেন ছিল না মোটেই। আগেই বলেছি, পৃথিবীটা কত গরম ছিল। গরম অবস্থায় গা ও ভিতরটা যে গলানো সীসার মত পাতলা তরল ছিল। প্রথমে জমে শক্ত হতে স্বরু করল তার বাইরেটা। ভিতরটা দীর্ঘকাল ধরে তরল রইল। এমন কি আজও ভিতরটায় তরল পদার্থ রয়েছে,এটা দেখা যায়, যখন কোন আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। সেই প্রাচীন কালের পৃথিবীতে ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ঘটত অনবরত। এর ফলে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন জায়গায় বিরাট উঁচু উঁচু পাহাড়, আবার কোন কোন জায়গায় গভীর খাদের সৃষ্টি হল। আর এই ভাঙাগড়া চলতেই থাকল।

এই সময় সেই মহা পরিবর্ষণ স্বরু হল। যে বর্ষণের কথা বলছি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে এই মহাবর্ষণে উঁচু যে জায়গা হল পাহাড়-পর্বত, তাদের বুক থেকে নদী নামল। সেই সব নদীর খাতে জল যেতে যেতে— বছরের পর বছর ধরে ক্রমাগত—পাকাপোক্ত ভাবে নদ নদীগুলির এক একটা গভীর গতিপথ তৈরি হল। অবশ্য বর্ষণের উপর নির্ভর করে নদীর গতিপথ পালটে যেতে লাগল মাঝে মাঝে। যেমন তা আজও হচ্ছে আমরা দেখতে পাই।

সেই বর্ষণে উঁচু জায়গা থেকে মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে ও তার সঙ্গে মাটির ভিতরে মিশে থাকা, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ও বিভিন্ন ধরণের লবণ, নতুন তৈরি হওয়া নদীগুলির জলে দ্রবীভূত হয়ে চলতে লাগল। আজকালও যেমন অতি বর্ষণে নদী কূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। তখনকার সে মহাবর্ষণে, প্লাবন একটা স্বাভাবিক, আনুষঙ্গিক ব্যাপার ছিল। এই প্লাবনের ফলে, অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে পলি ও রাসায়নিক বস্তুগুলি পড়ে-পড়ে, পড়ে-পড়ে জমি তৈরী হল।

এই জমিতেই আমরা দেখব যে পরবর্ত্তি যুগে গাছপালা জন্মান সম্ভব হল। কথাটা এইজন্য বলছি, যে আমরা ক্রমশঃ দেখব, যে প্রকৃতির কাজ কর্মে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য না থাকলেও কোথায় যেন একটা সামঞ্জস্য আছে। আমরা দেখব যে আমরা সভ্য মানুষরা, অনেক সময় না বুঝে এই সামঞ্জস্য নষ্ট করে ফেলি। তার ফলে মানুষ এমন কি মানব সভ্যতাও বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।

আবার আলোচনার মূল ধারায় ফিরে আসি। বলেছি যে উঁচু উঁচু পাহাড় যেমন তৈরি হয়েছিল, তেমনি বিশাল বিশাল খাদও তৈরি হয়েছিল। এই মহাবর্ষার জল যখন এই খাদগুলোকে ভর্তি করল তখন সেখানে তৈরি হল সমুদ্র। সমুদ্রের কথায় এইখানে একটা কথা বলে নি। আমরা যে নুন পাতে খাই তা তৈরি হয় সমুদ্রের জল থেকে। সমুদ্রের জল যদি সেই প্রাথমিক মহাবর্ষণের জলই হয়, তা হলে সমুদ্রের জলের লবণের ভাগটা এত বেশী হল কি করে?

যখন সেই মহাবর্ষণ শেষ হয়ে গেল, তার পরও লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের আয়তন বিশাল। এই বিশাল আয়তক্ষেত্র থেকে লক্ষ লক্ষ টন জল প্রতি মুহূর্তে উবে গেছে। যার ফলে আবার নতুন মেঘের সৃষ্টি হয়েছে। আর সমুদ্রের জলে লবণ গাঢ় হয়ে উঠেছে। এই দুটি কাজেই আবার প্রকৃতির সামঞ্জস্য দেখা যায়।

আমাদের শরীরের রক্তে লবণের অসমোটিক চাপ যতটা, সমুদ্রের জলও ততটাই। পরে আমরা দেখব যে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল নদী-গুলি মোহনায়, যেখানে নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেখানকার অপেক্ষাকৃত স্থির জলে।

শুধু মেঘ নয়, জলীয় বাষ্প ও জল প্রচুর পরিমাণে থাকার ফলে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। সেই প্রাণই বিবর্ত্তনে ক্রমে মানব সভ্যতা পর্যন্ত এসেছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির আনুকূল্য থাকাতেই মানব সভ্যতার বিকাশ। এ থেকে মনে করা যেতে পারে যে প্রকৃতিকে ও তার নিয়মগুলি জেনে আর তার সাহায্য নিয়েই আমাদের বাঁচা সম্ভব। এ আলোচনা এই গ্রন্থে আমাদের অনেকবারই উঠবে।

যাই হক পৃথিবীর বিবর্ত্তনে সেই যে মহাবর্ষণের কথা বলেছিলাম, তার পরের কথায় আসা যাক। সেই যে বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। একদিন তারও শেষ হল।

সেই বৃষ্টিই সাগর, মহাসাগর, পর্বতমালা, নদী, উপনদী, উপত্যকা, অধিত্যকা, দেশ, মহাদেশ সব কিছুর যে ভূগোল তা তৈরি করল। অবশ্য লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার সে ভূগোল আর বর্তমান ভূগোলে অনেক তফাৎ। আর সে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না। এ আর এক তফাৎ।

পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কি করে হল, তার একটু আলোচনা করে নেয়া যাক। মানব সভ্যতা বিপন্ন কি না, এই প্রশ্নের আলোচনা করতে বসে, আমরা পৃথিবীর উৎপত্তির কাল থেকেই প্রায় বলতে সুরু করাতে কারো মনে হতে পারে, যে এত পূর্ব কথন মূল প্রসঙ্গের পক্ষে হয়ত অবান্তর। কিন্তু তা নয় এই কারণে: বর্তমান লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম মূল কথা হল এই যে, যদি সভ্যতা বিপন্ন হয়ে থাকে, তবে তার প্রধান কারণ হল, প্রকৃতির যে নিয়মে প্রাণের কি সভ্যতার উদ্ভব হয়েছে তাদের না বোঝা।

প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণ—সভ্যতা তো দূর অস্ত—খুব একটা সহজ ও স্বাভাবিক কিছু নয়। উত্তাপের কথাই ধরি। জীবন বলতে যা বুঝি, তা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপের কাছাকাছি বেঁচে থাকতে পারে। অথচ মহাবিশ্বে এই উত্তাপেরই কি ভীষণ তারতম্য। উত্তাপহীনতার দিক থেকে—২৭৩° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বরফ জমার ২৭৩ ডিগ্রি নিচে। এই হল নিম্নতম তাপ। এই তাপহীনতার কাছাকাছি এলেই পরমাণুগুলির ভিতরের ইলেকট্রন, প্রোটনগুলি পযন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়। তার ফলে কোন মৌলিক পদার্থের কোন চরিত্রই আর বজায় থাকে না।

আবার অন্যদিকে? মহাবিশ্বের যে সূর্যগুলি আছে তাদের ভিতরের উত্তাপ পনেরো, বিশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সে যে কি অসাধারণ উত্তাপ, সেটা বোঝা যায় শুধু এই কথায় যে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে জল ফুটতে সুরু করে। উত্তাপ কয়েক হাজার ডিগ্রিতে পৌছলে কোন মৌলিক পদার্থই আর থাকে না। তাদের পরমাণুগুলি পর্যন্ত ভেঙ্গে যেতে থাকে। কিম্বা বলতে পারা যায়, পরমাণু ভেঙ্গেই সেই শক্তি ওইরকম অচিন্তনীয় উত্তাপে পরিণত হয়েছে।

মহাবিশ্ব উত্তাপের দিক থেকে যেমন জীবনের বিপরীত অন্য ব্যাপারেও তাই। যেমন বলা যায়, প্রায় একশোর কাছাকাছি যে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ আছে, তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি যেমন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, অঙ্গারবা কার্বন,

নাইট্রোজেন, প্রধানতঃ ও খুব সীমিত পরিমাণে গন্ধক, লৌহ, তামা, ফসফরাস ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলি কেবল জীবন্ত বস্তুর ব্যবহারে লাগে।

এই সব মৌলিক পদার্থগুলির সঠিক বিন্যাস, যা আমাদের এই পৃথিবীর বিবর্তনের মাধ্যমে ঘটেছে, তা না ঘটলে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হতে পারত না। শুধু একটি উদাহরণ দি। জল। বেশী কষ্ট করে বুঝতে হয় না, যে জল প্রাণের পক্ষে কত অপরিহার্য।

এই পৃথিবীটা যদি আর একটু ছোট হত, তা হলে অন্য মৌলিক পদার্থের সঙ্গে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থে একীভূত হবার আগেই হাইড্রোজেন মহাকাশে উধাও হয়ে যেত। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রকৃতি তা হতে দেয় নি। পৃথিবীতে তাই দেখি যে হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেন জল নামক একটি যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করলে, এটি আবার প্রাণ সৃষ্টির পক্ষে এমনই একটি অনবদ্য পদার্থ, যে এর কোন তুল্য বিশ্বের অজস্র যৌগিক পদার্থের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। জলের এই অসাধারণ যোগ্যতা নিয়ে অনেক কথাই বলা যায়. সব কথা এখানে বলাও সম্ভব নয়। তবু সংক্ষেপে দু চার কথা বলি।

আগেই বলেছি, প্রাণ টিকে থাকতে পারে এমন অবস্থায় যেখানে উত্তাপের ইতর বিশেষ বেশী হয় না। জলের এই ধর্মটি আছে। তা উত্তাপের খুব বেশী কম-বেশী হতে দেয় না। এদিক থেকে জল অনেকটা থারমোফ্ল্যাস্কের মত। উত্তাপ চলাচলকে বাধা দেয়। জিনিসটা কি করে হয় তাই বলি। সমপরিমাণ জলকে তাতাতে যে পরিমাণ উত্তাপ দরকার হয় তা খুব বেশী। আবার ঠাণ্ডা করতেও তাই, অন্য যে কোন তরল পদার্থের তুলনায় জলের এই উত্তাপ ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশী। এজন্য আমাদের প্রকৃতি রাজ্যে যখন জলের উদ্ভব হল, তখনই প্রাণের আগমন সম্ভাবনায়ও সূচনা হল। তাই দেখি প্রত্যেকটি জীবন্ত বস্তুর অভ্যন্তরীণ পরিবেশে জল আছে বলে তাদের বাঁচা সম্ভব হয়েছে।

জলের আর একটি গুণ হল, এই যে তার চরম ঘনত্ব, জমাট বেঁধে বরফ হওয়া অবস্থায় নয়, তা তরল অবস্থায় ৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। সেজন্য দেখি যে বরফ ডুবে না গিয়ে জলে ভাসে। এই কারণে মাছ কি অন্য প্রাণী, যে সময়ে হ্রদ কি পুকুরের জলের উপরের অংশটা ঠাণ্ডায় জমে যায়, তখন নিচে তরল থাকাতে সেখানের প্রাণীকুল বেঁচে যায়। পৃথিবীতে যদি জলের বিকল্প হিসাবে আমাদের প্রকৃতি অন্য কিছু তৈরি করত, তা হলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় কোন প্রাণ

আর অবশিষ্ট থাকত না। এদিক থেকে দেখতে গেলে জলই প্রাণকে রক্ষা করে চলেছে। বিশেষ করে সেই তুষার যুগে যখন সব কিছু বরফে ঢেকে গিয়েছিল, তখন জমে যাওয়া কঠিন বরফের স্তরের নিচের জলে জীবন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল।

এগুলি ছাড়াও জলের আরো কিছু কিছু গুণ আছে। এগুলি হল, জলে প্রায় সব কিছু দ্রবীভূত হতে পারে। এত অসাধারণ দ্রবণ ক্ষমতার জন্য প্রাণীও উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য যে যে জিনিস চাই, জল সে সবগুলিকে দ্রবীভূত করে এনে হাজির করছে। দ্রবণ ক্ষমতার জন্যই জল বিভিন্ন যৌগিক পদার্থকেও আয়নিত করতে পারে। এরই ফলে প্রয়োজন মত প্রাণী ও উদ্ভিদ জলের সাহায্যে শরীরে গ্রহণ ও বর্জন করে নিজেদের প্রাণের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে।

জলের গুণাগুণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিনাস পলিং প্রমুখ বিরাট রাসায়নিকরা আরো কয়েকটি কথা বলেছেন। তাঁরা বলছেন যে রাসায়নিক দিক থেকে গণনা করলে জলের জমে যাওয়া ও ফোটা হয় যথাক্রমে ০° ডিগ্রি ও ১০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে। গণনা অনুসারে এ দুটিরই আরো অনেক নিম্ন উত্তাপে থাকা উচিত ছিল। এদিক থেকে বলা যায় জল বে-আইনি ভাবেই একটু বেশী উত্তাপে জমে ও ফোটে। আর ঠিক এই পর্যায়ের উত্তাপই জীবনের পক্ষে উপযুক্ত।

এই সব দেখলে যেন মনে হয় পৃথিবী প্রাণের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলেই যেন প্রকৃতি এখানে যেন এখানে প্রাণের উপযুক্ত মাধ্যমও সৃজন করলে। সেই মাধ্যম জল। তাই এটা খুব আশ্চর্য নয়, যে পৃথিবীতে জলের প্রাচুর্য এত। কথায় বলে তিন ভাগ জল, আর এক ভাগ স্থল। তাই আমরা দেখেছি যে যখন সেই মহাবর্ষণ চলতে লাগল তা চলতেই লাগল। আর পৃথিবীর প্রথম প্রাণ দেখা দিল এই জলে।

এবার আমরা পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করছি। যে জলে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয় তাকে বিখ্যাত প্রাণীবিদ ও প্রজাতীতাত্ত্বিক হলডেন বলেছেন—Primordial Soup কথাটি অর্থবহ। কারণ যে জলে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব, তা যে পাতিত, পরিশ্রুত জল নয় এ কথা বলাই বাহুল্য। এ জলের কথা আমরা আগেই বলেছি যে এর বিবিধ লাবণিক গাঢ়তা বর্ত্তমানে সমুদ্রের জলেরই কাছাকাছি ছিল। একবারে

মাঝ সমুদ্র, যেখানে জল সর্বদা চঞ্চল, সেখানে প্রাণের উদ্ভব ঘটে নি। অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিবেশ যেখানে, অর্থাৎ নদী মোহানা অঞ্চলের স্থির জলে প্রাণের বিকাশ ঘটল। তাও অতি ধীরে ধীরে।

কি থেকে এ প্রাণ এলো? আমরা আগে কার্বন বা অঙ্গার, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ও অক্সিজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থের মিলনে যে যৌগিক পদার্থগুলি উৎপন্ন হয়, তাদের কথা কিছু বলেছি। প্রাণের উদ্ভবের জন্য যাকে আমরা বলি জৈব রাসায়নিক পদার্থ, তাই আবশ্যক। জৈব রাসায়নিক বস্তু বলতে বোঝায় যে সব বস্তুতে কার্বন বা অঙ্গার আছে।

বিখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ওপেরিনের একখানি বই আছে। যার নাম, Orgin of Life. অনেকে এই বই খানিকে চার্লস ডারউইনের Orgin of Specis এর মত সারা বিশ্বের এক সাড়া জাগানো বই বলে দেখেছেন। এই বিষয় বস্তুর উপর তারপর অনেক কাজ হলেও এই বইখানির মূল বক্তব্য এখনও ম্লান হয়ে যায় নি। এখানে সে বইখানিরও সাহায্য নিচ্ছি।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকের মতে প্রাথমিক পৃথিবীর তাপে সেই কোটি কোটি বছর আগেকার, পৃথিবীতে আসা সূর্যালোকের প্রভাবে কার্বন ও হাইড্রোজেনের মিলনে সংগঠিত কোন কোন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হল। আবার কারো মতে কার্বন ও অক্সিজেনের মিলনে প্রথমে কাবন-ডাই-অক্সাইড নামক যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। তারপর তার সঙ্গে নাইট্রোজেনের মিলন ঘটার ফলে প্রাণীর শরীরে যে ইউরিয়া তৈরি হয়ে নিষ্কাষিত হয়ে যায়, তাই তৈরী হয়। জীবদেহের গঠনের প্রধান উপাদান হল প্রোটিন। হাজার হাজার কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় প্রোটিনের অনু। এতবড় অণু তৈরী করতে হলে তার উপযুক্ত ফ্যাক্টরিরও প্রয়োজন। আজ সভ্য মানুষের হাতে কত বড় বড় কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি আছে। রসায়ণ শাস্ত্রের জ্ঞানও তো রয়েছে। তবু আজও মানুষ রসায়নাগারে কোন প্রোটিন তৈরি করতে পারল কই? এটা পারলে তো খাদ্য সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। প্রকৃতি এ সমস্যার সমাধান করলে কি করে? এইখানেই এনজাইম বা বাংলায় যাকে বলে অনুঘটক, তাদের কথা আসে।

একটা বিশাল দরজা, একটি ছোট চাবি দিয়েই খোলা যায়। অনুঘটকের কাজ কতকটা এই চাবির মতই। যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়ত সহজে হতে

চায় না, কি যা হতে অজস্র সময় লেগে যায় যেমন করে আপনি ভেঙে পড়ে দরজাটা খুলবে তার জন্য যদি অপেক্ষায় থাকি, তা হলে তো অনন্তকালই প্রায় অপেক্ষা করতে হতে পারে: কিন্তু চাবি এক সেকেণ্ডে সেই দরজা যেমন খোলে, অনুঘটকও তেমনি। তথাকথিত প্রজাতীসূচক জিন, কিম্বা প্রাণ উদ্ভবের প্রথম পর্যায়ের সেই ভাইরাস, নিজেদেরই তাগিদে অণুঘটক তৈরী করে। বৈজ্ঞানিকরা অনেকে মনে করেন, প্রকৃতির রাজ্যে একবার যখন ইউরিয়ার মত অণু গড়ে তোলা সম্ভব হল, তখন সময় যথেষ্ট পেলে ভাইরাস বা জিনের মত অণু গড়ে তোলা সম্ভব। প্রকৃতির তো আর কোন সময়ের অভাব ছিল না। লক্ষ লক্ষ বছর সময় তার হাতে। দীর্ঘ সময়ের বহুবিধ ভাঙ্গা গড়ায়, একদিন প্রকৃতির পক্ষে সেই হলডেন কথিত Primal Soup এ জিন বা ভাইরাসের মত, প্রথম জীবন্ত বস্তুর কাছাকাছি বস্তুর উদ্ভব হল। ক্রমে এই বস্তুগুলি বিবর্ত্তনের মাধ্যমে আত্মসৃজন, যাকে ইংরাজি বৈজ্ঞানিক ভাষায় Self duplication বলে, তাই করতে সক্ষম হল। এর প্রতিটি ধাপ আমাদের জানা নেই। কেন না রসায়ণাগারে এখনও আমরা ভাইরাস বা জিন তৈরি করতে পারি নি তবু এর কাছাকাছি এসে পৌছেছি বৈ কি।

এটাতো জীববিজ্ঞানের বই নয়, আমাদের জীববিজ্ঞানের ততটুকুই প্রয়োজন, যেটুকু আমাদের মানব সভ্যতা ও তার বর্ত্তমান সঙ্কটকে বুঝতে সাহায্য করবে। যেমন ধরা যাক অণুঘটকের কথা। প্রকৃতি অণুঘটকের মাধ্যমে এমন জিনিস পেল, যা অতি লঘু আয়াসে, শুধু তাই কেন, বলা যায়, অতি লঘুহস্তেই বহু ও সুদূরপ্রসারী ক্রিয়া কাণ্ড করে ফেলছে। সেই জায়গায় আমরা, জ্ঞানদর্পী সভ্য মানুষরা যা কিছুই করছি, তা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হয়ে যাচ্ছে। আর সেই বহু আরম্ভের যান্ত্রিক ধাক্কাটা লাগছে আমাদের নিজেদের গায়ে, আমাদের সভ্যতার গায়ে। আবার জীববিজ্ঞানের কথায় ফিরে আসি।

প্রকৃতির একটি বড় নিয়ম হল বিবর্ত্তন। এ পৃথিবীর জল, মাটি সব কি ভাবে বিবর্তিত হল তা আমরা খুব সংক্ষেপে হলেও একটু আলোচনা করেছি বিষদভাবে। ঠিক অনুরূপ। কিন্তু হয়ত আরো দ্রুত গতিতে বিবর্ত্তন চলল জীবের জগতে। কারণ জীবের মধ্যে রয়েছে অণুঘটকের মত চাবি কাঠি। জীব অনেক নরম স্বভাবের, যাকে ইংরাজিতে বলে (delicate)। এর ফলে মহাকাশ থেকে আসা, কসমিক ইত্যাদি মহাজাগতিক রশ্মি, বহু পরিবর্ত্তন ও

বিবর্তনের সূচনা করে থাকতে পারে। এই রশ্মিগুলির কাজ অনেক সময় তথাকথিত মিউটেশান বা বিপরিণতির পথেও নিয়ে যেতে পারে। এ পথেও দ্রুত বিবর্তনই হতে পারে অনেক সময়।

পৃথিবীর প্রথম প্রাণ বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে যেতে প্রাণী ও উদ্ভিদ এই দুটি একেবারে আলাদা রাস্তা বেছে নিল। আলাদা রাস্তা বিবর্তনের মাধ্যমে যে ঘটল তার কারণ কিন্তু একটিই, তা হল খাদ্য সংগ্রহের উপায়ের ভিন্নতা গাছ, পালা, অর্থাৎ উদ্ভিদ জগৎ এমনভাবে বিবর্তিত হল যে তারা একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। মাটিতে যে রসায়নিক বস্তু আছে, শিকড়ের সাহায্যে তাই টেনে নিয়ে ও বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড পাতার সাহায্যে নিয়ে, তারপর পাতায় যে নয়নাভিরাম সবুজ রংয়ের ক্লোরোফিল আছে, তাতে সূর্যের আলোয় খাদ্য তৈরি করে নিতে পারে। আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড যখন গ্রহণ করে, তখন অক্সিজেন ছাড়ে। যে অক্সিজেনটা আবহাওয়াতে জমা হয়। এই প্রসঙ্গে আবার আমরা ফিরে আসব। এখন প্রাণীদের কথা বলি।

প্রাণীদের যে ভাবে বিবর্তন ঘটল তাতে তাদের এক জায়গায় বসে খাদ্য সংগ্রহের উপায় হল না। তাই তাদের এক জায়গা থেকে, অন্য জায়গায় গিয়ে খাদ্য পেতে হয়। এর ফলে তারা দ্রুত গমনের উপযুক্ত, পরভোজী ও সুযোগ সন্ধানী হয়ে উঠল। এই গুণগুলিই বিবর্তনে একদিন মানুষের বুদ্ধিমত্তার আকারও পেয়েছে। বিপরীত দিকে বিবর্তনের ফলে, প্রাণীদের কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে অক্সিজেন ছাড়ার বদলে এর উল্টোটাই প্রাণীরা করে। অর্থাৎ তারা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়ে একেই আমরা বলি শ্বাস প্রশ্বাস।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে প্রকৃতির সামঞ্জস্যের আলোচনার আগে বর্তমান আলোচনার প্রসঙ্গে মনে পড়ল, তাই ইংরাজি কবি টেনিসনের Song of the Lotus Eaters কবিতাটির কথা বলেনি। পাঠকদের মনে আছে পদ্মভুকরা তাদের গানের মধ্যে বলছে যে দেখ এই পদ্মগুলিকে। যেখানে জন্মায়, সেইখানেই ফুটে ওঠে, সেইখানেই ঝরে যায়: কোন কষ্ট নেই, কোন পরিশ্রম নেই, এক দুঃখ থেকে আর এক দুঃখের মধ্যে, আমাদের মত তাদের বার বার করে ছুঁড়ে ফেলা হয় না। এসো আমরাও ওদের মত হই: আর আমরা

ছুটে ছুটে বেড়াব না। টেনিসন কত বড় জীববিজ্ঞানী ছিলেন তা জানি না। কিন্তু উদ্ভিদ জগতের কথা যা বলেছেন তা সত্য। আমরা আমাদের বক্তব্যে ফিরে আসি।

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের সঙ্গে রয়েছে প্রচুর অক্সিজেন এই অজস্র প্রাণীকুল এই হাজার হাজার বছরেও তা ফুরিয়ে দিতে পারি নি। এটা কি করে সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে তারই কথা বলি। বহুকোষ বিশিষ্ট প্রাণীরা এই পৃথিবীতে আসার আগেই উদ্ভিদকুল পৃথিবীতে এলো। যে সময় তারা প্রথম এলো, তখন সেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছিল একেবারে ভিন্ন ধরনের। প্রস্তর ও শিলা জাতীয় বস্তু যাহাদের অঙ্গ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি, সে গুলির উপস্থিতির জন্য পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তখন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ভর্তি ছিল। তখন যদি কোন প্রাণী সেই অবাহাওয়াতে এসে পড়ত। তা হলে তাদের পক্ষে সেখানে বাঁচা ছিল অসম্ভব। তাই তখন সেই আবহাওয়াতে কোন প্রাণীই ছিল না। ছিল কেবল উদ্ভিদ। আবার সেই আবহওয়া উদ্ভিদের পক্ষে অতি উপযোগী বলে সেটা ছিল বিশাল বনস্পতির যুগ। এইখানে বলে রাখি তাদের দেহের ফসিলই আমরা কয়লা বলে ব্যবহার করি।

সে কালের সেই সব গাছপালা, প্রচুর কাবন ডাই-অক্সাইড, অজস্র সূর্যালোকের সাহায্যে, খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। সেই সব বনস্পতি যেমন একদিকে বিশাল আকার নিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল। অন্যদিকে তেমনি প্রচুর অক্সিজেনে পৃথিবীর আবহমণ্ডলকে ভরিয়ে দিতে লাগল। আজ পর্যন্ত যে পরিমান অক্সিজেন আমাদের বায়ুমণ্ডলে রয়েছে, তা সে যুগের বনস্পতিদের দান। অবশ্য আমাদের কালের গাছপালা, সমুদ্র, সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি যে অক্সিজেন তৈরি করে যাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা সভ্য মানুষরা কি করছি? গাছ পালা কেটে আমরা সাফ করে দিচ্ছি। বিভিন্ন ফ্যাক্টরির চিমনি থেকে আমরা নিয়ত কার্বন মনোক্সাইড, কাবন-ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষাক্ত ছেড়ে চলেছি। তথাকথিত স্মগ সৃষ্টি করে সূর্যের আলোর প্রবেশ কমিয়ে ফেলেছি। এমনি আরো কত কি, যার আলোচনা আমাদের পরে করতে হবে। তাই এখন ও আলোচনা থাক।

এই অধ্যায়ের শুরুতে আমরা আমাদের এই পৃথিবীকে একটি মহাকাশ

যান বলে অভিহিত করেছি। এখন সেই বক্তব্যটিকে একটু ভাল করে লক্ষ্য করা যাক। সীমাবদ্ধ জিনিসপত্র, যা এই মহাকাশ যানের যাত্রীদের প্রয়োজন সে গুলির দিকেই একটু নজর করা যাক।

যদি অক্সিজেনের কথা ধরি, যে অক্সিজেন ছাড়া কোন প্রাণীর বাঁচা অসম্ভব, তার প্রাচুর্য বিভব কি ভাবে এসেছিল তা আমরা দেখলাম। প্রাণীকুলের প্রাণরক্ষার উপযুক্ত স্তরে যদি একে রাখতে হয়, তা হলে সবুজ বনভূমিকে রক্ষা ও নতুন গাছের অধিরোপন একবারে অবশ্য করণীয়। অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে অসুবিধা আমরা একটু পরেই দেখতে পাব অন্ততঃ জল ও অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অসুবিধাটা কিছুটা কম, শুধু উপযুক্ত মানসিকতাটা থাকা দরকার। এই মানসিকতাটাই যেন আমাদের কম। বনভূমি সম্পর্কে এই সুস্থ, ভবিষ্যতদ্রষ্টা ঋষির মানষিকতা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তিনি বৃক্ষরোপন বনমহোৎসব ইত্যাদির সাহায্যে গাছপালাকে আত্মীয় বন্ধুর মত দেখেছেন। এ জন্য তাঁর কত অজস্র গান। অতিথি বালক তরুদলকে তিনি ডেকে বলছেন।

"আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল
মানবের স্নেহ-সঙ্গনে
চল চল আমাদের
ঘরে চল······" ইত্যাদি।

সুবিখ্যাত লেখক অলডাস হাক্সলির একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ "Wordsworth in the Tropics." কিছুটা বিদ্রুপের সুরেই হাক্সলি ওই প্রবন্ধে বলেছিলেন যে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে প্রকৃতির কাছে কিছুক্ষণ থাকা আর সেই সময়টা গির্জায় কাটানো প্রায় একই ব্যাপার। প্রকৃতিকে এতখানি ভক্তির আসনে বসাতে যেন হাক্সলি ছিলেন কিছুটা গররাজি। হাক্সলি বরং বলবার চেষ্টা করেছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হবে। ভিক্টোরিয়ান প্রভাব তখন শেষ হয়ে যায় নি সে যুগে। সেই যুগে প্রকৃতির উপরে কসাইগিরি চালিয়ে মানুষ নিজেরই কতটা ক্ষতি করল তা বোঝা ছিল হাক্সলির পক্ষে অসম্ভব। তাই রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের গুণ গ্রহণ করা শুধু আমাদের পক্ষেই শুধু সম্ভব। যদিও আমরা তা আজও করছি না।

বাতাসের কথা তো গেল। এবার জলের কথা। সমুদ্রে, হিমাঞ্চলের চির-তুষারে, আবহলোকে, জলীয় বাষ্পে, মেঘে, ভূগর্ভের অভ্যন্তরে, নদী, হ্রদ ইত্যাদি জায়গায় এই জল রয়েছে। কোন একটি বস্তুকে যদি পরিচ্ছন্ন ও নতুনের মত একেবারে টাটকা, তাজা অবস্থায় রাখতে হয়, তাহলে বস্তুটিকে, যাকে ইংরাজিতে recycling বলে, তাই করতে হয়। ইংরাজি শব্দটি বাংলায় বোঝাবার জন্য বলা যেতে পারে অনুবর্ত্তন। অর্থাৎ চাকাটাকে পুরাপুরি ঘুরিয়ে আবার আগের জায়গায়, সুরুতে নিয়ে যাওয়া। প্রকৃতির নিয়মে অনেক জায়গায়, প্রকৃতি এ কাজটি করে থাকে।

জলের কথাই যদি ধরি: বৃষ্টির যে জল, তা নদী, হ্রদ, জলাশয়ে জমা হয়ে ব্যবহার হচ্ছে। ব্যবহৃত অপরিষ্কার জল নদী ইত্যাদির মাধ্যমে সমুদ্রে যাচ্ছে সমুদ্রের জলীয় বাষ্পে তৈরি হচ্ছে মেঘ। তারপর আবার বৃষ্টি। আমরা রসায়নাগারে যেমন জলকে রাসায়নিক দিক থেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য পাতনের সাহায্য নি; প্রকৃতিও তেমনি এক বিশাল পৃথিবীব্যাপী পাতনযন্ত্রের সাহায্যে জলকে অনুবর্ত্তিত করে পরিষ্কার করছে। যে সমুদ্র আমাদের স্থলভাগের তিন গুন, সেই বিশাল সমতল থেকে জলীয় বাষ্প প্রতিনিয়ত মেঘে পরিণত হচ্ছে। আর সেই মেঘ থেকে পাতিত জল পৃথিবী জুড়ে বর্ষিত হচ্ছে। এইভাবে একটা সামঞ্জস্য বা Balance থাকছে।

সামঞ্জস্যের কথাটা উঠল বলে আমাদের ঘর-করনায় প্রতিদিনের দেখা একটি জিনিষের কথা বলি। এটি হল এ্যাকোয়েরিয়াম। বর্ত্তমান যুগের যে এ্যাকোয়েরিয়াম, সেটি হল একটি চৌকোনা কাঁচের বাক্স। এই বাক্সর নিচেটায় দেয়া থাকে খুব ছোট ছোট পাথর ও মোটা বালি। এতে লাগানো থাকে সবুজ গাছ, যেগুলি জলের গাছ, আর কিছুসংখ্যক দেখতে সুন্দর মাছ তো থাকবেই। এ ছাড়া থাকে ram's horn বা অনুরূপ জাতের কিছু গুগুলি, শামুক। এছাড়া থাকে একটি ইলেকট্রিক আলো। বালির উপর বসানো থাকে একটি ছোট পাম্প, যা এই জলে বাতাস ছাড়তে পারে। এ বাতাস দেখা যায় বুদবুদের আকারে জলের উপর দিয়ে বার হয়ে যায়।

যে বর্ণনা দেয়া হল, তা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশ। কেন তাই বলি। দিনের আলো ও ইলেকট্রিক আলোর সাহায্যে সবুজ গাছগুলি জলের থেকে মাছেদের কানকো দিয়ে জলে ছাড়া কার্বন ডাই অক্সাইড নিচ্ছে ও জলে

অক্সিজেন ছাড়ছে। কেঁচোজাতীয় যে খাবার মাছকে দেয়া হয়, তা খেয়ে মাছেরা যে পাইখানা করে, তাই আবার ওই শামুকের খাদ্য। এই ভাবে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এই ছোট্ট এ্যাকোয়েরিয়ামে রয়েছে। প্রকৃতিও সারা পৃথিবী জুড়ে এমনি একটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলেছে। এটা আমাদের ভাল ভাবে বুঝতে হবে। এই দিকটিতে আমরা বার বার ফিরে আসব।

পৃথিবীতে কিছু এরকম রয়েছে, যা প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, ও সেই নিয়ম মেনে চললে, আবার ব্যবহারের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যার পুনরাবর্ত্তন নেই। পৃথিবী যখন একটি বড় আকারের মহাকাশ যানই তখন এই বস্তুগুলির কথা ভাবতে হয় বৈকি।

খনিজ পদার্থগুলি এইরকম সীমিত পদার্থ ও যার পুনরাবর্ত্তন নেই। লোহা, তামা, পারদ ইত্যাদি যে সব খনিজ বস্তু পৃথিবীতে আছে, আমরা আগেই বলেছি এগুলি সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া। ধাতুদের মধ্যে দু একটি হয়ত রেডিও এ্যাকটিভ বিকিরণের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। পরমানবিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যায় দেখা যাচ্ছে, হয়ত কোন ধাতু, কি মৌলিক পদার্থ পরীক্ষাগারে তৈরি করা সম্ভব। কিন্তু এটা পরিষ্কার, যে কোন ধাতুর লক্ষ লক্ষ টন, এ ভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়। এই কথা ভেবেই আমাদের সাবধান হতে হবে। নষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

লোহা, তামা, এ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, টিন, সীসা এই সব ধাতু মৌলিক ধাতু হিসাবে পাওয়া যায় না। এগুলি আরো একাধিক মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলিত যৌগিক পদার্থরূপে পাওয়া যায়। এ পদার্থগুলির জটিলতাও খুব। এরই ফলে আমাদের আরো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। যেমন এ সব যৌগিক পদার্থ থেকে, বার করে নেবার সময় কিছু কিছু ধাতু থেকে যাচ্ছে। আর অন্য যে সব মৌলিক পদার্থগুলি থেকে যাচ্ছে, সেগুলিকে উদ্ধার না করতে পারায় সেগুলি আবর্জনার পাহাড় হয়ে উঠছে। বর্ত্তমান যুগের ষ্টিল প্ল্যান্ট, বিশেষতঃ কপার প্ল্যান্ট দেখলে এ কথা বোঝা যায়। প্ল্যান্টের চেয়ে অনেক বড় জায়গা জুড়ে আবর্জনার পর্বত। আয়তনে সত্যিকারের পর্বত, যা দিন দিন যে ভাবে উঠছে, দেখলে মনে হয়, একদিন শুধু বুঝি এ পৃথিবী জুড়ে শুধু বুঝি এই আবর্জনার স্তূপই থাকবে। তার বিক্রমেই জীবকুলকে বিদায় নিতে হবে।

মানব সভ্যতায় ধাতুর ব্যবহারটা এত বেশী হয়ে উঠেছে যে সেটা যেন

একটা ফ্যাসান। কোন দেশের কতগুলি ষ্টিল প্ল্যান্ট আছে, তার গুণতিতে বোঝা যাবে কোন দেশ কতটা সভ্য ও উন্নত মানের। অথচ আমরা একটা কথা জানি, যে ধাতুগুলি দিয়ে তৈরি জিনিস পত্র, ভেঙ্গে বা ফুটো হয়ে গেলে ধাতুটা ধাতুই থাকে। যেমন রান্নার কড়া যদি ফুটো হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে কড়ার লোহাটা একটু হালকা হয়ে গেলেও, লোহাই থাকে। তাই যেমন আমাদের সোনার গহনা ক্ষয়ে গেলে, কি তার ডিজাইনটা বাতিল হয়ে গেলে, আমরা আবার সেটাই গালিয়ে, তার উপর হয়ত একটু নতুন সোনা দিয়ে, আর একটা গহনা গড়াই। কিন্তু লোহা বা তথাকথিত ইতর ধাতু বা Base metal এর বেলায় তা করি না। তাই অন্য ধাতুর বেলায় সেই পুনরাবর্ত্তন বা recycling হয়। অবশ্য একেবারেই হয় না এ নয়; তবু যতটা হওয়া উচিত ছিল তা কই হয়। মনোবৃত্তিটা কিন্তু এই হলেই ভাল হত, যে ধাতুর প্রতিটি কণিকা পর্যন্ত আমরা পুনর্ব্যবহার করব।

ধাতুর কথা বললাম। এবার অন্য খনিজ পদাথের কথা বলি। ধাতু ছাড়া আর খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান হল কয়লা আর পেট্রলিয়াম এদের কথায় আসি। কয়লা, যেটা হল মোটাছুটি ভাবে মৌলিক কার্বণ। সেটা অন্য ধাতুর মত, কি তাদের ,অন্য পদার্থের সঙ্গে যৌগিক পদার্থ হিসাবে, মাটির তলায় আকরিক ভাবে জন্মায় নি। আগেই বলবার চেষ্টা করেছি যে পৃথিবীর বিশাল বিশাল বনভূমি, সে গুলি মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়ে, হাজার হাজার বছর ধরে, ভিতরের বায়ুহীন উত্তাপে কয়লা হয়ে গেছে। মাটির তলায় চাপা পড়ার কথা যে বললাম, সে ঘটনা তখনকার দিনে ছিল আখচার। এর কারণও আগেই বলেছি, যে পৃথিবীর তখন ছিল ভূমিকম্প, কি অগ্নুৎপাতে উত্তাল। এমনি করে সারা পৃথিবীর অজস্র জায়গায় বহু কয়লার খনি তৈরি হয়েছে। অন্য ধাতব পদার্থের তুলনায় কয়লায় প্রাচুর্য যথেষ্ট। কয়লা একবার জ্বালিয়ে ফেললে, তখন শুধু ছাই। কিছু কার্বন, ধোঁয়া, কার্বন মনোক্সাইড ও ডাই অক্সাইড হিসাবে বার হয়ে যায়, তাদের আর কোন কাজে লাগান যায় না। কিন্তু কয়লা ও কয়লা থেকে পাওয়া আলকাতরাকে ভগ্নাংসিক পাতনের সাহায্যে বহুপ্রকারের রাসায়নিক বস্তু পাওয়া যায়। এর মধ্যে কতকগুলি আমাদের খুব পরিচিত ও নিত্য ব্যবহার্য, যেমন নেপথালিন, বেনজিন ইত্যাদি।

খনি থেকে তুলেই একেবারে তা আগুনে জ্বালিয়ে, এই অজস্র ও বহুপ্রকারের

বস্তু যদি আমরা কাজে না লাগাই, তা হলে সেটা হবে আমাদের মূর্খতা। যদিও কয়লাকে আমরা, একবার খরচ করে ফেললে, আর তা পুনরাবর্ত্তনে আনতে পারি না, তবু অন্ততঃ, কয়লা থেকে যেটুকু পাবার, তার পুরোটা যেন আমরা আদায় করে নিতে পারি।

কয়লার পর পেট্রোলিয়াম নিয়ে আলোচনা করছি। ১৯৭৩ সালে আরব ইসরায়েলি যুদ্ধের পর থেকে পেট্রলের দাম আরব দেশগুলি অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দেবার ফলে, জ্বালানির সমস্যা আজ বিশ্ব জুড়ে এত বড় হয়ে উঠেছে যে তার পর থেকে এ আলোচনা আজ সকলের মুখে। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, রুশ দেশে, আরব রাজ্যগুলিতে মাটির তলায় এত প্রচুর তৈল সম্পদ ছিল যে মাত্র পনেরো, কুড়ি বছর আগেও যেন সকলেরই মনে হত, যে এ তেল বুঝি ফুরোবার নয়। এই মনোভাবের ফলে একটা বিপরীতমুখী মনোভাব দেখা দিল। পেট্রল আরো বেশী করে খরচা করার জন্য, আমেরিকার জেনারেল মোটরস, ইত্যাদি কোম্পানী, বিশাল আকারের গাড়ী, তার পিছনে ট্রেলারেই থাকার জায়গা, এই সব করে, একেবারে স্বচ্ছল আমেরিকান জাতীকে যেন মোটর গাড়ীতে ভ্রাম্যমান এক যাযাবর জাতীতে পরিণত করল। এর ফল কিন্তু হল বিশ্বব্যাপী ও সুদূরপ্রসারী।

বিভিন্নদেশের লোকেরা আমেরিকার অনুকরণে উইকএণ্ড হতে না হতে, স্ত্রী পুত্র বা বান্ধব বান্ধবীদের গাড়ীতে বসিয়ে ছুটল, কতটা দূরে যাওয়া যায়। বেশী দূর অবধি যেতে পারাটাই যেন হয়ে উঠল তথা কথিত ষ্টেটাস সিম্বল। এরা যেন ইচ্ছা করেই ভুলতে চাইল, রবীন্দ্রনাথের সেই কথাগুলি।

"বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।"

সেই সঙ্গে দেখা দিতে সুরু করল কিছু কিছু পেট্রল খরচা করার স্পোর্টস যেমন

দূর পাল্লা বা অন্যরকম মোটর রেসিং ভিনটেজ কার র‌্যালি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সবের সমর্থনে বিভিন্ন বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলিও সাহায্য করতে লাগল। পত্রিকাদের স্বার্থ হল পেট্রল কোম্পানী ও গাড়ীর কোম্পানির বিজ্ঞাপন। এইভাবে পারস্পরিক নগদ পাওয়া, স্বার্থের একটা যোগসাজসে যে পেট্রল হয়ত আরো পঞ্চাশ কি একশো বছর সারা পৃথিবীর বহু সমস্যার সমাধান করতে পারত, তার বদলে বছর তিরিশের মধ্যে পেট্রল-গুলোকে ফুঁকে দেয়া হল। এ ফোঁকার কাজ এখনো সমান ভাবেই চলেছে।

শুধু পেট্রল ও কয়লা নয়, তথাকথিত প্রাকৃতিক সম্পদ বলে যা কিছুই আছে ও যে গুলিকে রিসাইক্লিইং বা পুনরাবর্ত্তন বা পুনর্নবীকরণের উপায় নেই সেই জিনিসগুলি অপব্যবহার করে চলেছি, তা থেকে বিরত হওয়া অনেক আগেই উচিত ছিল।

এ পৃথিবী যে একটি মহাকাশ যান, এই কথাটি আগে থেকে মনে রাখলে, হয়ত আমরা পার্থিব সম্পদগুলিকে আরো দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে পারতাম। তা হলে আমরা আজ যে "শেষের সে দিন ভয়ঙ্করের" কাছাকাছি এসে, অমাদের এ সভ্যতা মুমূর্ষু বলে ভাবছি তা আর ভাবতে হত না। যাই হক, ওই কথাটি মনে রেখেই আমরা এ অধ্যায়টি শেষ করছি পৃথিবীর আনুপূর্বিক সম্পদের কথাই একটু আলোচনা করে।

পৃথিবীর সব সম্পদ আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। ১। যা নবীকরণের উপযুক্ত ২। নবীকরণের অনুপযুক্ত ৩। যা চলমান

নবীকরণ যোগ্য—(১) কাঠ: কাঠ ব্যবহার করে ফেললে আবার যে গাছ জন্মাচ্ছে, তা থেকে আবার নতুন কাঠ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এখানেও একটা কথা আছে। যতখানি তাড়াতাড়ি গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, তত গাছ আমরা জন্মাতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথের মত দু একজন দূরদ্রষ্টা ঋষিকল্প মানুষই শুধু বৃক্ষরোপন কি বনমহোৎসবের উপর উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন, আর কেউ নয়। তা ছাড়া কাঠকে আজও পর্যন্ত জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে আসা হচ্ছে। কাঠ জ্বালানি হিসাবে মোটেই উপযুক্ত নয়। যতটা কাঠ পুড়িয়ে যতটা উত্তাপ পাওয়া যায়, তাতে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে জ্বালানি হিসাবে কাঠের উপযুক্ততা কম। তাই কাঠের অন্যব্যবহারগুলি, তার দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে।

(২) গোবর ইত্যাদি : এ গুলি যে পৃথিবীর সম্পদ, এটা বুঝে উঠতেই মানুষের অনেক দিন লেগেছে। ক্রমে মানুষ বুঝতে পারল কার্বন, হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন, ইত্যাদির যৌগিক পদার্থ রূপে, যে খাদ্য আমরা উদ্ভিদের সাহায্যে মাটি থেকে তুলে নিয়েছি, তা আবার মাটিকে যদি ফেরৎ না দি, তা হলে মাটি ক্রমশঃ দরিদ্র হয়ে পড়বে। দরিদ্র হতে হতে মাটি একদিন পুরোপুরি মরুভূমি হয়ে উঠতে পারে, যেখানে একটি ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না। প্রাচীন মানুষ নিজেদের অজ্ঞতায় এমনি করে অনেক মরুভূমির সৃষ্টি করেছে। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিশ নদীর অববাহিকা, যেখানে একদিন প্রাচীন মানব সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল। সেখান থেকে সুরু করে সমস্ত আরব ভূখণ্ডই আজ মরুভূমি। যে সাহারা একদিন ইউরোপের খাদ্য ভাণ্ডার ছিল, তা আজ মরুভূমি।

অথচ মানুষ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করল যে মাটিকে যা দিতে হয়, তা গোবর বা ওইজাতীয় নক্কার জনক, ফেলে দেবার জিনিস। আজকে মানুষ আরো জেনেছে গোবরের গ্যাসকে ইন্ধন হিসাবে ও আলো জ্বালার কাজে ব্যবহার করেও বাকিটা জমির সার হিসাবে কাজে লাগান যায়।

(৩) খাদ্য : আমিষ, নিরামিশ যে জাতীয় খাদ্যই হক, সে সম্পদ পৃথিবী থেকে যে আহরণ করা হচ্ছে তা সহজেই বোঝা যায়। খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার পর, পরে আবার যাতে খাদ্য পাওয়া যায়, সে জন্য প্রজনন বিদ্যার সাহায্যে মানুষ চাহিদা মত উদ্ভিদ ও প্রাণী উৎপাদন করতে লাগল। মাটি কর্ষণ করে গাছ লাগাতে হয় বলে, এর নাম হল কৃষি। পশুপালনও এই পর্যায়ভুক্ত। এ বিবর্ত্তনের ফলে মানব সমাজেরও একটা পরিবর্ত্তন হল তথাকথিত কৃষ্টি বা কালচারের জন্ম। যদিও রবীন্দ্রনাথের কথাটার উপরে বীতরাগ ছিল তবু যদি সংস্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করি, তারও সামাজিক অর্থও তাৎপর্যটা এই থাকে : অর্থাৎ বিশেষভাবে কিছু করা। তখন প্রজনন বিদ্যা মানুষ নতুন শিখেছে। সেটাকে কাজে লাগানই তখন সে মানুষদের কাছে ছিল সম্যক ভাবে কিছু করা।

(৪) ইউরেনিয়ম তথাকথিত ব্রিডার রিয়্যাকটার জাত: ফার্মি ও সিলার্ড যখন চেন রিয়্যাকশান আবিষ্কার করেন তখন দেখা যায় এ চেন রিয়্যাকশানের ফলে ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে অন্য বস্তুতে পরিণত হয়। এই আবিষ্কারের কয়েক বছর পরে আর একটি আবিষ্কার হল, যাতে আর একটি করে ইউরেনিয়াম অনু-

নতুন করে তৈরি হয়। এটা পুনরাবর্ত্তনের একটা উদাহরণ তাই এখানে উল্লেখ করলাম। এখানে আমাদের ব্রিডার রিঅ্যাকটার সম্পর্কে বেশী আলোচনা করা উচিত হবে না ; তার জায়গা অন্য। তাই ও আলোচনা এখন মুলতুবি রইল।

এই হল মোটামুটি পৃথিবীর আবর্ত্তন মূলক সম্পদের তালিকা। এইবারে আলোচনা যে গুলির আর পুনরাবর্ত্তন নেই, যেগুলি একবার খরচা হল তো একেবারে শেষ হয়ে গেল।

নবীকরণের অনুপযুক্ত—(১) পেট্রল ও অন্য খনিজ তৈল : আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি জায়গা আমাদের পুরোপুরি জানা হয়ে যায় নি। গভীর জঙ্গলের মধ্যে, দুস্তর মরুলোকে, কি উঁচু দুর্গম পাহাড়ে, এমন কত জায়গা ছিল যেখানে মানুষের পা কোনদিন পড়ে নি। কিশোর বয়সে এ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে আমাদের মনে হত যে এই সব অজানা জায়গা আমাদেরই মধ্যে হয়ত কেউ আবিস্কার করবে। তার ফলে হয়ত কত নতুন সম্পদ এসে যাবে মানুষের হাতে। কিন্তু ১৯৩৯ সালে সুরু হল বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে লিপ্ত হবার আগে থেকেই হিটলারের ধুয়া ছিল বাঁচার জায়গা। আরো বেশী করে পৃথিবীর সম্পদ চাই, আর্য জার্মান জাতীর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সব জ্ঞান নিয়েই জার্মানরা যুদ্ধে নামল। অক্ষশক্তির ইতালি ও জাপানও প্রযুক্তি বিদ্যায় পেছিয়ে ছিল না। এদের ঠেকাতে হলে মিত্রশক্তিকেও প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের পুরো জ্ঞান নিয়ে এইযুদ্ধে নামতে হল। আর এ যুদ্ধের ক্ষেত্র হল সারা বিশ্ব। জল, স্থল, অন্তরীক্ষে, এমন জায়গা রইল না যা যুদ্ধের আক্রমণের কি প্রতি আক্রমণের ক্ষেত্র নয়। তাই দেখা গেল বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে মানুষের অজানা কোন জায়গাই আর নেই। তাই আমরা দেখি, হিমালয়ের উচ্চতম চূড়া মাউন্ট এভারেষ্টও বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পরেই মানুষ জয় করে ফেললে।

এই বিশ্বযুদ্ধের পরই ভাল করে জানা গেল, পৃথিবীর কি সম্পদ আছে। আর কি সম্পদ নেই। এ জ্ঞান যদিও হল, কিন্তু সম্পদগুলির মধ্যে যে গুলি সীমাবদ্ধ সেগুলি সারা বিশ্বমানব প্ল্যান করে, কি করে সুব্যবহার করতে পারি, তার উপযুক্ত সহযোগিতার মনোভাবটা কিন্তু গড়ে উঠল না। এ প্রসঙ্গটি আমাদের পরে আলোচনা করতে হবে, তাই এখন থাক।

(২) কয়লা : এ সম্পর্কে অনেক আলোচনাই আমরা করেছি। যতই প্রাচুর্য থাক না কেন, এ সম্পদটি যে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

(৩) অন্য ধাতু : লোহা, তামা, দস্তা, ইত্যাদি ধাতুর তো একদিন শেষ হয়ে আসবে, আর সেইজন্য তা ব্যবহারে লাগাবার জন্য ব্যবহার করা ধাতুকে পুনর্ব্যবহার করার পদ্ধতিটা আমাদের আরো ভাল করে তুলতে হবে।

এবার আমরা পৃথিবীর যে সব সম্পদ চলমান, তাদের তালিকায় আসি

চলমান সম্পদ—এর মধ্যে অনেক কিছুই এসে যায়। যেমন বহমান বাতাসকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তা হবে এই পর্যায়ের। মানুষ সভ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ু শক্তিতে চালিত পাখনার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করে আসছে। তখনকার ইউরোপে এই উইণ্ডমিলের সংখ্যা কম ছিল না। এখনও হল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চলে উইণ্ডমিলের পাখনা ঘুরছে দেখা যায়। সৌন্দর্য-তত্ত্বের দিক থেকে, আমাদের আধুনিক কল কারখানার তুলনায় তখনকার উইণ্ডমিল ছিল অনেক সুশ্রী।

বাতাসকে যেমন ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে তেমনি দীর্ঘদিনই নদীর স্রোতকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্ত্তমানে পাহাড়িয়া জায়গায় নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে, তারপর সেই নদীতে ঝর্ণা সৃষ্টি করা হয়। ঝর্ণার বিপুল বেগকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে, বর্ত্তমানে প্রচুর শক্তি পাওয়া যাচ্ছে।

যদিও পদার্থবিদ্যায় এর থিয়োরিগত সম্ভাবনা জানা ছিল, কিন্তু খুব সম্প্রতিই মানুষ ভাবতে সুরু করেছে কি করে সামুদ্রিক শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেক রকম স্রোত আছে। এই স্রোত থেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া সম্ভব। তা ছাড়া সমুদ্রে এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গার উত্তাপের পার্থক্যও বড় কম না। উত্তাপের এই তারতম্যও আমাদের শক্তি দিতে পারে যথেষ্ট। সমুদ্র থেকে শক্তি পাবার যে স্বপ্ন, তার মধ্যমনি হল সমুদ্রের জলের মধ্যে ভারী হাইড্রোজেনে তৈরি যে জল আছে। হাইড্রোজেন অনু হিলিয়ামে পরিণত হবার সময় যে বিপুল শক্তি দেয়, তা সঠিক ভাবে পেলে, তাতে সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। এ আলোচনা পরে আবার উঠবে।

পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ সব সূর্য থেকে পাওয়া। দিনের আলো ও উত্তাপ আপনিই রোজ আসছে সূর্য থেকে। সূর্য যতটা শক্তি দিয়ে যাচ্ছে, তার বেশীটাই আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। শুধু তাকে নষ্ট হয়েই যেতে দিচ্ছি। এ শক্তিকে ধরে রাখার ও ব্যবহার করার কথা আজ নতুন করে মানুষ ভাবতে সুরু করেছে ও তার সময় এসেছে।

নীরব বসন্ত

ছুটিতে সহরের মানুষ বেড়াতে গিয়ে সহর ছেড়ে, বেরিয়ে পড়ে এমন সব জায়গায় যাবার ইচ্ছা নিয়ে, যে জায়গাগুলো ভিন্ন রকমের। যেখানে চোখ খুললেই সবুজ আর সবুজ। সবুজ গাছগুলোর মাথার উপরের আকাশটা খুব বেশী নীল। এ যেন নীল কালি। যার গাঢ় রংয়ে কলম ডুবিয়ে লেখাও যাবে বলে মনে হয়। সবুজ সবুজ গাছগুলো আবার ফলে ফুলে ভর্ত্তিই শুধু নয়, তাদের আশ্রয়ে কত হাজারো রকমের পাখী। আর সেই পাখীর গান? শুধু চোখদুটো নয়, অজস্র পাখীর গানে কানদুটোও জুড়িয়ে যায়। ভরে ওঠে মনটা। এ যেন রবীন্দ্রনাথের সেই "ছুটির বাঁশি"।

যারা সারা বছর, কঠিন পরিশ্রমের কাজ করেই চলেছে, আমেরিকায় সেই সব লোকেরা, গরমের ছুটিতে বেরিয়ে পড়ে সবাই। বর্ষীয়সী জীববিদ্যা বিশারদ, ডঃ র‍্যাচেল কারসন, ওমনি প্রত্যেক বছরই গরমের ছুটিতে বেরিয়ে পড়তেন। যখন বয়স কম ছিল, তখন থেকেই ওই তাঁর অভ্যাস। ক্রমে ক্রমে জীববীজ্ঞানী হিসাবে যেমন বেড়েছে তাঁর খ্যাতি, তেমনি বয়স আর অভিজ্ঞতাও তো আর কম বাড়ে নি। এবার গরমের ছুটিতে বেরিয়ে এক জায়গায় এসে, যেন কি রকম মনে হল। এখানে আসাতো আর নতুন নয়। তবু এখানে এবার এসে একটু অন্যরকম ঠেকল যেন। সেই অত পাখীর গান তো শোনা যাচ্ছে না। চারিদিক যেন একটু ম্রিয়মান। ভাবতে লাগলেন জীববিজ্ঞানী। এই চিন্তায়, তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এল একখানি বই, Silent spring," বার হবার সঙ্গে সঙ্গে বইখানি হয়ে উঠল বেষ্ট সেলার। তারপর

থেকে মাসের পর মাস তো বটেই, এমন কি বছরের পর বছর বইখানি হয়ে রইল বেষ্ট সেলার। সেটা ছিল ১৯৬২ সাল।

বিভিন্ন ধরণের প্লাষ্টিকে যখন বিজ্ঞান, তৈরি করতে শেখাল মানুষকে, তখন বিজ্ঞানীদের মনে এলো যেন একটা নতুন উৎসাহ। সিল্কের বদলে টেরিলিন আবিষ্কার করে তাঁরা বললেন, যে এমন জিনিস তৈরি হল যা পৃথিবীতে ছিল না কোনদিন। ওমনি গর্ববোধ করতে লাগলেন বৈজ্ঞানিকরা যখন তাঁরা তৈরি করলেন, হাইড্রোকারবন ও ক্লোরিন সহযোগে ডি-ডি-টি এ্যালড্রিন, ডাই এ্যালিড্রিণ, ইত্যাদি বিবিধ কীটনাশক।

যদিও পোকামাকড়দের কীটানুকীট এই সবে নাম দিয়ে আমরা তাদের খুব একটা পাত্তা দিতে চাইনি কখনো, তবু দেখা গেল, যে জীবন যুদ্ধে মানুষ এত বুদ্ধি নিয়েও বুঝিবা ওদের কাছে হেরে যায়। মানুষের ফলানো শস্য ও অন্য খাদ্য সামগ্রী, এমনকি মানুষের খাদ্য উৎপাদক গাছপালা পর্যন্ত, পোকায় বিপর্যস্ত করে দিতে লাগল। এই অসম আয়তনীদের সঙ্গে যুদ্ধে, পোকা মাকড়দের সব চে বড় অস্ত্র হল তাদের অসামান্য ও অতি দ্রুত প্রজনন ক্ষমতা। এই শক্তিতেই লক্ষ-লক্ষ, কোটি কোটি কীট, আক্রমণ করতে লাগল উদ্ভিদ জগতকে আর মানুষের খাদ্যভাণ্ডারও।

এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দুটি রাস্তা। একটি এদের বিরুদ্ধে তার অন্যটি এদের প্রজনন ক্ষমতার বিরুদ্ধে। বৈজ্ঞানিকরা গেলেন প্রথমটির দিকে। আবিষ্কার হল ডি-ডি-টি ইত্যাদির। এই আবিষ্কার কিন্তু নিয়ে এল, আবিষ্কারের চেয়ে বড় সমস্যা। কীটনাশক তো আবিষ্কার হল অনেক। তার মধ্যে কতকগুলির রাসায়নিক সংগঠন এমন, যে তা সহজে ভেঙ্গে যেতে পারে। সেগুলি কীট বিনাশের পর কোন প্রাণীরই পক্ষে ক্ষতিকর হবে না এমন পদার্থে পরিণত হয়। কিন্তু ডি-ডি-টি মানুষের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর না হলেও কোন কোন প্রাণীর পক্ষে মারাত্মক বিষ। পোকামাকড়রা মরতে ও ক্ষতগ্রস্ত হতে লাগল এই সব ওষুধে। পোকামাকড় খায় যে সব পাখী মরে যেতে লাগল, ডি-ডি টি ও অনুরূপ ওষুধের প্রভাবগ্রস্ত পোকা-মাকড় খেয়ে। শ্রীমতী র‍্যাচেল কারসন যে বলেছেন পাখীর গান শুনতে না পাবার কথা, তার কারণ পাখীরাই ছিল না। আমাদের তৈরী কীটনাশকে শুধু কীট নয়, তা হয়ে উঠল পক্ষী ও বিবিধ প্রাণীনাশক। কথাটা এক লাইনেই প্রায়

লেখা হয়ে গেল। কিন্তু এর ফলাফল এত সুদূরপ্রসারী যে তা হয়ত বুঝতেই কয়েক দশক চলে যাবে। আর যখন ও যদিও বোঝা যায়, তবু প্রাকৃতির রাজ্যে সেই মারাত্মক ক্ষতি পুরণের কোন উপায় থাকবে না!

শুধু যে পাখীরাই মরে যেতে পারে তাই নয়, যে গাছগুলোকে পোকার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই সব কীটনাশক প্রয়োগ করা হল, সেই সব গাছেই হয়ত ডি-ডি-টির মত বস্তু এমনভাবে থেকে যেতে পারে, যে তার ফলে গাছের ত বটেই গাছকে আশ্রয় করা অন্য প্রাণীদেরও ভবিষ্যতে শেষ করে দিতে পারে। যেমন হত শামুক, টিকটিকি গিরগিটির মত সরিসৃপরা এমনকি প্রজাপতি, ও মৌমাছির মত উপকারী জীবরা পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। আর মানুষের ক্ষতিটা হয়ত, একটু একটু করে জমতে জমতে একদিন মারাত্মক হয়ে উঠবে।

তা ছাড়া আমরা জানি, সমগ্র উদ্ভিদ জগৎ সচল নয় তার দেহে ফল ধরার জন্য, পুষ্পের গর্ভে পরাগ সঞ্চার প্রয়োজন। তা করে বাতাস ও প্রজাপতি মৌমাছির মত উদ্ভিদের উপকারী প্রাণীরা। সোভিয়েট দেশে কোন কোন ফসলের উৎপাদান ৯ গুণ অবধি বাড়ান গেছে মৌমাছি দিয়ে ফুলে পরাগ সঞ্চার করিয়ে এর জন্য তারা অনেক জায়গায় ফসল বাড়াতে মৌমাছিকে কাজে লাগিয়েছে। কাজে কাজেই যে খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্য, ও দুষ্ট কীটনাশ-; করতে কীটনাশকের আবিষ্কার করলাম, তারই ফলে পরাগ সঞ্চারে সাহায্যকারী প্রাণীরাও ধ্বংস হয়ে ফলন কমিয়েই দিতে পারে। এ সম্ভাবনটিও মনে রাখতে হবে না নাকি?

পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে না কেন? শ্রীমতী র‍্যাচেল কারসনের ওই একটি প্রশ্ন থেকে যেন সেই পরমানবিক চেন-রিঅ্যাকশানের মত অজস্র প্রশ্ন হাজির হল। যেমন ধরা যাক। পাখীর গান নেই কেন? —পাখীরা মরে গেছে বলে। পাখীরা মরল কিসে?—কীটনাশক ওষুধে। কীটনাশকের প্রয়োজন তত বাড়ল কেন?—কৃষির উৎপাদন বাড়াতে। কৃষির উৎপাদন বাড়াবার দরকার হল কেন?—কারণ কম জমিতে বেশী ফসল ফলবার দরকার হল। জমি কমল কেন?—অনেক জমিতেই কলকারখানা বসিয়ে শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে হল বলে। আর জনসংখ্যা অসাধারণ বেড়ে উঠল বলে। জনসংখ্যা এত বাড়ল কেন?—কারণ অনেক রোগের অব্যর্থ ওষুধ বেরিয়ে

গিয়েছে বলে। এমনি ভাবে আরো বহুদূর হয়ত যেতে পারা যায়, কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। বোঝা যাচ্ছে, প্রকৃতি যে সামঞ্জস্য-চক্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, তা ভেঙ্গে গেল। ভেঙ্গে গেলে ক্ষতি ছিল না। যদি আর একটি বৃহত্তর কি মহত্তর সামঞ্জস্য চক্র গড়ে উঠত। কিন্তু আমরা যা করলাম, তাতে সামঞ্জস্যহীনতায় ওই চক্রের সামনের মুখ যেন খোলাই থেকে গেল। কে জানে? বিলুপ্তির দিকে নয় ত?

সামঞ্জস্যচক্র, এই কথাটি ব্যবহার করলাম। কথাটা বুঝতে, প্রকৃতির একটি ছোট চক্রের কথা ধরা যাক, একটি বনে কিছু হরিণও কিছু বাঘ আছে। আর বাঘের খাদ্য হরিণ। ধরা যাক হরিণ বেশী ছিল তাই বাঘ প্রচুর খেতে লাগল। স্বচ্ছলতায় বাঘের বংশবৃদ্ধি হবে। বংশবৃদ্ধি হলে আরো বেশী হরিণের দরকার হবে। কিন্তু বাঘেরা তো খেয়ে খেয়ে হরিণের সংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে। তাই এখন বাঘেদের উপোষ করে মরতে হবে। কিছু বাঘ মরে গেলে আবার হরিণরা নিরাপদ হবে, ও তার জন্য তাদের আবার সংখ্যা বৃদ্ধি হবে। হরিণ ও গাছপালার মধ্যে আবার এইরকম একটা সামঞ্জস্যের সমীকরণ। এই হল প্রকৃতির সামঞ্জস্যবৃত্ত। এ চক্র বজায় থাকতে হলে, বাঘ হক, হরিণ হক, আর গাছপালা হক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বেঁচে থাকতে পারবে না। এ দিক থেকে মনে হবে প্রকৃতি বুঝি অতি নিষ্ঠুর। কিন্তু নিষ্ঠুর কি দয়ালু কিছুই হয়ত নয়। এ কথা বললে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তবে কি করে সামঞ্জস্য আছে প্রকৃতিতে? এর উত্তরে বলা যায় জীবনেরই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন। তাই জীবনের পরিবেশে সেই সামঞ্জস্য।

মনে হতে পারে যুক্তি, বুদ্ধি এ সবই তো মানুষেরই আছে। তাই সামঞ্জস্য না থাকলেও মানুষেরই তো তা দিতে পারার কথা। কিন্তু দেখা যায় যে এটাই হয়ে ওঠে না। আফ্রিকার সেই নীবিড়তম বনভূমি যেখানে গরিলার স্বাভাবিক বাসস্থান, সেখানের একটি গবেষণার কথা বলছি। কয়েকজন বৃটিশ জীববিজ্ঞানী, স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা মুভিক্যামেরা ইত্যাদির সাহায্যে,সেই গভীর অরণ্যে গরিলাদের পূর্ণ জীবনযাত্রার ছবি নেয়ার ব্যবস্থা করলেন। দেখা গেল, এক বিশালায়তন এলাকার বনভূমি জুড়ে এরা ছোট ছোট দলে থাকে। সারাদিন ধরে এরা চরে বেড়ায়, সবুজ গাছপালা খায়। এ খাওয়াও টন টন। এক জায়গায় চরা শেষ হয়ে গেলে অন্য জায়গায় যায়। এমনি করে পুরো অঞ্চলটা ঘুরে

তারা যখন প্রথম জায়গায় আসে, তখন সেখানের গাছপালা আবার আগেকার মত হয়ে গেছে। তাই এই গরিলাদের খাবারের কোন অভাব হয় না। গরিলাদের সংখ্যারও খুব একটা ইতরবিশেষ হয় না। বেশী বংশবৃদ্ধি হলে দেখা যায় পোলিও বা অনুরূপ অসুখে অনেক গরিলা মরে গিয়ে অতিরিক্ত ভীড় হওয়া নিবারণ করে। এইরকমই যে চলে এসেছে কত শত বছর কে তা হিসাব করবে?

সদ্য স্বাধীন হওয়া আফ্রিকায় তারপর নবজাগরণের জোয়ার লেগেছে এখান কার মানুষের মনে। সুরু হয়ে গেছে বন কেটে বসত লাগানো। ছাগল ভেড়া চরতে সুরু করেছে। এত দীর্ঘদিন ধরে শত শত গুরু ভোজী গরিলারা, যে বনভূমি উচ্ছেদ করে, প্রবল ভূমিক্ষয়ের সাহায্যে মরুভূমির প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি: একদল ভেড়া-ছাগল ও কিছু মানুষ তা প্রায় করে এনেছে। তাই আবার সেখানে ডাক পড়ছে জাতীপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ফুড-এণ্ড-এগ্রিকালচারাল অর্গানি জেশানের বিশেষজ্ঞদের।

পাখী ডাকছে কি না? এই দিকে নিজের কানদুটিকে খাড়া রেখে শ্রীমতী র‍্যাচেল কারসন এমনি বহু নিঃশব্দ প্রশ্নে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। যা বহু জীববিজ্ঞানীকে নতুন কাজে হাত লাগাতে উৎসাহিত করেছে। ইকোলজি বাঙ্গালায় ঠিক পরিভাষা হয় কি না জানি না এটি একটি নতুন বিজ্ঞান আজ। শ্রীমতী কারসনের বইখানির আগেও ইংরাজি অভিধানে কথাটা ছিল। কিন্তু বইখানি প্রকাশ হবার পর একটি নতুন বিজ্ঞান গড়ে উঠল। অধ্যাপক ডাঃ ব্যারি কমনার ছিলেন একজন আনবিক জীববিজ্ঞানী। কিন্তু র‍্যাচেল কারসনের প্রভাবেই হয়ত বলা যায় তিনি আজ একজন ইকোলজির বিশেষজ্ঞ এমনি আরো কত। এর লেখা Closing Circle বইখানি আজ বিখ্যাত। অনবদ্য এই বই খানির শুধু নামটি থেকেই বোঝা যায় যে মানুষ বড় করে যে ফাঁসটি নিজের হাতে লাগিয়েছে তা আজ তার নিজের গলায় ছোট হয়ে লাগবার উপক্রম।

একখানি বিখ্যাত দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায়, একদিন তিন কলমব্যাপী হেড-লাইন দেখা গেল, "Railways in a Soup Over Birds Nest". খবরের মধ্যে ছিল যে রেল কর্তৃপক্ষ পক্ষীতত্ত্ববিদদের সাহায্য চেয়েছেন যে ইনফ্রারেড তরঙ্গের বা অনুরূপ বেতার তরঙ্গের সাহায্যে এমন কিছু করা যায় কিনা, যাতে পাখীরা ওভারহেড তারের ধারে কাছে আর না আসে। বর্তমানে পাখীর বাসা

ভাঙার জন্য আলাদা লোক রাখতে হয়েছে। কিন্তু বাসা ভেঙে ফেললেও পাখীদের নতুন বাসা তৈরি করতে আর কদিনই বা লাগে। পাখীদের মধ্যে আছে কাক, চড়াই, অন্য যাযাবর পাখী, আর শকুনি, যারা সর্ট সারকিট করে ট্রেন চলাচল অনবরতই বন্ধ করে দিচ্ছে।

জানিনা সংবাদপত্রটি এ খবরটাকে যত গুরুত্ব দিয়েছেন, পাঠকরা তা দিয়েছেন কিনা। দিলে, তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগবে, পাখীদের কাছে কেন ট্রেনের ওভারহেড তার এত প্রিয়বস্তু হয়ে উঠল? এর উত্তরটা খুবই সহজ। ট্রেন লাইনের ধারে কাছে, যে গাছে ছিল ও থাকার কথা তা হয় মরে গেছে, নয়ত কেটে ফেলা হয়েছে। প্রকারান্তরে আবার সেই শ্রীমতী কারসনের"নীরব বসন্তর" কথা। তাড়া খেতে খেতে একদিন এসব পাখীও থাকবে না। বলবার অপেক্ষা রাখে না, কাক, চিল, শকুনি হল ঝাড়ুদার পাখী। যা কিছু আবর্জনা এরা দূর করছে। আর চড়াই, ফিঙে, বুলবুলের মত অজস্র পাখী, যে পোকামাকড়ের জন্য আমাদের কীটনাশক, সেই কীটনাশের কাজই এরা করে।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারছি না। কলকাতার উপকণ্ঠে আমার এক আত্মীয়ের বাড়ী। তাদের বাড়ীর উঠানে একটা আমগাছ ছিল। বড় ভাল আম হত গাছটায়। একবার গিয়ে দেখি গাছটার গুঁড়িতে এমনভাবে উইপোকা ধরেছে যে সারা গুঁড়িটা যেন খেতে বসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম যে পোকা মারার জন্য কোন কীটনাশক তারা ব্যবহার করছে না কেন? ওঁরা বললেন যে বার বার স্প্রে করা হচ্ছে। দু-একদিন হয়ত একটু কমে। তারপর আবার যে কে সেই। দুঃখ করে ওঁরা বললেন, এতদিনের গাছটা এবার যাবে।

কিছুদিন পরে আবার সেখানে গেছি। দেখি গাছটায় একটিও পোকা নেই, একেবারে পরিষ্কার। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, যে এটা কি করে সম্ভব হল? ওঁরা বললেন যে হঠাৎ কিছুসংখ্যক কাঠঠোকরা পাখী এসে হাজির হল, সেই গাছে। তারাই খেয়ে খেয়ে পোকাগুলোকে একেবারে শেষ করে দিলে। আর একটিও পোকা রইল না। গাছটা আবার ঠিক আগের মতই সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই হল প্রকৃতির সামঞ্জস্য। সে সামঞ্জস্য যে শুধু গাছের দিক টেনেই হবে, তা কিন্তু নয়। এটা উইপোকাদের দিকেও যেতে পারে। কিন্তু এইভাবে একটি মুদ্রাকে টস করার মতন হেড আর টেলের সমান সুযোগ রয়েছে সমস্ত

জীবের। কাঠঠোকরা আর উইপোকা, কে কতটা সুযোগ নিতে পারে এই টসের, তা ক্রিকেট খেলার মতই অনিশ্চিত।

প্রকৃতি কি ভাবে এই হারজিৎ, এই থাকা-না-থাকার, জীবন-মৃত্যুর ছক সাজিয়ে রেখেছে তারই একটা অন্য উদাহরণ দি। বীজাণু সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অনেক দিনের। আবার বীজাণুনাশক রাসায়নিক বস্তু, যাদের আমরা বলি এ্যান্টিসেপটিক, সেগুলিও অনেক দিনের জানা। এমন পদার্থ আছে, যার এক কোটিভাগের একভাগ কোটি কোটি বীজাণুকে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। তবু মানুষের শরীরে বীজাণু উৎপাদিত কোন রোগই সারানো সম্ভব হচ্ছিল না যতদিন পর্যন্ত না ডম্যাক তথাকথিত সালফা ওষুধ আবিষ্কার করলেন। এই ওষুধগুলি রোগ আরোগ্যের পথে এক নতুন যুগের সূচনা করল। কিন্তু এটা সম্ভব হল কি করে। প্রাণীর বিপাকক্রিয়ায় যে ধরনের পদার্থ সৃষ্টি হয়। এই সালফা ওষুধগুলি রাসায়নিক দিক থেকে গঠনে এর কাছাকাছি, কিন্তু কাজে বিপরীত। সেইজন্যই জীবাণুদের বিপাকক্রিয়ার জগতে, একটা তুলকালাম, ওলটপালট সৃষ্টি করে, বীজাণুদের মানব দেহের ভিতরেই ধ্বংস হয়ে যেতে সাহায্য করে।

এর চেয়ে আর এক ধাপ, খুবই বড় ধাপ, অগ্রসর হওয়া গেল, যখন স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন। ব্যাপারটার একটু গভীরে যাওয়া যাক। আমরা জানি প্রকৃতির রাজ্যে, যেন সামঞ্জস্য রাখার খাতিরেই, রয়েছে খাদ্য-খাদক আবার তেমনি পারস্পরিক সাহায্যকারী। যাকে পরিভাষায় বলে মিথোজীবী। এই কাজের ইংরাজি প্রতিশব্দ দুটিও মনোরম এ্যান্টিবায়োসিস (antibiosis) ও সিম্বায়োসিস (Symbiosis)।

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং,—আজ যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম হয়েছে ফ্লেমিং-রাইট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট,—সেইখানে কিছু বিজাণুকে কালাচার টিউবে বাঁচিয়ে রেখে ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন, হয়ত কারো অসাবধানে, কালচার প্লেটের এক জায়গায়, একটুখানি ছাতা ধরে গেছে। অন্য কেউ হলে, কালচার প্লেটটা নষ্ট হয়েছে মনে করে, সেটা ফেলেই দিতেন। কিন্তু ফ্লেমিং লক্ষ করলেন, যে সেই ছত্রাকের চারিদিকেই জীবাণুগুলি মরে গেছে। দেখে তাঁর মনে হল, যে এই ছত্রাকের কোন তথাকথিত এ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতা আছে। যার জন্য কাছের জীবাণুগুলি মরে গেছে।

সেই আবিষ্কার, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, জীব-বিজ্ঞানে, রসায়ণে, এ্যান্টিবায়োটিক যুগের সূচনা করল। বেশী বলার অপেক্ষা রাখে না। আজ কারো অজানা নেই, কত রকমের এ্যান্টিবায়োটিক, আজ কত শত দুরারোগ্য ব্যাধির আরাম করছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে এত বড় ব্যাপারটা সম্ভব হল, ফ্লেমিং প্রকৃতির সামঞ্জস্য-লিপি, ঠিক ভাবে পাঠ করতে পেরেছিলেন বলে।

শ্রীমতী র‍্যাচেল কারসনের "নীরব বসন্ত" বইখানি, মনে বহু প্রশ্ন, বহু চিন্তার অগ্রদূত। তা আজ আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে, যে ডি-ডি-টির মত বস্তুর উপর শুধু ভরসা না করে জীববিজ্ঞানের সামঞ্জস্যচক্রকে কাজে লাগিয়ে জৈবিক কিছুর সাহায্যে ক্ষতিকর কীটকুলকে কি দমন করতে পারতাম না?

আগেই বলেছি, কীটদের দমন করার জন্য, যেমন তাদের মেরে শেষ করার চেষ্টা করা যায়, তার চেয়ে বেশী আঘাত দেয়া যায়, যদি ওদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে দিতে পারা যায়। কাজে কাজেই আমাদের আরো বেশী গবেষণার প্রয়োজন ছিল কীটদের বংশবৃদ্ধি রোধ করার কি উপায় করা যায় তাই নিয়ে। অবশ্য বংশ বৃদ্ধি রোধ করার কথা বুঝতে গেলে কীটপতঙ্গের শরীরতত্ত্ব নিয়ে বহু গবেষণা প্রয়োজন। কিন্তু তার আর কতটুকুই বা করা হয়েছে? জীববিজ্ঞানের তুলনায় পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নে গবেষণা অনেক বেশী ও দ্রুততর পদক্ষেপে হয়। তার ফলে হয় কি, কোন একটি সমস্যার উদ্ভব হলে পদার্থবিজ্ঞানী, রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার আর সাধারণ মানুষ, সকলেই তার সমাধানের উপায় চিন্তা করে। যদি এই কীটপতঙ্গের সমস্যার কথা ধরি, রাসায়নিকরা ডি-ডি-টির মত কীটনাশক আবিষ্কার করায়, মনে হল বুঝি এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তাই জীববিজ্ঞানের সাহায্যে যে সমাধান হতে পারত, সেদিকে আর নজরই দেয়া হল না।

এ রকম ঘটনা ইতিহাসে অনেক ঘটে। শক্তির কথাই ধরা যাক। এতদিন আমরা যে "ফসিল-ফুয়েল" নামধারী যে বস্তু ব্যবহার করছিলাম, তা ছিল কয়লা পেট্রল এইসব। এগুলি প্রাণীজাত। এ শেষ হয়েও যেতে পারে। এ রকম সম্ভাবনা যখন দেখা গেল, তখনও জীববিজ্ঞানে এর কোন সমাধানের চিন্তা করা হচ্ছে কি? অথচ জৈবিক পদার্থের মধ্যে হাজার হাজার পরমাণুতে গড়া বিশাল অণু দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির ভাঙাগড়ায় অনুঘটক ইত্যাদির কাজকর্মের যে বিস্ময়কর জগৎ, তার জ্ঞান হয়ত কোন সমাধানের পথ নির্দেশ করতেও

পারে। অবশ্য অনেকে বলবেন এ তো জৈবরসায়ন ঠিক জীববিজ্ঞান তো নয়। তা হক না। আমি যা বলতে চাইছি, তা হল, আমাদের মাথার মধ্যে যেন প্রকৃতির নিয়মের কথাটা প্রাণের সামঞ্জস্য রক্ষায়, যেন মনে থাকে।

প্রকৃতির রাজত্বে যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীই হক না কেন, তাদের কোন সমস্যার উদ্ভব হলে প্রকৃতিতে তার সমাধান, প্রাণীজগতের প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়। একটু আগেই সালফা ও পেনিসিলিনের আবিষ্কার জীবাণুকুলে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে, তা বলেছি। এমনকি হয়ত ভাবা গিয়েছিল, এর ফলে জীবাণুকুল বুঝি নির্মূলই হয়ে যায়। কিন্তু অচিকিৎসক বা অবিবেচক চিকিৎসকদের হাতে, পরিমিত ডোজে এ সব ওষুধ ব্যবহার না করায়, বীজাণুরা প্রাকৃতিক নিয়মেই নিজেদের বাঁচার পথ করে নিতে লাগল। পেনিসিলিন বা সালফা ইত্যাদিতে কোন ক্ষতি হবে না, এমনকি এদেরই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, এমন অণুঘটকও জীবাণুরা, তাদের পরিবর্ত্তিত জিন মাধ্যমে তৈরি করতে শিখল। তাই বারবার বলবার চেষ্টা করছি যে জৈব প্রকৃতির নিয়ম, ও তার সামঞ্জস্যচক্র আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে।

র‍্যাচেল কারসন আমাদের দৃষ্টি এই দিকেই ফেরাতে চাইলেন। পোকামাকড়ের মধ্যে যারা ক্ষতিকারক, তাদের বংশবৃদ্ধি রোধ করতে জৈবিক উপায় নির্দ্ধারণের গবেষণা বর্ত্তমানে চলছে। তার সামান্য আলোচনা করি। বংশবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন যৌন আকর্ষণের। প্রত্যেক প্রাণীর স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করতে পারে এমন মাধ্যম ও পরিবেশ তৈরি করে বা বেছে নেয়। জীব বিজ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা করতে সুরু করলেন কীট-পতঙ্গদের যৌন আকর্ষণের মাধ্যম কি? বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর এর উত্তর মিলল—ফেরোমন। কি এই ফেরোমন? আমাদের কাছে গন্ধ যে রকম, সেই ধরণের সহজে ধরা যায় না এই রকম গন্ধ জাতীয় বস্তু কীট-পতঙ্গদের শরীরে উৎপন্ন হয়। আমরা যেমন নাক দিয়ে গন্ধ গ্রহণ করি, ও তা আমাদের মস্তিষ্কের সাহায্যে উপলব্ধি হয়। কীট পতঙ্গদের তো মস্তিষ্ক, উপলব্ধি, এ সব তো দূরের কথা, এ সব গন্ধবস্তু তাদের শরীরের ভিন্ন জায়গায় উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তাদের বংশ বৃদ্ধির কাজের উত্তেজনা যোগায়। আর এদের বংশবৃদ্ধি তো হয় হাজারে হাজারে। কাজেই একবার সুরু হলে আর রক্ষা নেই।

এখন জীববিজ্ঞানীরা গবেষণার এমন পর্য্যায়ে পৌছেছেন, যাতে ফেরোমন

তৈরি বা সংগ্রহ করে, তাঁরা পুরুষ বা স্ত্রী কীটেদের মিলিত হতে না দিয়ে অন্যত্র আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন। এটা পুরোপুরি করা সম্ভব হতে আর কিছু গবেষণার প্রয়োজন। এটা পূরা হলে, তখন ইচ্ছামত বিশেষ কীটপতঙ্গের বংশবৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হবে। এই দিক থেকে যে গবেষণা, তা সফল হলে, যারা শত্রুতা করছে তাদেরই বিনাশ করার ব্যবস্থা এতে করা যাবে। ডি-ডি-টি বা ওই ধরনের জিনিসের প্রভাব যেমন উপকারী কীট পতঙ্গও মেরে, ভালর সঙ্গে আরো অনেক মন্দের সূচনা করেছে। তার বদলে, জীববিজ্ঞানের পদ্ধতির সাহায্য নিলে, হয়ত এ সমস্যার উদ্ভব হত না।

জীব বিজ্ঞানের পথ যে শুধু একটি মাত্র, যার উল্লেখ করলাম, তাই নয়। আরো কত উপায়ে কীটের সংখ্যাদমন করা সম্ভব তা বলা শক্ত। এখানে আরো দু একটি দিকের কথা বলছি। বিশেষ ডোজে এক্সরে প্রয়োগ করলে, বা ওই ধরনের অন্য উপায়ে, কীট পতঙ্গের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, যদিও যৌন ক্ষমতা সমানই থাকল। ওই ধরনের বন্ধ্যাত্ব রোগগ্রস্থ কীটেদের কাজে লাগিয়ে, কীটকুলের বংশদমন করা সম্ভব।

আমরা জানি খচ্চর জাতের প্রাণী নিজেদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। এদের বলা যায় এক বিশেষ শংকর জাতের প্রাণী। এইরকম শংকরজাতের পোকা স্বাভাবিক পোকার সঙ্গে মিশিয়েও, বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়া যেতে পারে।

মশার উপদ্রব দূর করতে মশা ডিম পাড়তে পারে, এমন কোন জলাধার রাখা হয় না ও কোন জলাধার থাকলে সে জলাধারে মশার শুককীট খেতে ভালবাসে, এমন মাছ রাখার ফলে বহু জায়গাতে অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে মশা দমন করা গেছে। এ সব জৈব উপায়ের উপকারিতা ডি-ডি-টি স্প্রে করার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, জীববিজ্ঞানের বিবিধ গবেষণায় অনুরূপ আবিষ্কারের চেষ্টাই বা কতটুকু হয়েছে? যখন শ্রীমতী র‍্যাচেল কারসন ডি ডি-টি ও অনুরূপ কীটনাশক কিভাবে প্রকৃতির সামঞ্জস্য নষ্ট করছে, সেইটা দেখালেন, তখনই বিভিন্ন বিকল্পের কথা ভাবতে গিয়ে জীববিদ্যা কি ধরণের বিকল্প দিতে পারে তা ভাবা হতে লাগল।

র‍্যাচেল কারসনের অনুপ্রাণীত গবেষণা কোন কোন লাইন ধরে অগ্রসর হতে লাগল, তার সামান্য একটু আলোচনা করি। যে সব অরগ্যানোক্লোরিন রসায়নের কথা বললাম, তারা কতটা সুদূর প্রসারী ক্ষতি করতে পারে তা দেখতে

গিয়ে ব্রিটেনে ১৯৬৪ সালে নেচার কনসারভেন্সির বার্ষিক রিপোর্টে এগারোটি প্রজাতীর সামুদ্রিক পাখীর বাহান্নটি ডিম পরীক্ষা করার কথা দেখি। এই পাখীগুলির খাদ্যাভ্যাস একেবারে বিভিন্ন রকমের ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে দেখা গেল, যে এইসব ডিমের মধ্যে উক্ত রাসায়নিক বস্তুগুলি পাওয়া যেতে লাগল। তবে কি অদূর ভবিষ্যতে, আমরা সকালে যে ডিমটি খেতে বসেছি, সেটিও ওইসব রসায়নের বিষে জর্জরিত হয়ে আমাদেরও ক্ষতি করতে পারে না?

ঠিক অনুরূপ পরীক্ষায় ছশো ছত্রিশটি মৃত পাখীর দেহ দেখা হল। দেখা গেল ছিয়ানব্বই শতাংশের দেহে ওইসব পদার্থ আছে। একটি ফড়িংয়ের দেহে চার রকমের অরগ্যানোক্লোরিন জাতের কীটনাশক পাওয়া গেল। ভারতেও কিছু কাজ যা করা হয়েছে, তাতে দেখা গেল যে চিতাবাঘ,বাঘও এইরকম কীটনাশকে মারা গিয়েছে। এমন কি হাতী পর্যন্ত কীটনাশক দুষ্ট কলা খেয়ে মরে গেছে, দেখা গেল পরীক্ষায়। পরীক্ষায় যা প্রকাশ পেতে লেগেছে তা যে কোন মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবে।

এই সম্পর্কে জেমস ফিসারের সতর্কতা মূলক একখানি বই ১৯৬৯ সালে বার হল। সতর্কতাটা যথেষ্ট প্রোজ্জ্বল করে তোলবার জন্য এ বইয়ের নাম তিনি দিলেন Red Book—লাল বই। এ বইখানি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওই বছরেই এক হুকুমনামা জারি করে এক মাসের মধ্যে, কোন বসতি অঞ্চলে ডি-ডি-টির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হল। ওই ঘোষণায় এও বলা হল যে এক বছরের মধ্যে সমগ্র আমেরিকাতে ডি-ডি-টির ব্যবহার নিষিদ্ধ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, যে সব প্রাণীর প্রজাতী নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, তাদের বাঁচানোর জন্য Endangered Specis Conservation Act নামে একটি আইন পাশ করলেন। সারা বিশ্ব জুড়ে বন্য প্রকৃতিতে যত প্রাণী আছে, তাদের রক্ষার জন্য জাতীপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত আলোচনা সুরু হল। সমস্ত সভ্য মানুষ শ্রীমতী র‍্যাচেল কারসনের সাবধান বাণী থেকে উজ্জীবিত বিজ্ঞানের সেই দিকটি—যার নাম ইকোলজি, Ecology,—তার চর্চায় মন দিল। আমেরিকার মত সুইডেন, ডেনমার্কও ডি-ডি টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল।

ফ্যাসানের জন্য যে সব প্রাণীর চামড়া ও লোম দিয়ে নানান রকমের জিনিস করা হয়, সেইসব প্রাণীকে বাঁচানোর জন্য আন্দোলন গড়ে উঠল। শুধু প্রাণীই নয় দক্ষিণ আমেরিকার এ্যামাজন অঞ্চলের যে মানুষরা লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে

তাদের ও পৃথিবীর অন্য এলাকার অনুরূপ প্রাচীন মানুষ ও তাদের জীবনচর্চাকে বাঁচানোর বিবিধ চেষ্টাও হতে লাগল পৃথিবীব্যাপী।

মানুষ একটু একটু করে যেন বুঝতে শিখছে যে তার নিজের বাঁচার জন্যই সমস্ত জীবজগতের উপর যত্নশীল হতে হবে। কেননা বাঁচা মানে একযোগে বাঁচা। বোঝা যেতে লাগল বিশেষ প্রাণীর প্রজাতীর দিকে নজর দেয়াই যথেষ্ট নয়। পূর্ণ জাগতিক পরিবেশের দিকেই দৃষ্টি দিতে হবে। নজরটা এইদিকে পড়ায় আজ প্রাণীজগতের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়ে গিয়েছে। ইকোলজি আসলে যেন একটি চাঁদোয়ার তলায় বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানকে এনে হাজির করে একটা নতুন বিজ্ঞান যেন গড়ে তুলেছে।

১৯৬৪ সালের নভেম্বরে জাতীপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান, চৌষট্টি থেকে শুরু করে পরবর্তী দশককে জলবিজ্ঞান দশক বা International Hydrological Decade বলে অভিহিত করল। সহযোগিতামূলক এই আন্তর্জাতিক গবেষণা যজ্ঞে, পৃথিবীর সব দেশকে যোগ দিতে ডাকা হল। এই গবেষণাগুলির মূল লক্ষ্য, সারা বিশ্বজুড়ে জলের অবস্থিতি চলাচল, জলসম্পদ, জলজ প্রাণী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা। পৃথিবীর সমস্ত নদী, সমুদ্র, হ্রদ, মাটির নিচের জল, সবই এর আওতায় এসে যায়। দেখা গেল যে প্রশ্নগুলির সঙ্গে একসঙ্গে জড়িয়ে আছে ভূমিক্ষয়ের প্রশ্নটিও। ভূমি ও তার বুকের উপরের গাছপালার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃষ্টি, তুষার, মেঘ, আদ্রতা, শুষ্কতা এইসব প্রশ্ন। দেখা গেল, ভূমিক্ষয়ের মুখোমুখী হয়ে রয়েছে পর্বতের সানুদেশ যেগুলি জাতীয় সরকারের সংরক্ষিত বনভূমি। সঠিক ব্যবস্থা না নিতে পারলে, ওইসব দেশের নদীগুলি, বনভূমি, বন্যপ্রাণী, ভবিষ্যতের বৃষ্টিপাত এমনকি দেশের মানুষেরা পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়বে। দশ বছরে কতটুকুই বা কাজ করা যায়? বাকী কাজে এইবার হাত না দিলে বিপদ। ১৯৬৪ সালে আন্তর্জাতীক বনবিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনও বিশ্ব খাদ্যসংস্থা মাদ্রিদ শহরে আহ্বান করেন। এই কংগ্রেসে বিরানব্বইটি দেশের দু হাজার আটশো জন বনবিজ্ঞানী যোগ দেন।

১৯৬৪ সালে মানব কল্যাণে জীববিদ্যার প্রয়োগের একটি পাঁচ বছরের প্রোগ্রাম চালু করা হয়। ওই বছরই শান্তিপূর্ণ ভাবে জলসম্পদ ব্যবহারের এক আন্তর্জাতিক সভা, আমেরিকার ওয়াশিংটন শহরে হয়। এখানেও কয়েক হাজার বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ্ যোগ দেন।

১৯৬৪ সালে ইউনেশকো একটি নতুন শব্দ। বায়োস্ফিয়ার—Biosphere বিশ্বকে উপহার দেন। বায়োস্ফিয়ার কথাটির মানে হল, জল-বায়ু-ভূমির যে পাতলা স্তরটি পৃথিবীর গায়ে, যেখানে প্রাণের অবস্থান সম্ভব। বায়োস্ফিয়ারকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, কি করে মানুষ ব্যবহার করতে পারে ও এর সম্ভাবনাকে কি ভাবে রক্ষা করা যায়, তাই ছিল ওই বছরে ডাকা একটি বিশ্ব সম্মেলনের উদ্দেশ্য। বহু জ্ঞান, যা এই সময়ের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছিল তা আলোচনার উদ্দেশ্যেই ছিল এই সম্মেলন। যেমন আজ কোন দূরাবস্থিত বনভূমিতে আগুন লাগা বা তার সম্ভাবনাও দেখা দিলে, ইনফ্রা রেড ফোটোগ্রাফির সাহায্যে তার খবর পাওয়া ও দূর করাও সম্ভব।

এইসব সম্মেলনের আলোচনা থেকে কয়েকটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে। দেখানো হয় যে অনেক সময়, সাময়িক লাভের খাতিরে মানুষ এমন কাজ করছে, যাতে সমগ্র স্থিতাবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। এই স্থিতাবস্থা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে, অন্য প্রাণী ও মানুষের মধ্যে, এমনকি মানুষ ও মানুষের মধ্যে। দেখানো হয় যে আসোয়ান ড্যাম, কি বৈকাল হ্রদের বিবিধ প্রকল্প, গুলি অবিমিশ্র আশীর্বাদই নয়।

ষাটের দশকে দেখা গেল, আবহাওয়া দূষণ এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যখন তা নজরে পড়বেই। পাখীদের ডিমের খোলা, বিশেষ করে শিকারী পাখীদের ডিমের পাতলা খোলা এরও মূলেও কিন্তু সেই আবহাওয়া দূষণ। ডিমের খোলা এত পাতলা হয়ে যেতে লাগল, যে তার উপর বসে, তা দিয়ে ডিম ফোটানই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। যে খাদ্যশৃঙ্খলে মানুষ বাঁধা, শিকারী পাখীরা অবশ্য তার বাইরে, তবু মানুষ চিন্তিত না হয়ে পারল না, তারও কারণ আছে। এর একটি কারণ হল এই যে, এ সমস্যা তো শুধু শিকারী পাখীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, হাঁস মুরগীর মধ্যে দেখা দিলে, তা মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলকেও বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

আবহাওয়া বহু বিচিত্র রকমে যে দূষিত হতে পারে বর্তমান যুগে। ১৯৬৭ সালের কথা। এক লক্ষ সতেরো হাজার টন কেরোসিনের বোঝা নিয়ে এক বিরাট জাহাজ "টোরি কেনিয়ান" ইংলিশ চ্যানেল দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সামুদ্রিক পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজটি ডুবে গেল। যদি এই বিরাট তৈলসম্ভার ইংলিশ চ্যানেলের জলে মেশে তা হলে এই এলাকার সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী ও

উদ্ভিদ বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভাগ্যক্রমে ট্যাঙ্কারের ভিতরে তেলটা বন্ধ ও সিল করা থাকায়, তা এককথায় বার হতে না পারলেও, ক্রমে তো সেটা বেরিয়ে আসবে, এ থেকে বাঁচানোর একমাত্র উপায় তেলটা জ্বালিয়ে দেওয়া। ইংল্যাণ্ডে তখন হ্যারল্ড উইলসনের মন্ত্রীসভা। মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক করে ঠিক হল যে ডোবা ট্যাঙ্কারে প্লেন থেকে বোমা মেরে তেলটা জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হোক। প্রথম বোমায় কোন ফল হল না। কিন্তু তার পরিবর্তে দুটি বোমায় ট্যাঙ্কারে আগুন ধরল ও পুরা তেলটা জ্বালিয়ে আবহাওয়া দূষণ বন্ধ করে ইকোলজির সামঞ্জস্য ও সমন্বয় রক্ষা করা গেল।

এই গল্পটি থেকে যা বার হয়ে আসে, তা হল এই যে, ইকোলজির সমস্যাগুলিকে যুদ্ধের মত গুরুত্ব দিতে হবে। ইংল্যাণ্ডে যে ঘটনাটির কথা উল্লেখ করলাম, সেখানে যেমন এটা করা হয়েছিল, সব জায়গায় সেটা করতে হবে। করতে হবে যেগুলি ছোট মনে হয় সে সমস্যাগুলি নিয়েও।

১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই, নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন এ্যালড্রিন ও মাইকেল কলিন্সকে নিয়ে তিনশো তেতাল্লিশ ফুট উঁচু, চোষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার পাউণ্ড ওজনের স্যাটার্ণ পাঁচ নামের যে মহাকাশ যানটি পৃথিবী থেকে উৎক্ষিপ্ত হল, তারই অংশবিশেষ নীল আর্মস্ট্রংকে নিয়ে চাঁদের বুকে নামল। এটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ফ্লরিডার কেপ কেনেডি থেকে চাঁদে পৌছনর চারদিন আগে, অর্থাৎ ১৬ই জুলাই তারিখে। ১৬ই জুলাই থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত প্রতিটি মূহুর্তের ছবি, টেলিভিশানের সাহায্যে, বিশ্বের সকলের দেখা সম্ভব হয়েছিল। এই দেখায় যেমন মহাকাশচারীদের ও তাদের যানটি দেখা গিয়েছিল, তেমনি দেখা গিয়েছিল, মহাকাশ যান থেকে এই সসাগরা পৃথিবীকে কি রকম দেখায়। পৃথিবীও যে একটি মহাকাশ যান, এই ধারণাটা আগে হয়ত ছিল। কিন্তু সঠিকভাবে তা দানা বাঁধল এই সময়। একটা গ্লোবের মত যা স্কুলের ছেলেরা দেখে, আমাদের এই পৃথিবীটা দেখে হয়ত অনেকেরই মনে হয়ে থাকবে, এই একমাত্র পৃথিবী, কিন্তু আমরা নিজেরা তার কি দুরবস্থা করেছি।

দুরবস্থা যে করেছি, এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তবু আমেরিকার ষ্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ পল আরলিখের মত এত পরিষ্কার ভাবে সেটা বোধহয় কেউই দেখতে পারেন নি। ইনি মানুষের জন্ম শাসনেরও একজন প্রবক্তা। এঁর মতে মানুষকে আজ জন্মশাসন

এমন ভাবে করতে হবে, যাতে এই পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি গুনাতে থাকে। কিন্তু সে কথা যাক। আরলিখের অন্য বক্তব্যে আসি।

আরলিখের মতে আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থা, বণ্টনব্যবস্থা ও জনসংখ্যা এ সবগুলিকে যদি অবিলম্বে একেবারে ওলট পালট করে না ফেলি, তা হলে মানব সভ্যতা অচিরেই ভেঙে পড়বে। কি ভাবে এই ধ্বংস আসছে, সে সম্পর্কেও আরলিখের অনেক বলার আছে। তাঁর মতে এই ধ্বংশ বহুমুখী।

পৃথিবীর আবহাওয়াতে মানুষ ক্রমশঃ কার্বন ডাই অক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। যদিও এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্বে করেছি, তবু পাঠককে মনে করিয়ে দিতে বলছি: গাছপালা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে তাদের সবুজ পাতার সাহায্যে। সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে গাছ এইভাবে তার খাদ্য উৎপাদন ও সঞ্চয় করে। বলা বাহুল্য আমাদের যে বিপুল খাদ্যসম্ভার, যা আমরা গাছ থেকে পাই তাও এইভাবেই গাছ তৈরি করে। কার্বন ডাই অক্সাইড গাছ যখন নেয়, তখন অক্সিজেন ছাড়তে থাকে। এই অক্সিজেনই আমাদের শ্বাসবায়ু। মানুষের জনসংখ্যা এখন অসাধারণ স্ফীত হয়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে গাছপালা কেটে কেটে আমরা শেষ করে আনছি। তা ছাড়া আমাদের কল-কারখানা এ সব তো আছেই। ফলে পৃথিবীর আবহাওয়াতে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছেই। আর সেই সঙ্গে আমাদের নিঃশ্বাসের অক্সিজেন কমছে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের একটা গুণ হল যে তা উত্তাপকে ধরে রাখতে পারে। যেমন রাখে থারমোফ্লাস্কের দর্পণ কাঁচ। এর ফলে পৃথিবীর নিজের উত্তাপ বাইরে ছড়িয়ে যেতে না পারায়, পৃথিবী একটু একটু করে তপ্ত হয়ে উঠছে। এ তাপ বেশী বাড়লে এক মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হবে। আমরা জানি, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে চিরতুষার হয়ে রয়েছে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি টন জল। পৃথিবীর উত্তাপ বাড়ার জন্য যদি এই মেরুতুষার গলে যায়, তা হলে সারা পৃথিবী বন্যায় ভেসে যাবে। বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে দেখেছেন যে মেরু তুষার জল হয়ে গেলে লণ্ডন নিউইয়র্ক, টোকিও, কলকাতা এ সব সহরে তো হয়ে যাবে অথৈ জল। আর দিল্লী, মস্কো, ওয়াশিংটন এ সব সহরও বন্যাপ্লাবিত হবে। বৃষ্টি ছাড়াই বাইবেলে বর্ণিত নোহর সময়কার প্লাবন আমরাই ডেকে আনছি। বাইবেলে বর্ণিত সদাপ্রভু কি একেই মানুষের পাপ বলে তাদের শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন?

এ তো গেল একদিকের কথা। আর একটি ও কতকটা বিপরীত সম্ভাবনার কথাও আরলিথ মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন যে পরিমাণ ধূলি, ধোঁয়া ইত্যাদি ছোট ছোট কণিকাসমন্বিত বস্তু আবহাওয়াতে আমরা ছড়িয়ে দিচ্ছি, এর ফলে সূর্যের উত্তাপ ও আলো পৃথিবীতে অনেক কম পৌছবে। সেজন্ত আমরা হয়ত শীতে ক্রমেই ধ্বংস হয়ে যাব।

তা ছাড়া, অক্সিজেন দেয় যে উদ্ভিদজগত, তার উপর অকারণ নিষ্ঠুর হয়ে আমরা হয়ত নিজেদের শ্বাসরোধ করেই মারতে বসেছি। যদি নিজেদের তৈরি আনবিক বোমায় নিজেদের না মারি তবে মেরে ফেলব. নিজেদের হাতে গড়া আবহ দূষনে। আবার এ সবগুলো হয়ত একযোগে ঘটতেও পারে। তখন ?

"বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধরে—
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন
"কথা কও কথা কও"
বলবেন, "বলো, তুমি সুন্দর"
বলবেন, "বলো, আমি ভালবাসি ?"

—রবীন্দ্রনাথ

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান

রবীন্দ্রনাথের সেই "মায়ার খেলা।"

নাটকের গানখানি,

"আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।"

কিন্তু সে বিষ পানের মধ্যে ছিল প্রেম। হয়ত সে প্রেমে সুখ নেই, তবু তা প্রেম। তার কাছে সুখ তুচ্ছ। কিন্তু বর্তমানের মানুষ আজ তার অস্তিত্বের মূলেই অধিরোপন করে চলেছে বিষ। এ বিষ যেন পান করছে তার সমগ্র সত্তা বুঝি চিরতরে নিজেদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে। বিশ্ব বিশ্রুত মনোবিদ্ ফ্রয়েড যেমন বলেছেন, মানুষের সত্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে যেন প্রেমের দেবতা "ইরস," আর মৃত্যুর দেবতা "থেনাটস"। ইরস আমাদের বাঁচার দিকে, প্রেমের দিকে সৌন্দর্যের দিকে, সৃষ্টির দিকে টানছে। আর থেনটস আমাদের মৃত্যুর দিকে, শূন্যতার দিকে টানছে। ইরস বা থেনাটস থাক, নাই থাক, জীবনের তথাকথিত ডাইলেকটিকসের এমনিই হবার কথা। ডাই-লেকটিকসের নিয়ম অনুসারে তার একদিকে থিসিস, অন্যদিকে এ্যান্টিথিসিসের বৈপরীত্য। এরই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলা, যাকে সিন্থিসিস বলে, তাই চলেছে। যদি এর মধ্যে এন্টিথিসিস প্রবল হয়ে ওঠে, তখন শুধু অস্তিত্বরক্ষার জন্যই অনেক কথা ভাবতে হয়।

জাতীপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের হিসাব অনুযায়ী, বৃটেনের শতকরা আটাত্তর ভাগ, অস্ট্রেলিয়ার সাতাশী ভাগ, আমেরিকা ও ক্যানাডার আটাত্তর ভাগ লোক সহরের বাসিন্দা। আজকালকার মানুষ সহরে বাস করাটাকেই যেন সৌভাগ্য বলে মনে করে। অবশ্য সহর বাসের কতকগুলো সুবিধা অবশ্যই আছে কিন্তু তাই তো আর পুরোটা নয়। অল্প জায়গায় বেশী লোক যেটা হল সহরের প্রথম কথা সেটা কয়েকটি গুরু সমস্যার সৃষ্টি করে। এগুলি হল মানুষ ও জিনিসপত্রের চলাচলের প্রশ্ন ও তাদের সৃষ্ট বিবিধ আবর্জনা দূর করার প্রশ্ন।

চলচলের সমস্যার কথাটা উঠল তাই পিটার ভাউন বলে এক ইঞ্জিনিয়ার স্থপতির মতামতটা উল্লেখ করি। উক্ত স্থপতি জগতের আধুনিকতম সহর-গুলিকে পর্যন্ত হিসাবের মধ্যে ধরে বলছেন যে, অন্ততঃ একটা ব্যাপারে গত আড়াই হাজার বছরে সহরগুলো বদলায় নি। যত আধুনিকই করার চেষ্টা হক সহরকে, সহরগুলো আজও "পায়ে-হাঁটা" লোকেদেরই উপযোগী। বক্তব্যের মধ্যে যে যুক্তিটা আছে তা যেন আমাদেরও কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ধরা যাক বিশ্ব বিখ্যাত ফরাসী স্থপতি লে কুরভাজিয়রের চণ্ডিগড় সহর। আর না হয় তো লস এ্যাঞ্জেলেসই। লস এ্যাঞ্জেলস ও তার ড্রাইভ ইন হোটেল, মোটেল, ড্রাইভ ইন সিনেমা, ড্রাইভ ইন ব্যাঙ্ক সমস্যার খুব একটা সমাধান করেছে কি? আর চণ্ডিগড়ের সমস্যা তো সবে দেখা দিতে সুরু করেছে।

সহরের ইঞ্জিনিয়ারিং স্থাপত্যের দিকটা নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা বেশী করব না। কারণ যে সমস্যার সমাধান ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইড বা কুরভাজিয়-রের মত স্থপতি বাৎলে যান নি, সেখানে বর্তমান লেখকের মৌনব্রতই সমীচীন। তবু বেশ কিছুদিন আগে পড়া ফ্রাঙ্ক লয়েড রাইটের আত্মজীবনীর কথা মনে পড়ছে। যে সৌন্দর্য প্রকৃতিজাত, তারই অনুকরণে মানুষকে পড়তে হবে। আরাম করে কথা বলবার সময় যেমন হাতের উপর হাতটি রাখা হয় তেমনি করে থাকবে একটি দেয়াল আর একটি দেয়ালে। এমন হতে হবে ঘরবাড়ীকে, যেন তার একটা ব্যক্তিত্ব থাকে। কিন্তু আজ সেই নগরগুলি, আর তাদের জীবন বিরূপ ব্যক্তিত্ব আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সেটাই ভেবে দেখা যাক।

রান্নার জন্যই হক, আর কোন কলকারখানায় কাজের জন্যই হক, জ্বালানি হিসাবে কোন কিছুকে ব্যবহার করলেই, তার ফলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড তৈরি হবেই। এর কারণ সব জ্বালানির মূল উপাদন কার্বন বা কয়লা আর তা না হলে এর অন্য কোন যৌগিক পদার্থ। কয়লা বা পেট্রলের মত অন্য তেল যাকে আমরা বলি ফসিল-ফুয়েল সেগুলি তৈরি হয়েছে যুগ যুগ ধরে মাটির তলার চাপে থেকে। অঙ্গারের সঙ্গে এই সব ফসিল ফুয়েল তৈরিতে ছিল হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, গন্ধক, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি পদার্থ। এই জন্য জ্বালানী ব্যবহার করলেই শুধু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নয়, অন্য যে বস্তুগুলির কথা বললাম, তাদেরও অক্সাইড বা অন্য

যৌগিক পদার্থও সেই সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়। যেমন গন্ধক থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড হয়। কার্বন বা অঙ্গারের সবটা হয়ত অন্য পদার্থের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরোটা কার্বন-ডাই-অক্সাইড হতে না পেরে, অনেকটাই কার্বন মনোঅক্সাইড হয়। এটি প্রচণ্ড রকম বিষাক্ত।

কাজেই যত সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কলকারখানা করা হক, তাতে ধোঁয়া থাকবে আর সঙ্গে যে বস্তুগুলির কথা বললাম, ধোঁয়াটা আবার হল, না জলা ইন্ধনের খুব ছোট ছোট কণিকা যা, বাতাসে ভেসে থাকে। যেখানে টেম্পারেচার খুব বেশী সেখানে বাতাসের নাইট্রোজেনের কিছুটা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে নাইট্রিক এ্যাসিডও হয়। অক্সিজেনের সমগোত্রিয় যে ওজোন গ্যাস তার সঙ্গে নাইট্রোজেন খুব সহজে মিশে যেতে পারে, এই থেকেই যাকে স্মগ বলে তাই তৈরি হয়। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণের সহরে ও দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন সহরে এই স্মগের প্রাদুর্ভাবে যে কি মারাত্মক স্বাস্থ্যহানী হয়েছিল তা খবরের কাগজের মাধ্যমে আমরা জানি। কলকারখানা যতটা আবহাওয়াতে দুষণের জন্য দায়ী, দেখা যাবে যে পাশ্চাত্য দেশে মোটর গাড়ীর ধোঁয়াও ঠিক ততটাই দায়ী। এ ছাড়া ফ্লুরিন, পারদ, ক্যাডমিয়াম সীসা ইত্যাদি যৌগিক উপাদানও সহরের আবহাওয়া দুষনে অংশ নেয়।
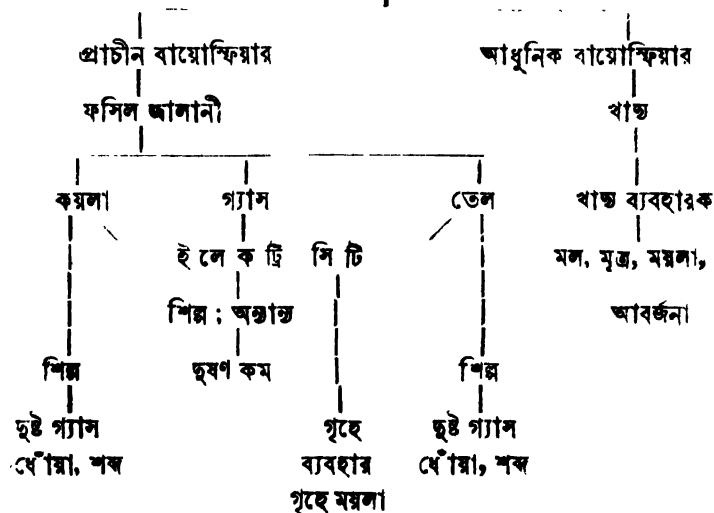
বংশপরম্পরা বোঝাতে আমরা যে রকম কুলুজিপত্র তৈরি করি, আবহাওয়াকে বিষাক্ত করতে সেই রকম জিনিসগুলির বংশপরম্পরা ছক আগের পৃষ্ঠায় কেটে দিলাম।

এই ছকটি থেকে দেখা যাবে যে ভাল হোক মন্দ হোক সব কিছুর উৎপাদক সূর্যালোক। বায়োস্ফিয়ার কথাটা এর আগে ব্যবহার করা হয়েছে। পৃথিবীর একটু উপর থেকে কিছুটা তলা অবধি প্রাণের ধারক ও বাহক যে স্তর তাই বায়োস্ফিয়ার। প্রাচীন বায়োস্ফিয়ার আমাদের জ্বালানি রেখে গিয়েছে কিন্তু আধুনিক বায়োস্ফিয়ার শুধু খাদ্য তৈরী করেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে শক্তি কোথা থেকে পাব তা ভেবে দেখতে হবে।

যখন আমরা বলি, "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর", তখন নগর সভ্যতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে শিল্প, তাকে গড়ার ব্যাপারে ও তার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, সেই হতাশাতেই ওই উক্তি।

শিল্পায়নের যে সমস্যা, তা বহুমুখী। যেখানে শিল্পায়ন হচ্ছে সেখানে লোকসংখ্যাধিক্য, তার সঙ্গে তাদের ফেলা বিবিধ আবর্জনা, সংখ্যাধিক্যের আনুসঙ্গিক নৈতিক সমস্যা। এ সব তো আছেই। তা ছাড়া এস্থেটিক বা সৌন্দর্যতত্ত্বের সমস্যা, যার সঙ্গে শব্দাধিক্যের সমস্যা এ সবও আছে। আর সব চেয়ে বড় হল, আবহাওয়ার আলো, বাতাস, জল, মাটি এ সবও যে ভাবে দূষিত হচ্ছে সে সমস্যা ভয়াবহ।

শিল্প বলতে যে ছবি আমাদের সামনে এসে হাজির হয়, তা হল সারি সারি কতকগুলো চিমনি, যা থেকে কালো ধোঁয়া আবহাওয়াটাকে অন্ধকার, নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। শিল্পের ছবি যদিও এই, তবু যে কোন শিল্পপতির বাসনা হল, জ্বালানির প্রতিটি কণা পর্যন্ত এমন ভাবে ব্যবহার করা যাতে ধোঁয়া হয়ে এক কণা জ্বালানিও যেন নষ্ট না হয়। কিন্তু শুধু বাসনাতেই তো আর কাজ হবে না। যে সব শিল্পে তেলকে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রচুর পরিমাণে গন্ধকজাত সালফার ডাই-অক্সাইড আবহাওয়াতে জমা হয়।

এইজন্য শিল্প জগতের ক্রমবর্দ্ধমান চেষ্টা হল এমন জ্বালানি ব্যবহার করা যা বেশী উত্তাপ দেবে ও যার বেশীর ভাগটাই জ্বালানো যাবে। কিন্তু সমস্যা হল এ ধরণের জ্বালানিতে উত্তাপ অনেক বেশী হয় বলেই বাতাসের নাইট্রোজেনকে তা অক্সিজেনের সাহায্যে নাইট্রিক এ্যাসিড ও নাইট্রোজেনের বিবিধ অক্সাইডে

পরিণত করে। এতে সমস্যাটা বাড়ল বই কমল না। সম্প্রতি নিকোলাস হোমস নামে এক রাসায়নিক, আবহাওয়াতে যে গন্ধকের অক্সাইড রয়েছে, তা থেকে গন্ধক ফেরৎ পাবার উপায় আবিষ্কার করেছেন এটা একটা আশার কথা। এই ধরনের আরো আবিষ্কার কিছু কিছু হয়েছে। এ থেকে আশা করা যেতে পারে যে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পের ধোঁয়াকে আয়ত্তের মধ্যে আনা যাবে। ব্যাপারটা হয়ত একটু খরচের ব্যাপার। কিন্তু আবহাওয়া দূষণ বন্ধ করতে যদি খরচ হয় তো তা করতে হবে। এটা বোঝাতে হবে সারা পৃথিবীর সমাজ সচেতন মানুষকে, যে আবহাওয়া সংরক্ষণের কাজটার অর্থমূল্য যাই হক না, তার হিসাব অর্থমূল্যে করা চলবে না। কারণ এ প্রশ্ন বেঁচে থাকার। জীবনের মূল্যায়ন টাকা দিয়ে হয় না।

বর্তমান দশকে আবহাওয়া দূষনে মোটরগাড়ীর অবদানটা যে কত বড়, তা আমাদের মালুম হচ্ছে। লম্বা লম্বা ট্রাফিক জ্যাম, ধোঁয়া যে ধোঁয়াকে আজকাল ইংরাজি ভাষায় স্মোক না বলে স্মগ বলা হয়, সেই সঙ্গে রয়েছে চিত্তবিভ্রান্তকারী শব্দ, সবটা জড়িয়ে আজ মোটর গাড়ীকে সভ্যতার আশীর্বাদ না ভেবে, সভ্যতার অভিশাপ বলেই ধরা হচ্ছে। গ্রেট বৃটেনের গাড়ীর ড্রাইভাররা বোধ হয়, পৃথিবীর সতর্কতম, তবু সে দেশেও বছরে সাত হাজার গাড়ীর এ্যাকসিডেন্ট হয়। শুধু এ্যাকসিডেন্ট বললে খুবই কম বলা হল, বৃটেনে সাত হাজার লোক মোটর এ্যাকসিডেন্টেই শুধু বছরে মারা যায়। এ থেকেই সহজে বোঝা যাবে, তা হলে অন্য দেশের অবস্থাটা কি।

হিসাব করে দেখা গেছে যে এক মাইল চলায়, একখানা মোটরগাড়ী, কুড়ি গ্রাম কার্বণ মনোক্সাইড, চার গ্রাম নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড, ও তিনগ্রাম বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন উৎপাদন করে। এর আগে উল্লেখ করেছি কার্বন মনোক্সাইড প্রাণঘাতক ও হতে পারে। এমনকি বর্তমানে আমেরিকায় আত্মহননে মোটরগাড়ী ষ্টার্ট দিয়ে, তার একজষ্ট ফিউম একটা নলে করে ভিতরে আসতে দিয়ে ও কাঁচগুলি বন্ধ করে রেখে, আত্মহত্যা করাটাও একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য প্রতিনিয়ত যে কার্বন মনোক্সাইড গাড়ী তৈরি করে যাচ্ছে, তা আমাদের পক্ষে বিষাক্ত হয়ে উঠছে না, তার কারণ তা বৃহত্তর আবহাওয়াতে সেখানের অক্সিজেন ও ওজোনের সাহায্যে কার্বণ ডাইঅক্সাইডে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু আবার এটা হতে গিয়েও তা আমাদের নিশ্বাস বায়ু অক্সিজেন নষ্ট করছে না কি ?

গাড়ীর তথাকথিত যোগ্যতা, যার মধ্যে গতিটাই বড় কথা, তা বাড়াতে আজ যে রকম সব গাড়ী তৈরি হচ্ছে, তাতে উপরে বলা দোষগুলো, না কমে বরং বেড়েই যাচ্ছে। সেই সঙ্গে কোন দেশে জনপিছু কত গাড়ী, তার হিসাবে কোন দেশ কতটা এগিয়ে তার হিসাব হয়, এমনিই আমাদের সভ্যতা। উন্নতির আগুপিছু হিসাব করতে, কোন দেশ কত টন হুইস্কি গলাদ্ধকরণ করে বা কত এ্যাস্পিরিণ খায়, এ হিসাব দেখিয়েও আমরা গর্ববোধ করি। তথাকথিত উন্নততর মোটরগাড়ী তৈরির ফলে কি হয়েছে, তার একটা হিসাব নেয়া যাক। এ হিসাবটা ১৯৭০ সালের বৃটেনের। হিসাব করে দেখা গেছে, ওই বছর বৃটেন ছ কোটি টন কার্বন মনোক্সাইড বৃটেন শুধু গাড়ী থেকেই পেয়েছে। ভাগ্যিস এ পৃথ্বী বিপুলা, আর কার্বন মনোক্সাইডকে খারিজ করে কার্বণ ডাইঅক্সাইডে পরিণত করা সম্ভব, তা না হলে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াত সহজেই বোঝা যায়।

একজন আমেরিকান বায়োফিসিসিষ্ট হিসাব করে দেখিয়েছিলেন, যে মানুষ যত রকমের যানবাহন আবিষ্কার করেছে, ও ব্যবহার করে তার মধ্যে মোটর গাড়িই হল সব চেয়ে বিপদজনক। এর কারণ হিসাবে তিনি বলছেন ; কোন লাইনের উপর দিয়ে না চলে, খোলা রাস্তা, মাঠ-ঘাট, এমনকি এবড়ো খেবড়ো জায়গায় মোটর দ্রুত গতিবেগে চলে, তবু এর যাত্রীদের নিম্নতম বাঁচার উপায় হিসাবে কোন বেল্ট কোমরে থাকে না। তার ফলে ধাক্কা লাগালে তার পুরো চোটটা শরীরের বিভিন্ন স্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে জীবন বিপন্ন করে তোলে। মোটর গাড়ীর এ্যাকসিডেন্টটার প্রায় সবগুলোই হয় কোন কিছুর সঙ্গে গাড়ীর অংশবিশেষের ধাক্কায়। এই ধাক্কার চোটটা সামলাতে কোন কুশনও গাড়ীর বডিতে কি বাম্পারে থাকে না। থাকলে তা কত পুরু করতে হত তা বলা শক্ত। তর্কের খাতিরে, যদি এরকম জিনিস করা সম্ভবও হত, তবু হঠাৎ ধাক্কার প্রভাবে রক্তচাপ ও শ্বাসের কাজ ব্যাহত হয়ে মৃত্যুও হতে পারত।

মোটরগাড়ীর চেয়ে একমাত্র স্কুটার ও মোটর সাইকেলই বেশী বিপদজনক। আবহাওয়া দূষণে এরা সাইজের অনুপাতে খুবই কৃতী। তা ছাড়া বিরক্তিকর শব্দ করাতে এদের জুড়ি নেই। দীর্ঘদিন মোটর সাইকেল চালিয়েছেন, এ রকম লোকের শ্রবণশক্তি কমে যেতে দেখা গেছে।

আধুনিক সহরের অনেকগুলিতেই ট্রাম, বাস ও ট্রেন, বেশীর ভাগ লোকে

যাতায়াতের জায়গায় যোগাযোগ স্থাপন করছে। একসঙ্গে অনেক লোক নিয়ে যায় বলে, মাথাপিছু আবহাওয়া দূষণ এতে প্রত্যেকের নিজস্ব গাড়ীর তুলনায় কম। তাই বর্তমানে যেমন কোন দেশে মাথাপিছু কত বেশী গাড়ী, থেকে দেশের স্বচ্ছলতা বোঝা যায়, ভবিষ্যতে এ ফ্যাসান উল্টে যাবে। অন্তত মানুষ ও তার সভ্যতাকে বাঁচাতে এটা করতেই হবে। তা ছাড়া মাথাপিছু যতটা শক্তি যে মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে, তাও যৌথগাড়ীর তুলনায় প্রাইভেট গাড়ীর অনেক কম। অবশ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টকে অনেক সুবিধা জনক ও আরামপ্রদ করার কাজ বাকী আছে, এটা স্বীকার করতেই হবে। আমেরিকার সানফ্রানসিসকো সহরে, বে—এরিয়া-র‍্যাপিড ট্রানজিট (বেট—BART) নাম দিয়ে যে চলাচল ব্যবস্থা করা তা অতি আধুনিক ও তা কম্পুটারের সাহায্যে চালানো হয়। বাড়ী থেকে ফোনে ডায়াল করে বাস পাবার ব্যবস্থা হল্যাণ্ডের আমষ্টারডাম সহরে করা হয়েছে। তবে এর সাফল্য কতকটা সীমাবদ্ধ।

অবশ্য মোটর গাড়ির শিল্প, যা সারা বিশ্বেই তথাকথিত বিগ বিজনেসের হাতে, তারা আমাদের দেশে কিছু না করলেও, ওদেশে আবহাওয়া দূষণ ও এ্যাকসিডেন্ট কমানোর গবেষণা করে থাকেন। তথাকথিত পিষ্টণ এঞ্জিন দীর্ঘদিনের ইতিহাস নিয়ে এমনভাবে আমাদের মনে বদ্ধমূল, যে তাকে যে বাদ দিয়ে অন্য প্রক্রিয়াতে মোটর চালানর কথা যেন এখনও ভাবা যাচ্ছে না। এমনি নতুন ভাবনাই আজ সবচেয়ে আগে দরকার। কিন্তু পিষ্টন ছাড়া অন্যরকম ইঞ্জিন তো আর বলার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে না, তাই আজ চেষ্টা হচ্ছে দূষিত গ্যাসের কি করা যায়। ভাবা হচ্ছে কার্বন ঘটিত সমস্ত গ্যাসকে কি করে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এটা সম্ভব উপযুক্ত অনুঘটক ব্যবহার করতে পারলে কিন্তু এই অনুঘটক প্লাটিনামের কোন যৌগিক পদার্থে তৈরি করা সম্ভব। এই জন্য খরচটা ভীষণ বেশী। এর আর একটা অসুবিধা হল এই যে এতে পেট্রল খরচাও একটু বেশী।

পেট্রল বাদ দিয়ে আরো পরিচ্ছন্ন জ্বালানি কি ব্যবহার করা যায়, এ ও ভেবে দেখা উচিত। নেপথেন, ওলিফিন, প্যারাফিন ইত্যাদি জ্বালানি হয়ত এ রকম হতে পারে। মনে হয় গঠন প্রনালীর দিক থেকে যে সব বস্তুর জটিলতা কম, তাদের ব্যবহার করলে দূষণও কম হবে। তাই ভাবা হচ্ছে যদি মিথেন কি বিউটেন জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তা হলে হয়ত আবহাওয়া

দূষন কমে যেতে পারে। এ সব জ্বালানির আর একটা অসুবিধা হল, আমাদের ঘরের উত্তাপে এগুলি বায়বীয় অবস্থায় থাকে, সেই জন্য গাড়ীতে রাখতে হলে অনেক বড় ট্যাঙ্ক দরকার হবে।

১৯৩৫ সালে কাজ সুরু করে ফিলিক্স ওয়াঙ্কেল, পিষ্টন ইঞ্জিনের বদলে রোটারি ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। এই ইঞ্জিনে আশা হল যে পিষ্টন টাইপের ইঞ্জিন হয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু হাজার হলেও পিষ্টন ইঞ্জিনের বয়স একশো বছরের উপর, দুদিন আগে তৈরি রোটারি ইঞ্জিন এত সহজে কি তাকে হারিয়ে তার স্থান দখল করে নিতে পারে? কিন্তু আশা করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতে একদিন, রোটারি ইঞ্জিন পিষ্টন ইঞ্জিনকে হটিয়ে দিতে পারবে কারণ এ ইঞ্জিনে আবহাওয়া দূষন কম, এ ইঞ্জিন সস্তা ও বেশী টিকসই হবে। তবে এটা হয়ে উঠতে আরো বেশ কিছুদিন লাগবে মনে হয়।

অনেক ইঞ্জিনিয়ারের মতে, মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন, যাকে টেকনিক্যাল ভাষায় বলে ইণ্টারন্যাল কম্বাস্চান ইঞ্জিন, তাকেই বর্জন করতে হবে। তার বদলে ব্যবহার করতে হবে ষ্টিম ইঞ্জিন, গ্যাস টারবাইন ইঞ্জিন, ইত্যাদি। এই লাইনে কাজ চালিয়ে এখন র‍্যানকিন ভেপার সাইকেল ইঞ্জিন বলে এক ধরণের ইঞ্জিন তৈরি করা গেছে। এতে জল ছাড়া অন্য তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। সেই তরল পদার্থটি বার বার ব্যবহার করা যায়। খরচাও খুব বেশী হবে না। কিন্তু এখনো আমেরিকাতেও এ ধরনের গাড়ী তৈরি হতে সুরু হয় নি। কাজেই এটা এখনো আলোচনার পর্যায়েই আছে। এর থেকে বরং টারবাইন ইঞ্জিনের সম্ভবনা ভাল। তবে এও তৈরি হবার আগে আরো গবেষণা প্রয়োজন।

এবার একবার ফিরে তাকানো যাক। ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে, এই ধোঁয়ার সমস্যার কথা নিয়ে অনেক দিনই তো চিন্তা করা হচ্ছে দেখা যাক কতটা এগিয়েছে। শিল্পধূমে যে স্মগের উদ্ভব হয়, তাতে ১৯৫২ সালে লণ্ডনে চারহাজার লোক মারা গিয়েছিল। সেই জায়গায় ১৯৬২ সালের মৃত্যু সাড়ে সাত শো। কমেছে বলতে হবে। অথচ এই স্মগ দূর করতে খরচ পড়েছে মাথা পিছু বছরে পনেরো পেনি মাত্র। সেই জায়গায় আমেরিকার লস এ্যাঞ্জেলেস সহরে, যেখানে স্মগ তৈরির জন্য দায়ী মোটর গাড়ী, সেখানে স্মগের সময়ে দশ হাজার লোককে সহর ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়েছিল। যারা

সহরে রইল তাদের ছুটোছুটি কি বেশী পরিশ্রম করতে বারণ করা হয়। এমন কি ছেলেমেয়েদের স্কুলে ড্রিল বা খেলা ওই সময়ে বন্ধ রাখতে বলা হয়। এই হল ছবি।

যদি গাড়ী ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুতে চালান হত, তাহলে আবহাওয়া কলুষিত করার প্রশ্নটা প্রায় থাকত না বলা যায়। হয়ত এখনো পর্যন্ত আমাদের যতটা জ্ঞান আছে, তাতে ব্যাটারি, যাতে রাসায়নিক পরিবর্তনকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে সেই বিদ্যুৎ শক্তিকে গাড়ী চালানর কাজে ব্যবহার করার কথাই ভাবা হচ্ছে। তবে গাড়ীর জন্য এ ধরনের সেল তৈরির কয়েকটি সমস্যা এখনও সমাধান হতে সময় লাগবে। এপলো মহাকাশ যানের, হাইড্রোজেন অক্সিজেন সেল, গাড়ীতে ব্যবহার করা যাবে না, তাই একটু অন্যরকম কিছুর কথাও ভাবা হচ্ছে। এ ধরনের সেলে সস্তা অনুঘটকের প্রশ্নটা একটা বড় কথা।

সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করে যেমন বাড়ীর নিত্যপ্রয়োজনের বিদ্যুত পাবার কথা ভাবা হচ্ছে, তেমনি গাড়ী চালাতে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করার কথাও মনে রাখা হয়েছে। সৌরশক্তি একসঙ্গে দিচ্ছে তাপ ও আলো। কয়েকটি প্রতিফলকের সাহায্যে এই শক্তির উত্তাপকে বিদ্যুতে পরিণত করে, গাড়ী চালানো যেতে পারে। তার ছাড়া ক্যাডমিয়াম ধাতুর কোটিং দিয়ে তৈরি ক্যাডমিয়াম সেল, সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। একটি ছোট প্যারাগ্রাফে যত সহজে কথাটা বলা হল, করাটা এত সহজ নয়। সূর্যের তাপ দিয়ে প্রথমে জল বা অনুরূপ কোন তরল পদার্থকে তপ্ত করতে হবে। তারপর তা থেকে আবার শক্তি উৎপাদন। দস্তা উৎপাদনের মাধ্যমে ক্যাড-মিয়াম পাওয়া যায়। তাই এর দাম ও উৎপাদন আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না তাই এখনই আমাদের আশা করার সময় আসে নি। তবে আজকের গবেষণা এই পথেই করতে হবে।

আবহাওয়া দূষনে মোটরগাড়ীর হাত কতটা, আর দূষন কমাতে কি করা সম্ভব, তা নিয়ে কিছু আলোচনা হল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বোধ হয় আলোচনা করা উচিত। সেটা হল মোটর শিল্প ও শিল্পপতিদের কথা। আজ মোটর শিল্প বলতে অতি বৃহৎ শিল্প বোঝায়, আর পিছনে বিরাট বিরাট ধনীরা একদিন যখন সস্তায়, সহজে পেট্রল পাওয়া যাচ্ছিল, আর তার পিছনেও বিরাট

শিল্পপতি ধনী ও বৃহৎ শিল্পের আয়োজন। এই শিল্পও যে কত বিশাল, তা বোঝা যায় তেল নিয়ে যাবার জাহাজের মাপ ও ওজনের কথা ধরলে। ১৯৬৪ সালে তৈরি একখানি ট্যাঙ্কারের ওজন ছিল দু লক্ষ সাতাশ হাজার টোন। টন নয়, টোন। যাইহোক এই দুই বিরাট শিল্পের সহযোগিতায়, মোটরশিল্প, তাদের কারিগরী, তাদের ডিজাইন সব কিছুই এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, যখন তারা যা দিচ্ছে তাই নেয়াটা হয়ে উঠেছে ফ্যাসান। ষাটের দশকে জেনারেল মোটর্সের অধিকর্তা বলেছিলেন, যে যা জেনারেল মোটর্সের কল্যাণ, তাই আমেরিকার কল্যাণ। অথচ কি কল্যাণ যে হয়েছে তা তো দেখাই গেল।

মোটরশিল্প যখন এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তখন পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক গভর্ণমেন্টের উপর যে এ শিল্পের চাপ থাকবে, তাতে সন্দেহ কি? কাজেই আবহাওয়া দূষনের কাজ থেকে বিরত হতে এরা সময় নেবে। সেইজন্যই আবহাওয়া পরিচ্ছন্ন রাখে, এ রকম গাড়ী তৈরির জন্য গবেষণায় যেন শিল্পপতি-দের উৎসাহ কম। তা না হলে, মোটর শিল্পের মত বিরাট শিল্প যদি আবহাওয়া দূষণ দূর করার গবেষণায় আরো উৎসাহ দিত, এতদিন কাজ হয়ত অনেকটাই এগিয়ে যেত। তবে এরা একেবারে চুপ করে বসে থাকছে বা থাকতে পারছে তা নয়।

সুয়েজ অঞ্চলে যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হবার পর ও ১৯৬৪, সালে মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলি পেট্রলের দর বাড়ানর পর, আজ সারা পৃথিবী পেট্রল ছাড়া বা তা কম করে ব্যবহার করে, কি করে চালান যায়, তাই ভাবতে সুরু করেছে। এর ফল হয়ত হবে কল্যাণকর। এ কথা বলছি, তার কারণ হল এই যে পেট্রল, তেল, কয়লা ইত্যাদি সব ফসিল জ্বালানিই যে একদিন শেষ হবে, এই বোধটার সঠিক উপলব্ধি সবে আজই হতে আরম্ভ হয়েছে। মানব জাতী যেন একদিন এক মুর্খের স্বর্গে বাস করছিল। তার ধারণা ছিল আমরা তো এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারীতে আছি। আমাদের নতুন করে কিছু অর্জন করতে হবে না। বসে বসে শুধু ভোগজাত করলেই হল। তারপর বোধ করি এ চিন্তার ব্যতিক্রমে এলেন একজন। যিনি বলতেন তার মাথাটাই তাঁর পরীক্ষাগার এ্যালবার্ট আইনষ্টাইনের সেই পরীক্ষাগার থেকে বার হল একটি সমীকরণ। তিনটি চারটি মাত্র অক্ষরের সেই সমীকরণ, $e=mc^2$।

আইনষ্টাইনের শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ এই সমীকরণকে বাস্তব করে

তুললেন। সৃষ্টি হল আনবিক শক্তির। আনবিক শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মানুষ ভাবল যে তার সকল সমস্যার বুঝি সমাধান হল, কিন্তু এ অমৃতের সঙ্গেও মিশে রইল গরল। এ গরল বিবিধ রেডিয়েশানের। অবিলম্বে সঙ্কট দেখা দিল, আনবিক শক্তিসঞ্জাত বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ ফেলা হবে কোথায়? তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিপদটা একটু ভিন্ন। তা সুদূরপ্রসারী, তা চলে কোন কোন ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে, যার প্রভাব শুধু ব্যক্তির উপরই নয়, পুরুষানুক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাই আনবিক শক্তিতে শক্তিমান হবার আনন্দে বিষাদ মিশে রইল। কিন্তু এ আলোচনা এখানে নয়।

নানান দিক থেকে আলোচনা হল পরিবেশ কিভাবে দূষিত হচ্ছে। আমরা নিজেরাই কিভাবে পরিবেশ দূষিত করছি। ভাবতে গেলে সব চেয়ে আগে যা যা মনে পড়ে, যদিও তার আলোচনায় আসছি পরে, সেটা হল আমাদের সাংসারিক আবর্জনা। আমাদের ঘর দোর ঝাঁট দিয়ে, আমাদের ঘরের আবর্জনা আমরা বাইরে ফেলছি সেখান থেকে, কি ডাষ্টবিন থেকে, তা উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফেলতে তো হচ্ছে এক জায়গায়! সেখানের অবস্থা? আর তার পর? আবর্জনার ধরনটা যুগ অনুসারে পালটে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দির ত্রিশদশকে কলকাতার "কিনু গোয়ালার গলিতে" পড়ে থাকত কি ধরনের আবর্জনা রবীন্দ্রনাথ তারও বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন—

"গলিটার কোনে কোনে
জমে ওঠে, পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁটালের ভূতি
মাছের কানকো
মরা বেড়ালের ছানা
ছাইপাঁশ আরো কত কি যে।"

কিন্তু আজ, বছর চল্লিশ পরে ইউরোপ আমেরিকার মতই আমাদের দেশও বদলে গেছে। যদি রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা, (যে বর্ণনা ছিল খুবই বাস্তব) অনুযায়ী আবর্জনা আজও থাকত, তাহলে বর্তমান যুগের কৃষিবিজ্ঞানীরা কী খুসী যে হতেন, তা বলে শেষ হয় না। কারণ এ আবর্জনাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হতে পারত জমির সার ও অন্য জিনিসও।

আগেকার দিনের বাড়ীর আবর্জনায় থাকত কিছু উনানের ছাই ও সেই

সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত বস্তু। বর্তমান লেখক কলেজ ষ্ট্রীটের অদূরে, রাজা লেন বলে এক অখ্যাত গলিতে চল্লিশ বছর আগে, কিছু ছাই ও রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার প্রতিটি আইটেম পড়ে থাকতে দেখেছেন। কিন্তু আজ? আজ থাকছে কাগজ, প্লাষ্টিক, টিন এই সব। আবর্জনা হিসাবে এইগুলোই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কারণ যদি আগেকার মত আবর্জনা হত, তা হলে প্রাণী ও উদ্ভিদ জাতীয় জিনিসগুলিকে বিভিন্ন বীজাণু খেয়ে হজম করে ফেলত ও অবশিষ্ট নাইট্রোজেন, ফসফেট্ ইত্যাদি জমির সার হত। কিন্তু বর্তমানের এ আবর্জনাকে ক্ষুদ্রতর রাসায়নিক পদার্থে ভেঙ্গে ফেলতে কেউ নেই। তাই তা যেন অমর, অক্ষয় আবর্জনা।

যে সব আবর্জনা এই ধরনের, সেগুলি দিয়ে খনির খাদ ভর্তি করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশ্য তার আগে, এগুলোকে যতটা পোড়ান যায় পুড়িয়ে ও গুঁড়ো করে নিতে হয়। কোন কোন প্লাষ্টিক পোড়াবার সময় গলে গিয়ে, অন্য জিনিসের পোড়ায় বাধা দেয়। পোড়াতে আবার খরচও আছে। বর্তমানে তাই ভাবা হচ্ছে, কাগজ ও অন্য সেলুলোজ্ জাতের জিনিস আলাদা করে নিয়ে তা থেকে এলকোহল তৈরি করা হক। এলকোহলের দামেই আবর্জনা পরিষ্কারের খরচাটা উঠে আসবে। আমেরিকায় সেলুলোজ থেকে প্রোটিন তৈরির কথাও ভাবা হচ্ছে ও তার সম্ভাবনাও অনেকদূর এগিয়েছে। সারা বিশ্বে যখন খাদ্যে এই প্রোটিন-দুর্ভিক্ষ, তখন এ কাজ পুরোপুরি সফল হলে, একটা বিরাট ব্যাপার হবে। এ কাজ সম্ভব হচ্ছে বিশেষ জীবাণুর সাহায্যে।

একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, যে, আবর্জনা বলতে বোঝায় সেই জিনিস, যার একরকমের ব্যবহার ও বিশেষ প্রয়োজন শেষ হয়েছে। তারপর ভাবতে হবে অন্য প্রয়োজন, অন্যরকম ব্যবহার তার কি করে করা যায়। আর পুরানো ধাতুর মত আবর্তনের (রিসাইক্লিং) মাধ্যমে আবার তার কতটা ব্যবহার করা যায়। প্লাষ্টিকেরও এ রকম পুনরাবর্তন সম্ভব। কাগজের সেলুলোজ্ থেকে আবার নতুন কাগজ তৈরির একটি ফ্যাক্টরি ইংল্যাণ্ডের চার্লটনে তৈরিও হয়েছে। এতে বৃটেনে দুকোটি পাউণ্ডের মত টাকার কাগজ তৈরি হতে পারবে।

মানুষের হাতে কত পশুপাখীর প্রজাতি যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তার হিসাব করা শক্ত। আর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের তো কথাই নেই। কোন মানুষ

অতি প্রাচীন মনোভাবের এ কথা বোঝাতে আমরা 'ডোডো' পাখীর কথা বলি। উড়তে পারত না, এমনি ছোট ডানা, ভারী শরীর ঠোঁট যেন হাঁস আর টিয়াপাখীর ঠোঁট মিশিয়ে। এই পাখীর প্রজাতি তিনশো বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 'ডোডোপাখী' শেষ দেখা গেছে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে। ঠিক ওইরকম মরিশাসের 'ব্লু পিজন' ১৮৩০ খ্রীঃ থেকে বিলুপ্ত। 'গ্রেট অক' বলে একরকম হাঁস শেষ দেখা গিয়েছিল ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। 'ল্যাব্রাডোর ডাকে'র বিলুপ্তি ১৮৭৫ সালে। 'গুয়াদালকেনালের ক্যারাকারা' ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিলুপ্ত, তবু তো এরা ছিল ঈগল জাতীয় শিকারী পাখী। হাওয়াই-দ্বীপের ঘাসের স্কার্ট পরা সুন্দরীদের মতই ল্যাজ লম্বা সুন্দর 'উ' পাখীও ১৯৩৪ সালের পর বিলুপ্ত। তার পর অবশ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ রক্ষার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী বহু প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশেও, আশির উপর যাঁর বয়স, ডঃ সলিম আলি এ ব্যাপারে উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন।

দুর্গাপূজা, কালীপূজা ইত্যাদি যে কোন পূজাকে উপলক্ষ করে আমাদের কলকাতায় ও কলকাতার উপকণ্ঠে যে ভীষণ হাঙ্গাম হুজ্জুৎ চলে, তারই কথা মনে রেখে আমাদের এক বন্ধু বলেছিলেন, 'সুখ স্বপনে আর শান্তি ভাসানে।' যদিও নাকি উক্ত প্রবচনের কথাটি হল, 'শান্তি শ্মশানে' তবু ওই ভদ্রলোকের কথাটা আমরা সকলে সমর্থন করেছিলাম। কলকাতায় যাঁরা থাকেন তারা জানেন মাইকের মাধ্যমে শব্দের এই পীড়ন কতটা মারাত্মক হতে পারে। আবহাওয়া দূষণে শব্দের ভূমিকাটা যে কত বড় তা যেন আমরা উপলব্ধি করিনা। হঠাৎ এই কথা বলতে গিয়ে, সুইজারল্যাণ্ডের জুরিখ সহরের একটি রাস্তার কথা বলছি। রাস্তার নাম, 'ফোগলস্যাঙ স্ট্রাসে' যার মানে হল পাখীর গানের পথ। অজস্র গাছপালা পথের দু ধারে। যে বাড়ীগুলি সেই রাজপথে, তাদেরও প্রত্যেকটিতে বাগান। বাগানে গাছপালা ভর্ত্তি। নিস্তব্ধ সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শুধু শোনা যায় পাখীর গান। আমাদের বর্ত্তমান কালের সহরের ভূগোলে, আর এই ধরনের রাস্তা থাকছে না। এইটাই হল বর্ত্তমানের সব চেয়ে বড় ট্রাজেডি।

অনেকে, বিশেষ করে যারা সহরকে খুবই ভালবাসেন, তাঁদের কাছে হয়ত সহরের কোলাহল, ততটা খারাপ লাগে না। তবে বিশেষজ্ঞদের কাছে অতিরিক্ত শব্দ শরীর ও মন দুয়ের পক্ষেই ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীরা শব্দের পরিমাপ

করার জন্য যে একক ঠিক করে নিয়েছেন, তাকে তাঁরা বলেন 'ডেসিবল্'। একেই ঔপন্যাসিক নবোকভ, তাঁর 'Ada' নামক উপন্যাসে ডিট্রেসিবল্ বলে অভিহিত করেছেন।

রবার্ট টেলরের 'Noise' বলে একখানি বই আছে। এই বইখানিতে তিনি শব্দের ক্ষতিকর দিকটির পূর্বাপর আলোচনা করেছেন। শব্দ কথাটিতে ইংরাজিতে 'Noise' বলতে যা বোঝায়, তা বোঝাতে পারা যায় না। আর Noise এর যদি কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করতে চাই, তা হলে বলতে হয়, যে Noise হচ্ছে এমন শব্দ, যার শ্রোতার কাছে, কি জ্ঞাতব্যের দিক থেকে, কি উপভোগের দিক থেকে কোন মূল্যই নেই। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায়, শব্দ কোনখানে ঠিক Noise হয়ে উঠছে, তা নির্ভর করে শ্রোতার উপর। যেমন আমাদের মুখের কথা, কখনোও কারুর কাছে তা হয়ে উঠতে পারে জ্ঞাতব্য তথ্য, আনন্দের উপকরণ, আবার কারুর কাছে তা শুধু বিরক্তিকর শব্দ, শুধুই Noise. যেমন মোটরের হর্নের শব্দ, যে রাস্তা পার হচ্ছে, তার কাছে সতর্কতা জ্ঞাপক কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যে ঘুমচ্ছে তার কাছে শুধু বিরক্তি উৎপাদক শব্দ মাত্র।

যে ডেসিবলের কথা বললাম, সেই হিসাবে নব্বই ডেসিবলের উপরের কোন শব্দ আমাদের শ্রবণ যন্ত্রের ক্ষতি করে। এর নিচের পর্য্যায়ের শব্দেও আমাদের মাথা ধরে যায়, গা বমি বমি করে। কোন কিছুতে মনোযোগ দেবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। অবশ্য এর সাহায্যও গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন ডেন্টিষ্টরা বিরক্তিকর শব্দ উৎপাদন করে রোগীর দাঁত তুলে ফেলেন। রোগী দাঁত তোলার যন্ত্রনা টের পায় না। দেখা যাচ্ছে, শব্দের অবাঞ্ছিত দিকটিকেও কাজে লাগিয়েছে বিজ্ঞান, আবার তাও যন্ত্রনার উপলব্ধি বিরতির জন্য।

শব্দ, বিশেষ করে শব্দের যন্ত্রণার উপলব্ধি তখনই বেশী হয়, যখন শব্দটা একটানা না হয়ে তা যদি ছাড়াছাড়া ভাবে হয়। একটানা শব্দে আমরা অনেক সময় অস্বস্তি বোধ করি না। যেমন জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ, এয়ার কণ্ডিশানের শব্দ, গাড়ী চালানোর সময় গাড়ীর শব্দ এই সব যেন শব্দ হচ্ছে বলেই মনে হয় না আমাদের কাছে। বিশেষতঃ এ সব শব্দগুলি যদি খুব উচ্চগ্রামের না হয় তা হলে আমরা এত অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারি যে, কোন শব্দ হচ্ছে এটাই যেন আর বোঝা যায় না। সহরে অবশ্য নানারকমের শব্দ আছে তবু

সহরের বায়ু দূষণে যেমন মোটরগাড়ীর সিংহভাগ, শাব্দিক ব্যাপারেও তাই। বর্তমানে এ ব্যাপারে গাড়ীর সঙ্গে বিমানও প্রচণ্ড ভাবে প্রতিযোগিতা করতে সুরু করে দিয়েছে। আবার যখন ঐকতান সুরু হয় প্লেন, ট্রেন, লরি গাড়ি ইত্যাদির একসঙ্গে, তখন যে কি অবস্থা হয়, তা সহরবাসীমাত্রেরই জানা আছে। শব্দ যাতে কমানো যায় তার জন্য নানারকমের গবেষণা ইউরোপ ও আমেরিকায় চলছে। জাতিপুঞ্জ-প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। এর ফলে প্লেনের শব্দটা কোন কোন জায়গায় একটু কমানো সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে রোলস রয়েস কোম্পানি তাদের আর-বি ২১১ ইঞ্জিন বার করে কাজ অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে।

মোটর গাড়ী ও মোটর সাইকেলের শব্দ কি করে আরো কমানো যায় সে সম্পর্কে আরো ভাবা দরকার। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলতে হয়। মোটর সাইকেল ও স্কুটার সাধারণতঃ তরুণরাই ব্যবহার করে থাকে। আবার বেশী শব্দ করে, এইরকম গাড়ী তারাই পছন্দ করে। কারণ তাদের ধারণা এর ফলে তাদের প্রতি তরুণীদের দৃষ্টি আরো বেশী করে আকৃষ্ট হবে। এ সম্পর্কে তরুণ-তরুণীদের ভ্রান্ত ধারণাটা দূর করতে হবে। লরি ক্রমশই আরো বেশী ভারী হয়ে উঠছে। এর জন্য শব্দ ছাড়া রাস্তার পাশের বাড়ীগুলি কাঁপতে থাকে। এর ফলে ঘর, বাড়ী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, এমনকি শরীরেরও ক্ষতি হতে বাধ্য। এ সম্পর্কেও কি করা যায় তা ভাবা হচ্ছে।

বর্তমানে পেঙ্গুইন বইয়ের কাগজের মলাটে একটি বই পাওয়া যায়, এটি হল শ্রীমতী জিন জেকবের লেখা "The Economy of Cities"। এই বইখানিতে, সভ্য জগতে যে যে জিনিস আমরা ব্যবহার করি ব্যবহার শেষে কি ভাবে পুনরুদ্ধার করে পুনর্ব্যবহার করা যায় তাই আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলছেন এই পুনরুদ্ধারের শিল্পকে একটি নতুন ও বৃহৎ শিল্প হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। যেমন প্লাষ্টিককে পুনর্ব্যবহার করার জন্য জাপানের 'সায়ানো' করেছেন। নিষ্ক্রিয় আবহাওয়ায় প্লাষ্টিকের উপর রেডিয়েশান প্রয়োগ করে, আবার তাকে তার মূল গঠন পদার্থে ফিরিয়ে আনা যায়। ঠিক এই রকম ভাবে সেই বৃহৎ পুনরুদ্ধার শিল্পকে, প্লাষ্টিকে, যেমন হাত লাগাতে হবে, তেমনি আবর্জনার নাইট্রোজেন, ফসফেট, ইত্যাদি বস্তু থেকে, ওই শিল্পকে তৈরী করতে হবে 'সার'। এমনি বহুবিধ। দূষণের সমস্যাটা যখন

হয়ে উঠেছে বিরাট ও বহুধা তখন তা থেকে মানব জাতিকে উদ্ধার করার প্রকল্পটাকেও হতে হবে বিরাট।

কবিগুরুর গানের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ অধ্যায়টা সুরু করেছিলাম। আত্মহননের কথা ভেবে মানুষ জেনে শুনেই বিষ খায়। কিন্তু তবু সমস্তটাই কি সে জানে? মানবজাতি আত্মবিস্মৃত। আপাত সুখ, আপাত স্বাচ্ছন্দের জন্যই যা কিছু করার সে করেছে। এই করার পথে মাঝে মাঝে সে দেখছে যতটা সাফল্য সে নিজেও আশা করে নি তাই তার হাতে এসে গেছে। এ মাত্রাতিরিক্ত সাফল্য তাকে করেছে মোহমুগ্ধ। এই মোহে, দম্ভে সে নিজেকে সর্বশক্তিমান স্বয়ম্ভূ ভাবছে। আজ এই মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে তার আত্মার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা রাখতে হবে "কাপি চ বার্ত্তা ? ? ? কঃ পন্থাঃ ? ? ?

একটি নতুন কথা 'ইকোলজি' (Ecology)

প্রতিশব্দ একটা কি আর খুঁজে পাওয়া যেত না ; তবু ইচ্ছা করেই খুঁজতে চাই নি। কারণ এ সমস্যাতো আন্তর্জাতিক, তাই একটা বিশ্বগ্রাহ্য শব্দ যখন রয়েছে, তাই ব্যবহার করা যাক। সমস্যাটাই বা কি আর কথাটাই বা কি নিয়ে? সমস্যাটা মানব পরিবেশ, শুধু মানব পরিবেশই বা বলি কেন, সমগ্র জীব পরিবেশ সম্পর্কিত। আর 'ইকোলজি' কথাটা বোঝাতে চায়, শুধু অজৈব জীব পরিবেশ নিয়ে, জীব ও মানুষের সুস্থ সহ-অবস্থানের বিজ্ঞান। আমি আমার মত একটা সংজ্ঞা দিলাম। ঠিক হল কি না, পরে দেখা যাবে, যখন সারা বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে আলোচনা করব। তবে তার আগেই আর একটা কথা মনে পড়ছে। ছোট ছেলেদের একটা খেলনা আছে: তাতে থাকে চৌকো চৌকো কতকগুলো কাঠের ব্লক। ব্লকগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে সাজাতে পারলে, এক একটি ছবি ফুটে ওঠে। 'ইকোলজি' বোধহয় কতকটা তাই ঠিক ভাবে সাজিয়ে জীবজগতের পরিবেশ সহযোগে, একটা পরিপূর্ণ ছবি, আমরা ফুটিয়ে তুলতে চাই।

'ইকোলজি' সম্বন্ধে যা কিছু মনন, চিন্তন ইত্যাদি, বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক সমতলে করা হচ্ছে। ১৯৬৪ সালে 'ইকোলজি' সম্পর্কিত কমনওয়েল্‌থ সম্মেলন মাল্টা সহরে করা হয়। এই সম্মেলনের আলোচনা পুস্তকটি যখন বার হল, তখন বৃটেনের প্রিন্স ফিলিপ স্বয়ং এর ভূমিকায় বললেন, 'No subject is causing such world wide concern as Human Ecology. It may be referred to by a dozen other names but in effect it is the same concern for the future of mankind and the future of all life on this finite globe.' ১৯৬৪ সালে সুইডেনের ষ্টকহম সহরে পরিবেশ সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়, সেখানে অন্য বিবিধ-আলোচনার সঙ্গে, পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্প সংস্থাগুলির এ ব্যাপারে কি ধরনের শিল্পনীতি হওয়া উচিত, তা নিয়েও আলোচনা হয়। এই আলোচনায় মোটামুটি ভাবে সুপারিশ করা হয় যে শিল্পসমৃদ্ধির একটু রাশ টানা দরকার। তাতে ব্যক্তিগত ভাবে সামান্য

ক্ষতি হলেও, সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ হবে। এমনকি এর ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা সামঞ্জস্যের প্রতিষ্ঠা হবে। এ প্রসঙ্গটি এখানে আলোচনা করার কথা নয়, কিন্তু করলাম শুধু এই দেখাতে যে, 'ইকোলজির' সীমানা কত ব্যাপক। আর তাই তো হবার কথা।

'ইকোলজি' প্রসঙ্গে এখানে যে আলোচনা করব, তা কতকটা বিমূর্ত্ত বা এ্যাবস্ট্র্যাক্ট ভাবে। কারণ বিষয়টি সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে হলে, তার বিমূর্ত্ত দার্শনিক দিকটি বোঝা দরকার। মন্ট্রিলের অধ্যাপক পিয়ের দাঁসেরো (Pierre Danserreau), যিনি পূর্বোক্ত কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরও এই মত। তাঁর মতে 'ইকোলজি'কে হতে হবে সামগ্রিক। এই সামগ্রিকতার সঙ্গে অংশ বিশেষের কি সম্পর্ক, তার বিচার বিবেচনাও 'ইকোলজি'কেই করতে হবে। অংশগুলিকে বিশ্লেষণ করা অবশ্যই ইকোলজিষ্টের কাজ। কিন্তু কাজটার প্রসার কতদূর পর্যন্ত, এ বিষয়েও মতবিরোধ আছে। একটি ছোট ইকোসিষ্টেম সম্পর্কে একটা ঐকমত আছে। দেখা যাক, তা বলতে কি বোঝায়।

ইকোসিষ্টেম বলতে বোঝায় একটি অবরুদ্ধ পরিবেশ, যেখানে আবশ্যক সম্পদকে, প্রাণী ও উদ্ভিদরা অনুবর্ত্তনের সাহায্যে, নিজেদের জৈবিক সুবিধার খাতিরে বার বার পুনর্ব্যবহার করতে পারে। আধুনিক এ্যাকোয়েরিয়ামে জলজ উদ্ভিদ, মাছ, গেঁড়ি, বালি, ইত্যাদি নিয়েই একটা ইকোসিষ্টেম। এখন দু একটি কথার একটু আলোচনা করে নি।

সম্পদ বলতে আমরা বোঝাতে চাইছি যা কোন খনিজাত কি প্রাণীজাত বস্তু হতে পারে, আর যা অনুবর্ত্তনের সাহায্যে ঘুরিয়ে বার বার ব্যবহার করা যেতে পারে। জমিতে যে নাইট্রোজেন দেয়া হল সার হিসাবে, গাছ তা পাচ্ছে জমির কাছ থেকে প্রোটিন ইত্যাদির আকারে। আবার তা জৈব সার হয়ে মাটিকে নাইট্রোজেন যোগাচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের কথাও এই প্রসঙ্গে আসে। ইংরাজিতে পুষ্টিস্তরকে বলে Trophic levels. নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর আছে। প্রতিটি স্তরে আবার বড় থেকে ক্রমে ছোট হয়ে যাচ্ছে, এইরকম বৃত্ত, যাকে আমরা এক একটি খাদ্যশৃঙ্খল বলি। প্রাণী যত বড় হয় ও উপরের দিকে উঠতে থাকে, এই বৃত্ত ও খাদ্য শৃঙ্খল তত ছোট হতে থাকে। যেমন গাছ⇄হরিণ⇄বাঘ, মাত্র তিনটিতে একটি বৃত্ত।

পুষ্টিস্তরের দিক থেকে আমরা অন্ততঃ পাঁচটি স্তরবিভাগ করতে পারি। এগুলি যথাক্রমে হল minerotrophic—মৃত্তিকাপৌষ্টিক বা ধাতুপৌষ্টিক; phytotrophic—বীজাণুপৌষ্টিক ; zootrophic (1)—উদ্ভিদ-পৌষ্টিক ; zootrophic (2)—প্রাণীপৌষ্টিক ; zootrophic (3)—বিচিত্র-পৌষ্টিক।

এবার এই ব্যবহৃত শব্দগুলির মাধ্যমে কি বোঝাচ্ছে তাই বলি। সব থেকে নিম্ন স্তরের, যাকে মৃত্তিকা বা ধাতুপৌষ্টিক বলা হচ্ছে সেই স্তরে আছে বীজাণু, ছত্রক ও শেওলা জাতীয় কিছু জীব। এদের সাধারণতঃ নিম্নতম পর্যায়ের মনে করা হয়। খাদ্য হিসাবে এরা মৃত্তিকায় যে সব ধাতব লবন ও রাসায়নিক অঙ্গার জাত পদার্থ আছে, তাকেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই প্রাণীদের দেহগঠনেও কোন জটিলতা নেই। এদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না।

এর উপরে স্তরের প্রাণীরা হল জীবাণুপৌষ্টিক। এ্যামিবা প্যারামেশিয়াম, ইত্যাদি এক কোষ বিশিষ্ট ও কিছু বহুকোষ বিশিষ্ট প্রাণী এই পর্য্যায়ে পড়ে। এরাও ক্ষুদ্র। দেখতে অনুবীক্ষণ লাগে। এরা খাদ্য হিসাবে অপেক্ষাকৃত জটিল বস্তু, অর্থাৎ অন্য জীবাণু ও মৃত্তিকার ধাতব পদার্থ, দুই ব্যবহার করতে পারে।

এর উপরের স্তরে যে প্রাণী, যাদের উদ্ভিদপৌষ্টিক বলা হল, তারা জীবাণু ধাতব পদার্থ, ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে। আবার সেই সঙ্গে নিজেদের শরীরে ক্লোরোফিল বলে এক ধরণের সবুজ পদার্থ থাকায়, সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিল দিয়ে খাদ্যের নাইট্রোজেন ও কার্বণ তৈরি করে নেয়। এই উদ্ভিদের কেউ কেউ আবার মাটিতে থাকা বীজাণু, যারা বাতাসের নাইট্রোজেনকে ধরতে পারে, তাদের সাহায্যে, খাদ্যের নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। আমাদের ছোলা ডাল পর্যায়ের গাছ এই ধরনের।

তারপর ধাপে ধাপে উঠে গেছে উপর তলায় যেখানে ছোট থেকে অনেক বড় বড় প্রাণী আছে, সেই পর্যায়ে। এদের আমরা পুরোপুরি উদ্ভিদপৌষ্টিক বলতে পারি। খরগোশ থেকে হাতী পর্য্যন্ত অজস্র প্রাণী এই পর্য্যায়ের।

যারা অন্য প্রাণী শিকার করে তাই খেয়ে প্রাণধারণ করে এই রকম পশু বা পাখীকে বলা হয়েছে প্রাণীপৌষ্টিক। উদাহরণ না দিলেও বোঝাযায় বাজপাখী থেকে বাঘ, সিংহ পর্যন্ত এই পর্য্যায়ের।

শেষ ধাপে যে বিচিত্রপৌষ্টিক নামটি রাখা হয়েছে, বলা বাহুল্য মানুষ সেইখানে। মানুষের চরিত্রে ও চিন্তায় এত বৈচিত্র যে বহু প্রাণী ও উদ্ভিদকে সে সুবিধামত কাজে লাগিয়ে মানুষ তার খাদ্যভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছে। তাও যদি যথেষ্ট না হয়, হয়ত একদিন রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মানুষ, খাদ্য তৈরিও করতে পারবে। কিন্তু মানুষের আজও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে আসতে বাকী আছে। খাদ্য উৎপাদনের সেই পূর্ণ স্বাধীনতা এলে, তথাকথিত খাদ্যশৃঙ্খল এমনকি সমস্ত ইকোলজিটাই হয়ত পাল্টে যাবে। সেই ভরসায় তো মানুষ বহুকাল ধরেই রয়েছে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে কোথায়!

যে পাঁচটি পৌষ্টিক স্তরের কথা বললাম, বলা যেতে পারে এর প্রতিটি এক একটি "ইকোসিষ্টেম"। তবে এ ইকোসিষ্টেমগুলি এ্যাকেয়েরিয়ামের মত রুদ্ধদ্বার নয়। একটি বৃত্ত ও পরের বৃত্তের মধ্যে যাতায়াত রয়েছে। এটা ভাবতে কষ্ট হয় না। কারণ তাই যদি না হবে, তা হলে বিবর্ত্তনের সুরু, যা ধাতুপৌষ্টিক স্তরে হয়েছিল, তা বিচিত্রপৌষ্টিক স্তর পর্যন্ত এলো কি করে? আবার প্রতি স্তরের কিছু জীব আজ পর্যন্ত সহ-অবস্থানে সমান ভাবে বেঁচে রয়েছে। কথাটা আর একটু বিশদ ভাবে বলি :—

মৃত্তিকা জীবাণু, যা মাটির ভিতরের রাসায়নিক পদার্থ থেকেই পুষ্টি নেয়। বিবর্ত্তনের দিক থেকে এরা প্রথম ধাপের। মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষকে আক্রমণ করার যে রোগজীবাণু ও ভাইরাস, তারা কিন্তু মৃত্তিকাবীজাণুদের অনেক পরে এসেছে। কারণ প্রাণীরাই যখন বিবর্ত্তনে উদ্ভূত হয়ে আসে নি, তখন তাদের খেয়েই যারা বেঁচে থাকে, তাদের উদ্ভব হবে কি করে? যাই হক, সেই মৃত্তিকাবীজাণু থেকে বিবর্ত্তনে আজ বিচিত্রপৌষ্টিক মানুষ পর্যন্ত উদ্ভূত হয়েছে। অথচ আজও সেই মৃত্তিকাবীজাণু ও তাদের জীবনধারণ পদ্ধতি সঠিক বজায় আছে। বিভিন্ন পৌষ্টিক স্তরগুলি যে পরস্পরের কাছে রুদ্ধ নয়, এর আর একটি প্রমাণ, মানুষ ও প্রাণীদের এমন কি রোগসৃজনকারী জীবাণুর বিবর্ত্তন। হয়ত কোন মৃত্তিকা জীবাণু দেখল, বাঃ পরভোজী হয়ে বাঁচাটাতো বেশ আরাম। তাই তারা বিবর্ত্তিত হয়ে বিচিত্রপৌষ্টিক স্তরে বিবর্ত্তিত মানুষের ঘাড়ে চেপে টিঁকে গেল।

'ইকোলজি'র দিক থেকে, সেই প্রাণটি কি ভাবে রয়েছে, এটা একটা মস্ত কথা: অর্থাৎ কোন মতে টিকে, নাকি বেশ দাপটের উপর? এগুলো আবার

নির্ভর করে কয়েকটা জিনিসের উপর। এর একটা হল চাহিদা। প্রাণীর যে বস্তুটি প্রয়োজন, তুলনামূলক ভাবে পরিবেশে তা প্রাণীর গ্রহণযোগ্য ভাবে কতটা আছে? তারপর হল সহনশীলতা। ভাল কিছুই হক, আর ক্ষতিকর কিছু হক, পরিবেশে এ রকম কিছু যদি বেশী পরিমানে থাকে তা কতটা সহ্য করার ক্ষমতা প্রাণীর আছে? আর শেষটি হল, পরিবেশে যে সম্পদ রয়েছে, প্রাণীটি অন্যপ্রাণীর তুলনায় তা কতটা ব্যবহার করতে পারে বা পারছে! পরিবেশে অবস্থিত সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষমতার উপরই কোন প্রাণী বা প্রাণীকুলের 'ইকোলজি'গত সাফল্য নির্ভর করে। কারণ ইকোলজির একটা নিয়ম হল—যে কোন পরিবেশে কোন প্রাণী তার সমস্ত প্রয়োজন মেটার সব কিছু পাবে না।

এটা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ নেয়া যাক। গ্রামের লোক ধরা যাক কিছু মুরগী পুষেছে ডিম ও মাংসের জন্য। শেয়াল ও বাজপাখী মাঝে মাঝে সে মুরগীগুলো ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এর মানে হল এই, যে বাইরে শেয়াল ও বাজপাখীর খাবার, প্রয়োজনের পক্ষে অঢেল নয়। আবার গ্রামের লোক মুরগীদের পুরো বাঁচানর ব্যবস্থাও, তাদের পরিবেশ থেকে করে উঠতে পারে নি। তাই যেন জীবনযুদ্ধের একটা প্রতিযোগিতার খেলা চলছে।

তা হলে যদি একটা ছোট ইকোসিষ্টেমের কথা না ধরে, বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খল বা চক্রের পূর্ণাঙ্গ ইকোসিষ্টেমের কথা ধরি, তা হলে দেখব যে কিছু কিছু সম্পদ প্রতিযোগিতার কথা বাদ দিয়েও ভাগ করে নিতে হবে। কারণ প্রাণী যে খাদ্যচক্রেরই হক, এ সম্পদগুলি সব চক্রেই প্রয়োজন। এ রকম একটি সম্পদ হল জল। জল গাছেরও লাগে, প্রাণী, মানুষ, এমনকি শিল্পে পর্যন্ত লাগে।

অনেকে মনে করেন যে,একটি পূর্ণাঙ্গ ইকোসিষ্টেমের সমন্বয়ে যেখানে বিভিন্ন খাদ্যচক্রগুলি নেয়া হয়েছে সেখানে একচক্র থেকে অন্যচক্রে শক্তির আদান-প্রদানও ঘটছে। কারণ প্রতিটি চক্রে নিহিত শক্তি রয়েছে। যেমন একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক প্রাচীন যুগের সেই বনস্পতিদের কথা, যারা আজ কয়লা। এরা ছিল প্রাচীন উদ্ভিদপৌষ্টিক বা বীজগুপ্তপৌষ্টিক স্তরে। সময়ের দিক দিয়ে তা আমাদের বর্তমান বিচিত্রপৌষ্টিক স্তর থেকে ছিল বহু দূরে। তবুও তাদের পুঞ্জিভূত শক্তি আজ আমরা ব্যবহার করছি। এই

থেকে মানুষের মনে আশা জাগছে যে বিবিধ ইকোসিস্টেমের নিহিত শক্তি থেকে আমরাও হয়ত শক্তি পেতে পারি। একটু 'দুরন্ত আশা', কিন্তু তা হক না। প্রকৃতির রাজ্যে শক্তি ব্যবহার করে কাজ করার যে বিবিধ পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে জৈবিক স্তরে অনুঘটক বা এনজাইমকে ব্যবহার করে যে কাজ হয়, তা অনুধাবন যোগ্য। এ কথা আগে বলেছি। এর বিশেষত্বের একটা উদাহরণ দি। চিনির মত এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেটকে ইন্ধন করে পরীক্ষাগারে যদি শক্তি-উৎপাদন করতে চাই, তা হলে তাকে জ্বালাতে হয়। জ্বালালে হঠাৎ তার উত্তাপটা কয়েকশো ডিগ্রি উঠে, ইন্ধনটুকু নিঃশেষ করে খুব অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে যায়। সেই জায়গায় শরীর যখন অনুঘটকে সাহায্যে সেই পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট ভাঙ্গে, তখন তা থেকে প্রয়োজন মত অল্প অল্প উত্তাপ বহুক্ষণ ধরে পাওয় যায়। এটাই আদর্শ।

খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে, তাদের কার্যকুশলতা ভিন্ন হবে, এটা স্বাভাবিক। স্তর বিভেদে, কতটা উঁচু বা নিচুতে আছে, সেই অনুযায়ীই যে কুশলতার কম বেশী হবে তা ঠিক নয়। দলবদ্ধতা, ব্যাপক এলাকায় চলে বেড়ানর অভ্যাস, শিকার হিসাবে কোন প্রাণীদের ব্যবহার করছে, এগুলির উপরেও ইকোসিস্টেমের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যেমন আগে এক জায়গায় বলেছি গরিলাদের এক ব্যাপক এলাকায় চরে বেড়ানর ফলে, সেই ইকোসিস্টেমের স্বাস্থ্য কত সুন্দর ছিল। কিছু গরু-ছাগল বিভিন্ন সীমিত জায়গায় চরতে সুরু করে, কি করম সব সামঞ্জস্য নষ্ট করে ফেললে, তাও আগে বলেছি। ঠিক এইভাবে মাটিতে থাকা কোন উপকারী ধাতব পদার্থ, যা গাছেরা গ্রহণ করছে, ইকোসিস্টেমে একটা সামঞ্জস্য না থাকাতে, প্রাণীরা এমন কি মানুষ পর্যন্ত, তা ব্যবহার করতে পারছে না। একটা উদাহরণ দি। গাছপালা-জাত অনেক বনৌষধি, এমনি ভাবে ইকো-সিস্টেমের সামঞ্জস্যের অভাবে, প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছে। তার পুনরুদ্ধার আজ কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

নিজস্ব ইকোসিস্টেমে থেকেও প্রজাতিগত সুবিধার জন্যেই হয়ত, প্রাণী-বিশেষ কোন বিশেষ পদার্থ, নিজেদের শরীরে সঞ্চয় করে রাখে। যেমন গরু, মোষ বা হরিণের শিংয়ের আয়তন অনেক সময় প্রয়োজনের চেয়ে বেশী বড় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ জাতের হরিণ বেশী ভারী শিং বইতে না পেরেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে দেখা যায়। আবার উত্তর ক্যালিফর্ণিয়ায়, তিনশো চারশো

ফুট লম্বা বিরাট বিরাট রেড-উড গাছ, দু হাজার আড়াই হাজার বছরের সঞ্চিত অজস্র পরিমান সেলুলোজ তাদের বিরাট বিরাট দেহে সঞ্চয় করে রেখেছে। প্রজাতিগত দিক থেকে কিন্তু এতে রেড-উড গাছের কোন ক্ষতি হয় নি। তার কারণও আবার সেই ব্যালেন্স বা সামঞ্জস্য।

প্রজাতিগত বিভিন্ন অভ্যাসও অনেক সময় ইকোসিস্টেমকে কিছুটা প্রভাবিত করে। যেমন বিভিন্ন পাখীর বাসার চমৎকারত্ব শীতাতপ থেকে তাদের মুক্তি দেয়। বিভাররা বাঁধ তৈরি করে জলধারার গতি, পরিমান, স্রোত, এ সব বদলে দিতে পারে। বিশেষ জাতের পিঁপড়ে বা উইপোকা ঢিপি তৈরি করে, স্থানীয় ভূগোল পাল্টে দেয়। পরাশ্রয়ী হয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করে কোকিল, কাকের বাসায় ডিম পেড়ে। আবার বিশেষ জাতের পিঁপড়ে, আমাদের গরু পোষার মত একজাতের পোকা পোষে। এরা এই পোকাদের প্রতিপালন করে ও এদের শরীরের রস পান করে। আবার মৌমাছিরা তাদের চাকে নাচ দেখিয়ে, অন্য মৌমাছিদের জানিয়ে দেয়, কোনখানটায় মধু আছে। তা ছাড়া অল্পবয়সীদের শেখানো, এতে ইতর প্রাণী থেকে মানুষ অবধি পরিবেশকে বদলাচ্ছে ও বদলাবার চেষ্টা করছে।

যখন আমরা ইকোসিস্টেমের কথা বলি, তখন জায়গার কথা বলতে আমাদের চার রকমের পরিবেশের কথা মনে পড়ে। এগুলি হল বন, গ্রাম, উপনগর ও নগর। এর উপরেও সহর বলে আরো একটা পরিবেশমণ্ডল রাখতে চাই। এর কারণ হল, প্রত্যেক খাদ্যশৃঙ্খলের সঙ্গে এক একটা পরিবেশমণ্ডল মোটামুটিভাবে জড়ানো। যেমন বন্য পরিবেশে ধাতু পৌষ্টিক গাছ পালারই প্রাধান্য। সেখানের প্রাণীরাও উদ্ভিদপৌষ্টিক। সেই রকম গ্রামীন পরিবেশে প্রাণীরা প্রধানত: উদ্ভিদপৌষ্টিক। উপনগর ও নগরে প্রাণীপৌষ্টিক ও সহর বা মহানগরে তারা বিচিত্রপৌষ্টিক। কথাটা অনেকটা সাপটা ভাবে বলা হল। কারণ এই পরিবেশমণ্ডলের মধ্যে প্রাণী ছাড়া মানুষও আছে। আর কি মানুষ, কি প্রাণীদের খাদ্যাভ্যাস তো ঠিক ছকে ফেলা নয়, অন্তত বর্তমান সময়ের কাছাকাছি এলে। তবু এ কথা বোঝা যায়, আরণ্যক তো দূরের কথা গ্রাম্য পরিবেশে মানুষও একটু বেশী ফলমূল পায় ও খায়। আবার মহানাগরীক পরিবেশে চড়াইপাখীও জেলিমাখান পাউরুটির টুকরো খেতে শিখে যায়।

এ ছাড়াও একটা কথা আছে। এক ইকোসিস্টেমের প্রাণীদের জীবনযাত্রা,

খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি পরের ধাপের ইকোসিষ্টেমকে প্রভাবিত করতে পারে। এর উপর থেকেই বোঝা যাবে, কোন ইকোসিষ্টেমের লাভ হচ্ছে ও কোন সিষ্টেমের লোকসান। লাভ লোকসানটা নির্ভর করে কোন ইকোসিষ্টেম কি বা কতটা দিতে পারে। গ্রাম যে জায়গায় হয়ত তাঁতের কাপড়, কুটীরশিল্পে তৈরী জিনিস, দিচ্ছে, সহর দিচ্ছে কত কি?

সহর যতই দিক, নেবার দিক থেকে বিশেষ করে খাদ্যে তাকে অন্য ইকোসিষ্টেমের উপর পুরো নির্ভর করতে হচ্ছে। তাই তা বেশীকরে বিচিত্রপৌষ্টিক। এবার যদি বলি যে মরুদেশ ধাতুপৌষ্টিক; তৃণভূমি বীজাণু ও উদ্ভিদপৌষ্টিক; বনভূমি প্রাণীপৌষ্টিক; নগর ও মহানগর বিচিত্রপৌষ্টিক; তা হলে, পাঠকের অনুভূতিতে, সবটাই স্বাভাবিক বলে মনে হবে। চিন্তাশীল ইকোলজিষ্টরা তাই এই ভাবে ভাগ করেছেন।

ইকোলজির দিক থেকে বিভিন্ন খাদ্যবৃত্ত বা খাদ্যশৃঙ্খলের উপর নির্ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে এক একটি ইকোসিষ্টেম। মনে হয় খাদ্য শব্দটি ব্যবহার না করে হয়ত পুষ্টি শব্দটাই ব্যবহার করা ভাল। কারণ ইকোসিষ্টেমের নিম্নতম পর্য্যায়ে, যে পর্য্যায় পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভবের কাছাকাছি, সেখানে খাদ্য গ্রহণের মত প্রাণীর উদ্ভব হয়ত তখনও হয়ে ওঠে নি। অথচ প্রাণী, উদ্ভিদ বা প্রাণহীন বস্তু, যাই হক না কেন তার বৃদ্ধি হতে হলে, পুষ্টির জন্য উপযুক্ত বস্তু তাকে নিতেই হবে। তাই বলছিলাম যে পুষ্টি কথাটাই বেশী উপযোগী। আমরা তাই শ্রেণীবিভাগের সময় 'পৌষ্টিক' কথাটি ব্যবহার করেছি। পরে অবশ্য 'খাদ্যবৃত্ত', 'খাদ্যশৃঙ্খল', এ সব কথাগুলিও ব্যবহার করেছি। আমার মনে হয়, ইকোলজির মত ব্যাপক ও সর্বজনের আলোচ্য বিষয়ে, শব্দব্যবহারের ছুৎমার্গ যত কম থাকে, ততই ভাল।

এবার আমরা ইকোসিষ্টেমের বৃত্তে যদি কোথাও কোন ভাঙ্গা জায়গা থাকে, তার আলোচনা করছি। বৃত্তটা একটা রেখায় তৈরি। সে রেখার কোন না কোন জায়গায় ভাঙ্গচুর থাকতে পারে। এবার সেই কথাই বলি। যেমন জলের প্রাচুর্য বা আধিক্য হয়ত রয়েছে, অথচ তা পুরো ব্যবহার না হয়ে ফেলে দেয়া হচ্ছে। প্রচুর সবুজ গাছপালা রয়েছে, অথচ তৃণভোজী প্রাণীরা তা খেয়ে উঠতে পারছে না বলে, তা এত ঘন আগাছা হয়ে যাচ্ছে, যে রোদ না পেয়ে নিজেরাই মরে যাচ্ছে। তৃণভোজীদেরও সেইরকম এত সংখ্যাধিক্য

হতে পারে আমিষভোজী প্রাণীরা তাদের খেয়ে উঠতে পারছে না। এর ফলে আবার তৃণভোজীরা সব গাছপালা খেয়ে, নিজেদেরই খাদ্যভার ঘটিয়ে, মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। এইভাবে ধাতুপৌষ্টিক⇄উদ্ভিদপৌষ্টিক⇄প্রাণীপৌষ্টিক⇄ বিচিত্রপৌষ্টিক বৃত্তটি বজায় থাকে। যেমন একটি বৃত্ত আঁকতে গেলে কোন জায়গায় কালি কম পড়ে গেলে, সেখানটা ফাঁক থেকে যায়, সেই রকম আর কি। প্রত্যেক স্তরের নিজস্ব সম্পদও আছে, যা, তারা অনুবর্ত্তন করে, পুনর্ব্যবহার করতে পারে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা দরকার। বিচিত্রপৌষ্টিক স্তরে রয়েছে ভোগবাদী মনুষ্যকুল। ধাতুপৌষ্টিক স্তরে আমাদের যা পুনরাবর্ত্তনে দেবার তা না দিয়ে বরং ধাতুসম্ভারই ক্ষয় করে ফেলেছি।

সেই জায়গায় বলা যায়, গ্রাম থেকে সহরের স্তরে, যা দেবার তা গ্রাম ঠিক দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য আদর্শ গ্রামের পক্ষে, সে দেয়া নিজেদের উদ্বৃত্তই হওয়া উচিত। তাই যদি হয়, তা হলে আরও একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, যে ইকোলজির দিক থেকে গ্রামই সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেইজন্য আজকে আদর্শ সহরকেও হতে হবে, গঠনের দিক থেকে কিছুটা গ্রামের মত। আবার শিক্ষা দীক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, মনন, চিন্তা ইত্যাদিতে আধুনিক সহরের মত। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চিন্তা। সেই মডেলেই গড়ে উঠেছে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন। শান্তিনিকেতন নগরই। কিন্তু সেই নগরকে ভোগবাদী, সর্বগ্রাসী মহানগরীতে পরিণত করা হয় নি, যেখানে ধাতুপৌষ্টিক, উদ্ভিদপৌষ্টিক, প্রাণী-পৌষ্টিক সর্বস্তর থেকে নিজেদের ভোগের ইন্ধন শুধু নেয়া হচ্ছে, কিছু দেয়া হচ্ছে না। অথচ একটা সহরের মহত্ব হল নেয়াতে নয় দেয়াতে।

একটা ইকোসিষ্টেমকে আমরা তখনই বলতে পারি যে তা যোগ্য, যখন সামান্য ইতরবিশেষেও তার ভিতরের সামঞ্জস্যের কোন ইতর-বিশেষ হয় না। এ রকম ইকোসিষ্টেম বাইরের আঘাতেও ভেঙ্গে যায় না। ঠিক যেমন কোন প্রাণী, যদি তার আবহাওয়ার বা পরিবেশের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনেও ভ্রূক্ষেপ না করে দিব্যি টিঁকে থাকতে পারে, তার যোগ্যতা অনস্বীকার্য। তবে এই যোগ্যতার স্তরের কম বেশী তো থাকবেই। কোন বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ প্রাণীর যোগ্যতা সর্বাধিক। যেমন বনে বাঘ খাওয়া, থাকার ব্যাপারে ততটা সুখে থাকে না, যতটা চিড়িয়াখানায়। কিন্তু বাঘের যোগ্যতা বনেই সর্বাধিক চিড়িয়াখানায় নয়।

তবে আবার, এই বন্য অবস্থার যোগ্যতাকে প্রয়োজন মত কমিয়ে বাড়িয়ে নিজের ব্যবহারে মানুষ প্রয়োগ করেছে, অথচ তার জন্য ইকোসিষ্টেমে কোন ব্যতিক্রম হয় নি। যেমন বলা যায়, ঘাস জাতের, ধান কি গমের কথা। কিম্বা মুরগীর কথা। বন্য অবস্থায় ধানের এক একর জমিতে এই পরিমাণ বীজ সৃষ্টি করার কথা ছিল না। আবার বছরে এত বেশী সংখ্যায় ডিম দেবার কথাও ছিল না মুরগীর। কিন্তু তথাকথিত সিলেকশানে বা প্রাকৃতিক নির্বাচনে, এদের তাই করে তোলা হয়েছে। 'ইকোলজি' দিক থেকে গ্রাম-নাগরিক পরিবেশে. ধান বা মুরগীর এ বিবর্ত্তন তাদের পক্ষেও ক্ষতিকর তো নয়ই, বরং উপকারী। তবে এই পরিবেশ বদলালে হয়ত তাদের বাঁচা কঠিন হতে পারে।

যোগ্যতার প্রশ্নটি তোলা হয়েছে বলেই আর একটি প্রশ্ন এখানে তুলছি। সেটি হল ইকোলজির দিক থেকে কৃষির উপযুক্ততা ও যোগ্যতা কতটা? এর উত্তরে বলা যায় যে কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা. তার নিচের ইকোসিষ্টেম থেকে নিচ্ছে ও দিচ্ছে। আবার তার উপরতলায় যে নাগরিক ও মহানাগরিক ইকোসিষ্টেম রয়েছে, তাদের কাছে দিচ্ছে ও নিচ্ছে। এটা যদি উপযুক্ত হয়, তা হলে কৃষি ও গ্রামীন ইকোসিষ্টেমের স্বাস্থ্য বজায় থাকবে। অনেক সময় আমরা দেখি সহর গ্রামকে শোষণ করে। এ তখনই ঘটে যখন সহর তার বিচিত্র-পৌষ্টিক ইকোসিষ্টেম থেকে গ্রামের উদ্ভিদ প্রাণীপৌষ্টিক ইকোসিষ্টেমে যা দেবার, তার চেয়ে কম দেয়। এ হতে পারে কি করে? না সহর কৃষি উৎপন্নের দাম কম দিল, কিন্তু ফার্টিলাইজার, ডিজেল, ট্রাকটার ইত্যাদির দাম বেশী নিল। সহরের পক্ষে এটা সহজ। কারণ ধনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষমতাটা সহরমুখী।

সহরের লোকের খনিজাত, উদ্ভিদজাত ও প্রাণীজাত জিনিসপত্রের চাহিদা গ্রামের লোকের তুলনায় বেশী। অথচ সহরের ইকোসিষ্টেমে তা উৎপাদন করার ব্যবস্থা নেই। এমন কি আলো, বাতাস, জল ইত্যাদির প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক সংবহনও সহরে বাধাগ্রস্ত। সেই জন্য ইলেকট্রিক আলো, এয়ারকণ্ডিশানিং, কল টিপলে পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে, একটা পরিবেশের ভিতর পরিবেশ তৈরি করতে হয়েছে। সহরের যা খাদ্য, প্রাণীজাত বা উদ্ভিদজাত, তা পর্যন্ত অন্য ইকোসিষ্টেমের। আর সহর প্রধানতঃ যা দিতে পারে, তা জ্ঞাতব্য পর্যায়ের, যেমন শিক্ষা, আনন্দদান, গবেষণা, প্ল্যানিং, যোগাযোগ ইত্যাদি।

এগুলি নিচের দিকের ইকোসিস্টেমে দেয়া হচ্ছে। তাই বলা যায়, এ ইকোসিস্টেম একটু মাথা ভারী। সামান্য একটি সুইচ খারাপ হলে, সবকিছুই বানচাল হয়ে যেতে পারে।

আজই সময় এসেছে, যখন মানুষকে ভেবে দেখতে হবে বিশ্বের আবহাওয়া জগতে সে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে ও তার ফলাফল কি হবে? মানুষের অনুভূতি ও কল্পনাশক্তির তুলনা জীবজগতে নেই। এই ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার আজ তাকে করতে হবে, বিশ্বের আবহলোককে সার্থকতাপূর্ণ করে তোলবার জন্য। এই সার্থকতা লাভ করতে হলে, বিশ্বব্যাপী একটি ইকোলজি-নীতিরও প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। এই অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ ইকোলজি সম্মেলনের কথাও উল্লেখ করেছি। সেই প্রসঙ্গে কানাডার পিয়ের দাঁসেরুর বক্তব্যের কথাও উল্লেখ করেছি। তিনিই তাঁর বক্তব্যে বিশ্বব্যাপী একটি ইকোলজি নীতির সুপারিশ করেছেন। ব্যক্তিগত ও সমাজগত ভাবে, মানুষের ইকোলজিগত কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে আলোক-পাত করেছেন। সেটি আমার মতে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে তা পাঠকদের উপহার না দিলে ইকোলজির অনেক কথাই বলা হবে না।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তথাকথিত "ফোর ফ্রিডমের" মূলে কয়েকটি কর্ত্তব্যও রয়েছে। কর্ত্তব্যের মধ্যে থেকেই অধিকার জন্মায়। কারণ সকলে তাদের কর্ত্তব্য করায়, যে সম্মিলিত সম্পদের উদ্ভব হল, তাকেই তো ভোগ করা যাবে আবার অধিকার হিসাবে। অন্য সময়ে জল ধরে রাখলে, তবেই তো পাওয়া যাবে তৃষ্ণার জল। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, ইকোলজি তো একটা বিজ্ঞান। তার আবার নীতি কি? তা হলে কি জঙ্গলের আইন চলতে দিয়ে ইকোলজি দূরে দাঁড়িয়ে শুধু তাই দেখবে? প্রকৃতিতে ভাল মন্দ বলে কিছু আছে কি ফিল্মের "ভিলিয়ানের" মত? আগাছা, নেকড়ে, শকুনি না সজারু কে বলব ভিলিয়ান? ঠিক ওমনি, জল-বাতাসের উপর মানুষের অধিকার কি অন্য প্রাণীদের চেয়ে বেশী? যদিও এ সব কথার উত্তর দেয়া শক্ত, তবু এ কথা সহজেই বলা যায়, যে নিঃশ্বাস বায়ুর অধিকার মোটরগাড়ী চালানর অধিকারের চেয়ে অনেক বড়। তাই ইকোসিস্টেমে মানুষ এসে পড়ার পর, বোধ হয় সবটা একটু নতুনভাবে দেখতে হয়।

পিয়ের দাঁসেরুর মতে, মানুষ মঞ্চে আসার পর, আমরা যদি সবটা পাঁচটি

ইংরাজি "E" অক্ষর দিয়ে তৈরি বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের মাধ্যমে দেখি, তা'হলে আমরা সত্যকার অদ্বৈত মতবাদ গ্রহণ করতে পারি। এগুলি হল যথাক্রমে—

Ecology

Ethology

Economics

Ethnology

Ethics

কি করে একটি বিজ্ঞান পরবর্ত্তিটিতে উপনীত হয়েছে তা বলতে গিয়ে উক্ত লেখক, এক জাতের গরু ও বিশেষ জায়গার পরিপ্রেক্ষিতে দিয়েছেন উদাহরণগুলি।

ইকোলজি—একদল গরু ধরা যাক, একটা ঘাসজমিতে আছে। সেই ঘাসজমিতে মাঝে মাঝে গাছ। এদের সঙ্গে সহ অবস্থানে রয়েছে, কিছু সরিসৃপ কিছু উদ্ভিদভোজী প্রাণী, পাখী ইত্যাদি। জল, উত্তাপ, পুষ্টি, পারস্পরিক সহযোগিতা, এ গুলির মাধ্যমে আবহাওয়াটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন গরুদের জ্বালাতন করে যে পোকামাকড়, তাদের সংখ্যা সীমিত রাখে এই সরিসৃপরা ও পাখীরা। এইভাবে একটি ইকোসিষ্টেম সেখানে চালু আছে ধরা যাক।

ইথোলজি (প্রাণী ব্যবহার বিজ্ঞান)—আফ্রিকায় বন্যপ্রাণী হিসাবে জন্ম নিলেও, এই গরু খুব চঞ্চল প্রকৃতির নয়। এই জন্যই তাদের পোষ মানানো সম্ভব হল। এরা বেশী চলা ফেরা করার চেয়ে, কম নড়াচড়া করার পক্ষপাতি। এই জন্য গৃহপালিত করে তাদের দুধ ও ওজন প্রচুর পরিমাণে বাড়ান সম্ভব হয়েছে।

ইকোনমিকস (অর্থনীতি)—মানুষ বন কেটে, কিছু ঘাস জমি যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি আবার নানা শিল্পে অনেক জমির ব্যবহারও হয়ে গেছে। তবু গরুরা ভাল আছে, বেশী দুধ ইত্যাদি দিচ্ছে। মানুষেরও তথাকথিত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

এথ্‌নোলজি (মানব সংস্কৃতি বিজ্ঞান)—বিবর্ত্তনে মানুষের শিল্প, সংস্কৃতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি সব কিছুর পরিবর্ত্তন যেমন হতে থাকে, তেমনি শিল্প ও সংস্কৃতি বিজ্ঞানও গড়ে উঠেছে।

এথিক্‌স—গো পালন ও গো দুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে, গো জাতীর প্রতি শ্রদ্ধা, গো মাতার ধারণা, গো মাংসের উপর নিষেধ, ইত্যাদি তথাকথিত

এথিকসও জন্মায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে যে ধরনের এথিকস, নীতিবোধ, ধর্মবিশ্বাস, দর্শন, ইত্যাদি জন্মেছে, তার মূলে ছিল ইকোলজি ও ইকোসিস্টেমের বিবর্ত্তন। প্রতিটি ইকোসিস্টেম থেকে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ ও সুবিধা মানুষ নিয়েছে ও নিতে পেরেছে। এটাই মানুষের জীবনে, চিন্তায় সর্বত্র বিবিধ বিবর্ত্তনেরও সূচনা করেছে।

বললাম ইকোলজির প্রতিটি পুষ্টি স্তর থেকেই মানুষ, যা তার প্রয়োজন, তা নিয়েছে। যেমন প্রথম অর্থাৎ ধাতুপৌষ্টিক স্তর থেকে পায় আলো, বাতাস, জল, খনিজদ্রব্য ইত্যাদি। উদ্ভিদপৌষ্টিক স্তর থেকে পায় উদ্ভিদজাত খাদ্য, কাঠ, পাতা, ইত্যাদি। পাতা সংস্কৃতি বিপ্লবকে সম্ভব করেছে, তার উদাহরণ তালপাতার পুঁথি, প্যাপিরাস। প্রাণীপৌষ্টিক স্তর থেকে নিয়েছে মাংস, ডিম, দুধ, চামড়া, লোম, হাড়, দাঁত, সিং, নখ ইত্যাদি বস্তুকে নানাভাবে মানুষ ব্যবহার করে আসছে। আর বিচিত্রপৌষ্টিক স্তর থেকে মানুষ পেয়েছে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইত্যাদি সব।

মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদারও একটা শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। এখানে দেখা যায়, যে শারীরবৃত্তিক চাহিদাটা যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণাগুলো সব চেয়ে আগে। তারপর আসে মনোজগতের চাহিদা, যেমন প্রেম, স্নেহ ইত্যাদি। তারপর সামাজিক দাবীগুলি, যেমন একাকীত্ব-সখ্যতা, প্রতিযোগিতা—সহযোগিতা, দল, জাতী ইত্যাদি। তারপর রয়েছে অর্থ নৈতিক চাহিদা, যেমন, দারিদ্র্য-প্রাচুর্য ইত্যাদি ও তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে রাজনীতি যেমন রাষ্ট্র, শেষ চাহিদা হল ধর্মজাগতিক ও দার্শনিক বিষয়গুলি।

মানবজাতীর সম্পর্কে যা বললাম, তা থেকেই হয়ত এ কথা বলা যাবে যে আজ ইকোলজি সংক্রান্ত কর্ত্তব্য ও অধিকারের সনদ আমাদের একযোগে গ্রহণ করতে হবে। পিয়েয় দাঁসেক্ক এক, দুই করে অধিকার গুলির কথা বলে তার পর কর্ত্তব্যগুলির কথা বলছেন।

ইকোলজি সংক্রান্ত অধিকার (সনদ)

ভূমিকা

বিভিন্ন পৌষ্টিক স্তর ভেদে বিশ্বের মানব সমাজের যে ইকোলজি সম্পর্কিত অধিকার রয়েছে সে গুলি সংখ্যা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা হল :

(ক) শারীর বৃত্তিক অধিকার

১। ল্যাটিচিউড অনুযায়ী স্বাভাবিক দিনের আলো পাবার অধিকার (স্মগ, ধোঁয়া থেকে মুক্তি পাবার অধিকার।

২। শ্বাসবায়ু স্বাভাবিক ও উপযুক্ত পরিমান অক্সিজেন, যা অন্য কোন দুষিত গ্যাস থেকে মুক্ত, তা পাবার অধিকার।

৩। পাণ করবার জন্য ও স্নান, ধোয়া, এ সবের জন্য জল বা অনুরূপ কোন তরল পদার্থ পাবার অধিকার।

৪। খাদ্য হিসাবে উপযুক্ত পরিমানে উদ্ভিদজাত কি প্রাণীজাত আহার্যবস্তু পাবার অধিকার।

৫। শীত, গ্রীষ্ম, জল, ঝড় ও অনুরূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঁচার জন্য উপযুক্ত আশ্রয়ের অধিকার।

৬। সন্তান উৎপাদনের সাহায্যে আত্মসৃজনের অধিকার।

(খ) মনস্তাত্তিক অধিকার

৭। নড়াচড়া, ব্যায়াম, খেলাধূলা ইত্যাদির উপযুক্ত নিম্নতম জায়গাটুকু পাবার অধিকার।

৮। অতিরিক্ত শব্দ, আলো, ইত্যাদি অকারণ স্নায়বিক উত্তেজনা ইত্যাদি (যার জন্য অন্ধত্ব বা বধিরত্ব হতে পারে) থেকে মুক্তি পাবার অধিকার।

৯। প্রেম ও যৌন অধিকার (সামাজিক বাধা বা বিশেষ একদেশদর্শী আইনের পরিবর্ত্তন সাধন।)

১০। বিবিধ আকর্ষণের, (যার মাধ্যমে বিবিধ ধরনের যোগাযোগ সম্ভব, যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক) অধিকার।

(গ) সামাজিক অধিকার

১১। ইচ্ছামত জায়গায় বাস করবার অধিকার (কালা কানুন ও অর্থ নৈতিক বাধা থেকে মুক্তি।)

১২। উপযুক্ত স্থানের মধ্যে নিজের বাড়ী, ঘর, সংসার, সামাজিকতা নির্বাহের অধিকার (রাজনৈতিক চাপ বাদ দিয়ে সামাজিক মিলনের ক্ষমতা।)

১৩। পছন্দমত নিজের শেখা বা জানা কিছুর প্রয়োগ করে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে কাজ পাবার অধিকার (বেকারত্ব ও অনুরূপ পেষণ থেকে মুক্তি।)

১৪। ব্যক্তিগত, পেশাগত ও সামাজিক যোগাযোগের অধিকার।

(ঘ) সামাজিক অধিকার

১৫। যতটুকু নিম্নতম আয় হলে অন্য সামাজিক ও অর্থ নৈতিক বাধা দূর হয়ে, জাতীয় ও আন্তর্জাতীক মাথাপিছু গড় আয়ের উপযুক্ত সরিক হওয়া যায়, তার অধিকার (শ্রেণী শোষণ ও অনুরূপ সামাজিক অত্যাচার থেকে মুক্তি।)

১৬। যে সমস্ত সম্পদ এখনো কাজে লাগানো যায় নি, সেগুলির উপযুক্ত ধারাবাহিকতা সৃজন করে, তাকে সমবেত কাজে লাগানর চেষ্টা করার অধিকার (অজ্ঞতা ও সামাজিক অন্ধতা থেকে মুক্তি।)

১৭। নিম্নতম ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখার ও তা ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকার।

(ঙ) রাজনৈতিক অধিকার

১৮। শিক্ষার অধিকার ; যে শিক্ষায় মানবজাতীর সঞ্চিত জ্ঞান ও জ্ঞাতব্য বস্তুর উপর অধিকার জন্মায়।

১৯। বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ আহরনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যবস্থার সব জ্ঞাতব্য জানবার অধিকার।

২০। করণীয় বস্তুর সামাজিক নীতি নির্দ্ধারণে ব্যক্তব্য জ্ঞাপনের অধিকার।

(চ) ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কিত অধিকার

২১। কোন ব্যক্তিগত বা ঐতিহাসিক ভাবে প্রচলিত বিশ্বাস পোষণ করার অধিকার। সে বিশ্বাসকে অবশ্যই বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেয়া প্রয়োজন।

২২। একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী লোক যারা, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে মিলিত হয়ে প্রার্থনা করার অধিকার।

২৩। বিশেষ গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ে ভুক্ত মানুষের যে বিশেষ আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদ আছে, তা ভোগ করবার, শ্রীবৃদ্ধি সাধনের, ও ব্যবহারের অধিকার।

সম্প্রদায়গত অধিকার

ইকোলজির দিক থেকে যে সব গুলি ব্যষ্টির জন্য অবশ্যক আধিকার বলে মনে করা যেতে পারে তা ছাড়া কিছু সমষ্টিগত অধিকারও আছে। সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে যে একজনের কাছে যে বা বিষ, তা আবার আর একজনের কাছে অমৃত। এই ভাবে দেখলে মনে হতে পারে যে, সমষ্টির পক্ষে একসঙ্গে

গ্রহণযোগ্য কোন অধিকার সম্ভব কি না। শারীরবৃত্তিক দিক থেকে প্রাণীদের একটা মিল রয়েছে। আর সব মানুষেরই মানসিক দিক থেকে সেইরকম মিল। কাজেই অধিকারের প্রশ্নেও, অন্ততঃ কতকগুলো সমষ্টিগত অধিকারও থাকবে। তা ছাড়া সমষ্টিগত অধিকার, যার মাঝখানে থেকেই কর্ত্তব্য জন্মগ্রহণ করে, তার মূল্যও কম নয়।

২৪। খনিজাত প্রাণীজাত, উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ যা আছে, তা যথেচ্ছ, ব্যক্তিগত ব্যবহারের পরিবর্ত্তে সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রনের অধিকার।

২৫। ব্যক্তিগত সম্পদ তা শারীরিক মানসিক বা অন্য রকমের যাই হক না কেন, তার পুনর্পৌনিক আবর্ত্তনের সাহায্যে তা সমষ্টির গ্রহণযোগ্য করার অধিকার।

২৬। আবহলোকের সংগঠন কি রকম হবে, তা পরিকল্পনার অধিকার (এর জন্য ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফাবাজীর উপর হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।)

২৭। ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত বিষয়ে উপযুক্ত আইন করার অধিকার (অন্য রকম সামাজিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য।)

২৮। সংস্কৃতিগত ভাবে ইকোসংরক্ষণ সমস্যাকে তুলে ধরার অধিকার।

সামাজিক কর্ত্তব্য

অধিকারগুলির সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তব্যের কথাও স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। পরিবার, গোষ্ঠি, সম্প্রদায় ও সমাজের সম্মিলিত কর্ত্তব্যপালনের ফলে, যে সামাজিক শক্তির উদ্ভব হয়, সেটাই ব্যক্তিগত সুবিধা ও অধিকার হয়ে ওঠে। তাই পরিপূর্ণভাবে আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন।

২৯। জীবনের সামগ্রিক বৈচিত্র রক্ষার জন্য কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তথাকথিত ক্ষতিকর প্রাণীদের উচ্ছেদের পন্থা, সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করে তবেই তা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

৩০। আমাদের কর্ত্তব্য হল বিশেষ বিশেষ ইকোসিষ্টেমের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা।

৩১। অবহেলিত সম্প্রদায়ের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ, বিকাশ, ও উন্নতির চেষ্টা করা।

৩২। রেডিও—এ্যাকটিভিটি, কি অন্য যে কোন ভাবে দূষিত হওয়া থেকে জৈবিক আবহাওয়াকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

কর্তব্য, অকর্তব্য অনুযায়ী একটি সনদের আকারে ইকোলজি সংক্রান্ত বিধি ও নিষেধগুলি, কমনওয়েলথ দেশসমূহের ইকোলজির সম্মেলনে পিয়ের দাঁসেরুর বক্তব্যগুলি এখানে পেশ করলাম। সনদের আকারে এ গুলিকে পেশ করলাম এই জন্য, যে হয়ত এখনই সময় এসেছে, যখন জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মত কোন সংস্থার মাধ্যমে, সমস্ত জাতীর পক্ষে আবশ্যিক ভাবে গ্রহণ করতে হবে, এমন একটি সনদ গড়ে ওঠা দরকার। এ সনদ পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখার সনদ। এ ধরনের কোন সনদ যদি সারা পৃথিবীর জাতীগুলি গ্রহণ করে, তা হলে তাহাদের বহু প্রচলিত আইন-কানুন, রীতি-নীতি বদলাতে হবে। কিন্তু আজ একদিকে এই সামান্য রদবদলের অসুবিধা, আর একদিকে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব। মানুষকে আজ এ দুয়ের মধ্যে বেছে নিতে হবে।

এই অধ্যায়টিতে আমরা ইকোলজি নাম নিয়ে বিজ্ঞানের যে নতুন দিকটি গড়ে উঠেছে, তার কিছু আলোচনা করলাম। নবজাত এই বিজ্ঞান, দিকে দিকে তার গণ্ডি বিস্তার করতে সুরু করেছে। এ বিস্তার আগ্রাসনের বিস্তার নয়, এ বিস্তার রক্ষায়। কিন্তু রক্ষা করতে হলে, রক্ষকের হাতে দিতে হবে নিয়ন্ত্রনেরও অধিকার। তার জন্য নিজেদের যথেচ্ছাচারিতা কমাতে হবে। কিন্তু তা কি আমরা হতে দিচ্ছি। আমরা ভোগবাদের উগ্রতায়, উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৫%—৭½%—১০%—১৫% এমনি করেই বাড়িয়েই যেতে চাচ্ছি। কিন্তু শিল্প, উৎপাদন, বিলাস ইত্যাদি বৃদ্ধি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? উৎপাদনের ঝোঁকে কি আমরা সৃষ্টিকে ভুলি নি? তাই প্রকৃতির সম্পদ আমরা লুণ্ঠন করছি, কিন্তু নূতন সম্পদ সৃষ্টি করছি না। তার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যন্ত এমন ভাবে রিক্ত হয়ে আসছে যে অদূর ভবিষ্যতে, এই রিক্ত সম্পদে প্রাণ পর্যন্ত আর থাকতে পারবে না। বিভিন্ন অধ্যায়ে এ সতর্কবাণী করার চেষ্টা করেছি।

জীবের মধ্যে মানুষ এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম। এই অভূতপূর্বতার আবার দুটি বিশেষ দিক আছে। একটি হল মানুষ আত্মসমালোচক, আর একটি হল যে সে সৃজনশীল। আত্মসমালোচক হবার ফলে, ক্ষতিকর যদি কিছু

সে করে ফেলে, তা থেকে ভবিষ্যতে বিরত হতে সে সক্ষম। আবার সৃজনশীল হবার ফলে, শুধু নিজের ব্যবহারের সম্পদই নয়, প্রাকৃতিক সম্পদও তার পক্ষে সৃষ্টি করা সম্ভব। সম্পদ সৃষ্টিও মানুষ করে, প্রকৃতিতে রয়েছে, এমন কিছুর রূপান্তর ঘটিয়ে। যেমন বাতাস রয়েছে। সেই বাতাসের সাহায্যে একটি পাখা ঘুরিয়ে হয়ত বিদ্যুত সৃষ্টি করা হল। এটি একটি নতুন সম্পদ, যা অন্য সম্পদের রূপান্তর ঘটিয়ে করা হয়েছে। প্রকৃতিতে যা নেই এমন কোন আকাশজাত বা শূণ্যজাত সম্পদ আমরা তৈরি করতে পারি না। অনেকে হয়ত তর্কের খাতিরে বলবেন, কেন? এই যে নাইলন, পলিথিন ইত্যাদি বস্তু কোনদিন প্রকৃতিতে ছিল না। এমনকি এগুলির রাসায়নিক অনুবিন্যাস, পার্থিব রাসায়নিক বস্তুর অনুবিন্যাস ও অনুগঠনের ভিন্নরূপ। কাজেই এ বস্তুগুলি মানুষের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হল কি করে? এর উত্তরে বলা যায় যে অক্ষরগুলি জানলে, তার বিন্যাস বুদ্ধিমান কোন জীবের পক্ষে সহজ। "ক" আর "র" এই অক্ষর দুটি জানলে, মানুষের কাছে তা "কর" হতে পারে আবার "রক"ও হয়।

হয়ত অন্য কেউ বলবেন আইনষ্টাইন বা রবীন্দ্রনাথের কথা। তাঁদের যে সৃষ্টি তাও তো সম্পদ। এই বিপুল সম্পদ তো তাঁরা তাঁদের মনের কল্পনা থেকেই সৃজন করলেন? কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ কি আইনষ্টাইনের যে বিরাট মনোজগৎ, তা তাঁদের বিশেষ ইকোসিষ্টেমের বাইরে নয়। তাঁদের খাদ্য, পাণীয়, শিক্ষা, দীক্ষা সবই তাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের ইকোসিষ্টেম থেকে। অবশ্য দেবার সময় দিয়েছেন, যেটুকু নিয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রাণী বা উদ্ভিদ জগতেও, ছোটখাট ভাবে এর তুলনা দেয়া যায়, অধিক ফলনশীল ধানের।

এমনি করে দেয়া নেয়ার যে রূপান্তর, তারই মাধ্যমে ইকোসিষ্টেম, ও তার মধ্যে আবার জীবন রয়েছে। ইকো—বৃত্তগুলিকে বুঝলে, তবেই জীবন-ছন্দ বোঝা যায়। কিছু করতে হলে প্রথমেই তাই বুঝতে হবে।

রোমক সভা

আমেরিকার (সায়েন্স) Science পত্রিকা একটি কট্টর বিজ্ঞান পত্রিকা। এখানে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরে একটি লাইনও অন্য কিছু ছাপা হয় না। কয়েকবছর আগে, সেই সায়েন্স পত্রে, "ক্লাব অফ রোম" একটি বিশেষ কর্মসূচির ফল প্রকাশ করেছেন দেখা গেল। রিপোর্টটি যাঁরই নজরে পড়ল, তাঁদেরই কৌতুহল হল এই 'ক্লাব অব রোম' কি তা জানার। রিপোর্টটি মধ্যেই এই ক্লাবের যেটুকু জানার, তা ছিল। দেখা গেল, সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রায় জন চল্লিশ বিজ্ঞানী, এই রোম সহরে একটি বিশেষ প্রকল্পের কাজে সমবেত হয়ে, নিজেদের সংস্থাটিকে ওই নাম দেন।

প্রথমে বৈজ্ঞানিকরা কি কি বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তারই কিছুটা পরিচয় দিচ্ছি। এঁদের মধ্যে ছিলেন পদার্থবিদ্যার বিবিধ অংশের বিশেষজ্ঞরা, ছিলেন রসায়ণের বিভিন্ন দিকের দিকপালরা, গণিতবিদরা। ভৌগলিকেরা, ভূতত্ত্ববিদ্, কৃষিবিদ্‌রা, প্রাণীবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ারেরা, নৃতত্ত্ববিদ্, কম্পুটারবিজ্ঞানী, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এবার তাঁদের কাজটা কি ছিল, ও সেই কাজ করার পরিকল্পনাটা কি ভাবে পরিচালিত হবার কথা ছিল, তাই বলি। সায়েন্সে ক বছর আগে তাঁদের প্রাথমিক রিপোর্ট বার হওয়া ছাড়া তাঁদের ওই সংস্থা একাধিক বই প্রকাশ করেছেন, যেমন Pattern of Growth ; Goals for Mankind ; Beyond the Age of Waste ; ইত্যাদি ইত্যাদি। বইগুলি পেপার ব্যাকে। আমাদের দেশেও এসেছে। কিন্তু ডলার মূল্যের অনুবাদে আমাদের টাকায় এ বইগুলিব এক এক খানির দাম একশো, দেড়শোর কাছে। কাজের প্রকল্পে এবার আসি। সারা পৃথিবী জুড়ে জল, বাতাস, খাদ্য, প্রাণী, উদ্ভিদ, খনিজ ইত্যাদি নির্বিশেষে যা কিছু সম্পদ আছে, এমনকি ভবিষ্যতেও যা কিছু সম্পদ উৎপন্ন হতে পারে, এই সবকিছু কম্পুটারের সাহায্যে গণনা করে, সেই তথ্যগুলি কম্পুটারে ফিড করা হল। আবার অন্যদিকে সেই সব সম্পদ কি ভাবে খরচ ও নষ্ট হচ্ছে, ও তার ভবিষ্যত চেহারাটা কি হতে পারে, তাও কম্পুটারের গণনায় বার করে, সেই

তথ্যগুলিও কম্পুটারে আগের তথ্যগুলির সঙ্গে একসঙ্গে ফিড করা হল। এরই ফলে বহু রকমের জ্ঞাতব্য বার হয়ে আসতে লাগল, কম্পুটার থেকে। এর মধ্যেও থেকেও আবার প্রয়োজনীয় তথ্য কম্পুটারে ফিড করা হতে লাগল. নতুন জ্ঞাতব্যের জন্য। তা ছাড়া আমাদের হিসাবে যে ভুল থাকা সম্ভব তাও কম্পুটারকে যথোপযুক্ত ভাবে ফিড করে যাওয়া হল। উদ্দেশ্যটা হল, সম্ভব ভ্রান্তিগুলিকেও হিসাবের মধ্যে ধরে, তথ্যগুলিকে নির্ভুল করা।

তার মানে, সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যা হিসাব করে উঠতে, একজন অভ্যস্ত হিসাবকারীরও, হয়ত কয়েক মাস কি বছর লেগে যাবে তাই হয়ত কম্পুটার, যাকে আমরা ইলেকট্রনিক ব্রেণ বলি, তার মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে। ঠিক এমনি বলা যায়, ভবিষ্যতে সম্পদ, ও তার ব্যবহার ও হয়ত তারপর সে সম্পদগুলির নিদারুণ অভাবের ফলে, মানব জাতীর কি অবস্থা হবে, তাই কম্পুটারের সাহায্যে অবিলম্বে জানা হয়ে গেল। যা আছে, যে ভাবে চলছে ও ভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে, তা বোঝার জন্য যেন, পৃথিবীর সম্পদ, তার ক্ষয় ও ক্ষয়ের পরের অবস্থার একটি মোটামুটি সার্থক, কিন্তু দ্রুতগামী মডেলর সাহায্যে ভবিষ্যতটা বোঝার চেষ্টা করা হল। এর ফলেই বার হল, ক্লাব অফ রোমের সেই বহু বিতর্কিত কাজটি, Pattern of Growth বইটি ও সায়েন্স পত্রিকায় এর সংক্ষিপ্ত প্রাক্কটি। এ লেখার উদ্দেশ্য ছিল, সারা পৃথিবী জুড়ে এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ, আলোচনা, বিতর্ক, বিশ্লেষণ সুরু হয়ে যাক. যে সমস্যাগুলিতে সমগ্র মানবজাতী, অন্য জীব সমেত, পরিবেশ শুদ্ধ নিয়ে সারা পৃথিবী জড়িয়ে রয়েছে সে সমস্যাগুলির আলোচনা বড় করে হওয়া উচিত।

ক্লাব অফ রোমের আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, ক্লাব অফ রোমের পরবর্ত্তি রিপোর্টটি Beyond the Age of Waste এর ভূমিকায় লিখলেন, "In 1972, the report, "The limits to Growth" appeared directed towards world public opinion. It was compiled by a group of scientists from different disciplines who used unorthodox methods and at times unavoidably inadequate data. The influence this publication had in arousing public interest in problems of the future went far beyond the expcc-tations of its authors."

লেখকরা কতটা সাড়া আশা করে ছিলেন, তা জানি না। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এত বড় বড় সমস্যাগুলির যে পরিমাণ চিন্তা, আলোচনা, আলোড়ন, ইত্যাদি হবার কথা ছিল, তা হলে হয়ত আজ আমরা সমাধানের কাছে এসে পৌছতাম। অবশ্য সায়ন্স পত্রে ওই প্রবন্ধটি বার হবার পর, বিভিন্ন দেশের কিছু কিছু বিজ্ঞানী বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় কিছু লেখালেখি করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেরই বক্তব্য ছিল, যে ক্লাব অফ রোমের লেখাটি ও বইখানি নিরাশাবাদী। কম্পুটারে এত বিভিন্ন ধরনের তথ্য ফিড করা হল, কিন্তু যদি কোন অসাধারণ আবিষ্কার, এর মধ্যে সব কিছুর মোড় ঘুরিয়ে দেয়, তা হিসাবের মধ্যে রাখা হয় নি। অবশ্য এখানে একটা যদির কথা রয়েছে কিন্তু এই যদির ঘরেই তো মানুষের সমস্ত গবেষণা। আর সেই গবেষণা হচ্ছে বলেই তো, বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। তাই বুঝি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর "নদী ও যদি" কবিতায় বলছেন।

"মুক্তি আমার যদির মধ্যে তাই
যদির শূন্যে ছড়াই অলীক পাখা
আষ্টে পিষ্টে আইন-বাঁধা প্রাণ
এই যদিতেই বিদ্রোহী বলাকা।"

কিন্তু ইতিহাস জানে বিজ্ঞান যে পাখা ছড়িয়েছে সে পাখা অলীক পাখা নয়।

সায়ন্স বা নেচারের মত সম্মানিত ও সারা বিশ্বে সর্বত্র প্রচারিত বিজ্ঞান পত্রে বাদ, প্রতিবাদ হল দেখে হয়ত ক্লাব অফ রোমের বিজ্ঞানী'রা খুসী হলেন, যে পৃথিবীর বিদগ্ধ মহলে, বিশেষ করে বিজ্ঞানী মহলে তো আলোচনা হচ্ছে, তা হলেই হল। কিন্তু যে সব সমস্যা সব মানুষেরই, তাতে সকলকেই যোগ দিতে হবে। অন্ততঃ সমস্ত শিক্ষিত মানুষকে, তো বটেই। কিন্তু তা হয়েছে কি? আমাদের দেশের কটি বহুল প্রচারিত পত্রে এ সব আলোচনা প্রকাশ করা হয়েছে? আলোচনার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তথাকথিত ক্লাব অফ রোম ও তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে শিক্ষিত পাঠকদের কতটুকুই বা জানানো হয়েছে? অন্ততঃ আমার নজরে তো পড়ে নি।

কম্পাস বলে একটি সমাজ সচেতন ছোট সাপ্তাহিক ছিল এর ব্যতিক্রম। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের একটি সাপ্তাহিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "দেশব্যাপী একটি বিতর্কের প্রস্তাব" করেছিলেন। এই প্রস্তাবে বলা

হয়েছিল, "এই বিতর্ক সভাতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উপস্থিত করা যেতে পারে।

"১। সদ্য স্বাধীন উন্নতিকামী এফ্রো-এসিয় দেশগুলির সংকট ও পরাধীনতা বাড়ছে কেন? কেন স্বাধীনতা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিশ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলি উন্নত দেশগুলির অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছে, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না?

"২। কেন দেশের মধ্যেই জনসাধারণের জীবনমান উচ্চবিত্তদের জীবনমানের তুলনায় দিন দিন শোচনীয় হচ্ছে, এবং এখানেও ধনবৈষম্য বাড়ছে বই কমছে না?

"৩। সকলের জীবনমান ও ভোগ্য বস্তুর উপর একটা সীলিং স্থাপন করার দরকার আছে কি না। বেশভূষা, বাড়ীঘর, যানবাহন, ভোগবিলাস ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন সাধারণ লেভেল টানার দরকার আছে কি না।

"৪। Standard of life-এর সাথে Standard of living-এর কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে কি না। উচ্চমান জীবন উপভোগ করলেই উচ্চমানের মনুষ্যত্ব সৃষ্টি হয় কি না।

"৫। জীবনের সার্থকতা বা fulfilment কাকে বলে?

"৬। 'মোটা ভাত মোটা কাপড়'-এর আদর্শ ও কর্মপন্থা চালু করলে দেশ থেকে উদ্যম বা incentive এর অভাব হবে না বাড়বে।

"৭। বর্তমানে যে ইনসেন্টিভ—ব্যক্তিগত উন্নতির স্বার্থপর প্রেরণা চালু আছে, তাতে দেশব্যাপী দরিদ্র জনসাধারণের কর্মোদ্যম ও উৎসাহ কমে যাচ্ছে কেন? তারা কেন দেশের ডাকে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে এগিয়ে আসছে না? উৎপাদিকা শক্তি তাদের মধ্যে দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে কেন?

"৮। সাহিত্য, শিল্প, নাটক, যাত্রায়, কাব্যে, সিনেমায় যেন কোন জাগরণমুখী উদ্দীপনা ও প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় না। সমাজের এই বহিরঙ্গের বা superstructure-এ এত পচন কেন?

"৯। কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের বাজার নেই কেন? সাধারণ মানুষের চাহিদার ক্ষেত্রে উচ্চমান আধুনিক ফ্যাসানের বিকৃতি যদি দেখা যায় তবে কুটীর শিল্প দাঁড়াবে কিসের উপরে?

"১০। দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে ও কৃষ্টি কালচারের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তনের দরকার আছে কি না। দরকার থাকলে কি করে তা সম্ভব। নতুন জীবনবোধ ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হবে কিসের উপরে ?

"১১। সাধ্যের অতীত সাধ সৃষ্টি করার ফলাফল কি ? দুর্নীতির উৎস আয়ের চেয়ে ব্যয়ের বহর থেকেই আসে কিনা ?

"১২। পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরুদ্ধে অনুন্নত দেশগুলি কেন জোট বাঁধতে পারে না। অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে বিরোধ দিন দিন বাড়ছে কাদের স্বার্থে এবং কেন ?

"১৩। অনুন্নত দেশগুলির দেশ রক্ষা খাতে বা যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য অর্থ বরাদ্দ হু হু করে বেড়ে চলেছে কেন ? কেন এই বাবদ অর্থবরাদ্দ গত পনেরো বছরের মধ্যে এই দুর্বল ও দরিদ্র দেশগুলিতে দশ গুণ বেড়ে গেছে। এর শেষ কোথায় ও পরিণাম কি ? কেন স্বেচ্ছায় হক অনিচ্ছায় হক, বাধ্য হয়েই হক দুর্বল দরিদ্র দেশগুলিও বৃহৎ শক্তিবর্গের হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে ?

"১৪। সারা পৃথিবীতেই সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব একটা সাধারণ জীবনমান বা স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং-এর ক্ষেত্রে সমতা না আনতে পারলে, পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি আনা সম্ভব কি ? ব্যালান্স অব টেরার-এর নীতিতে প্রকৃত শান্তি ও নির্ভয়-নির্ভরতা আসতে পারে কি ?

"১৫। অতি ক্ষুদ্র এই পৃথিবী, অতি সীমিত তার সম্পদ। এই সীমিত সম্পদের দ্বারা অসীম ক্ষুধা মেটাবার সম্ভাবনা সত্যিই আছে কি ? ব্যক্তিগত ধনদৌলত ও ভোগের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ সীমা বা নিয়ন্ত্রণ যদি রাখা না হয়, পৃথিবীর মৌলিক সম্পদগুলিকে যদি উড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে যাবার দুরাকাঙ্ক্ষাকেই আমরা ইন্ধন দিতে থাকি, তবে মানুষের ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি ?

"১৬। যারা মনে করেন যে পৃথিবীর বর্তমান এই সংকট সাময়িক, অবাধ ভোগবাদের জন্য উন্নয়নের যাবতীয় রিসোর্স আছে বা আবিষ্কৃত হবে। তারা নির্ভরযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থিত করুন। শক্তি সংকট বা এনার্জি ক্রাইসিস ও পৃথিবীর বাতাবরণজনিত সংকট থেকে মুক্তির বাস্তব পথ কি, তারা দেখান।

"এ জাতীয় আরো প্রশ্ন আছে। কিন্তু সবগুলিই মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্নজাত। আবার বলি, এ প্রশ্নগুলি অবাস্তব তর্ক-

বিতর্ক নয়, কেবল বুদ্ধিজীবীদের নয়। বুদ্ধিজীবীরা বরং তাদের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল জীবন বর্ত্তমান দুর্গতির মধ্যেও ভোগ করতে পারছেন, যার জন্য তারা খুব সোচ্চার নন। কিন্তু পৃথিবীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোক—যারা পৃথিবীর জনসাধারণ তাদের কাছে এ সব প্রশ্ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, জীবন মরণ সমস্যাকুল, তাদের পক্ষে চোখ বুজে থাকা অত্যন্ত বিপদজনক।

"আমরা আশা করব এ জাতীয় একটা বিতর্ক সম্মেলন ও গণ আন্দোলনের জন্য যথাযোগ্য সাড়া পাওয়া যাবে। আমরা সর্বসাধারণের মতামত শুনতে চাই, সক্রিয় অংশ নিতে দেখতে চাই দেশবাসীকে—এই জাতীয় বিতর্কে।"

কম্পাস পত্রিকার "দেশব্যাপী একটি বিতর্কের প্রস্তাব" প্রবন্ধ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলাম। দীর্ঘ উদ্ধৃতি। দীর্ঘতার কারণ হল এই, যে বহু প্রশ্ন যা ওঠা, বিতর্কিত হওয়া ও তারপর তার দেশব্যাপী, শুধু দেশব্যাপী কেন, বিশ্বব্যাপী বিতর্কে এই সব সমস্যাগুলির সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া দরকার। ঠিক বেছে বেছে এই প্রশ্নগুলিই না হলেও, অন্ততঃ অনুরূপ প্রশ্ন নিয়ে বিশ্বব্যাপী আলোচনা হক, এটা ক্লাব অফ রোমের সদস্যরাও নিশ্চয় চেয়েছিলেন। কিন্তু তা কি সত্যই হয়েছে?

বিপ্লবী পান্নালাল দাশগুপ্ত, যাঁর চিন্তাটাও কিছুটা বৈপ্লবিক তিনি শুধু ওই একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেই খান্ত হলেন না। কম্পাসকে অনুরূপ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ আরো বহু প্রবন্ধও কম্পাসে প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতেও ইংরাজিতে যাকে বলে, বরফ ভাঙ্গা, তা ভাঙ্গল না। অর্থাৎ আলোচনা, চিন্তা, ভাবনা শুরু হয়ে গেল না। "বিতর্ক" নাম দিয়ে এ প্রবন্ধগুলির একটি সংকলন পুস্তিকাও বার হল। কিন্তু তবু আলোচনা খুবই সীমিত রইল। তবু কিছু আলোচনা, কিছু কথাবার্তা হয়েছে বৈকি।

জগদ্বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ রাউল প্রেবিশকে ১৯৭৬ সালে ভারত সরকার, নেহেরু পুরস্কারে ভূষিত করেন। জাতীসংঘের আপৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান থাকার সময় তিনি উন্নতিকামী দেশগুলির সম্পর্কে যে সব সুপারিশ করেন ও দিল্লিতে যে বক্তৃতা দেন, তাতে তিনি বলেন, যে উন্নত দেশগুলিকে অনুন্নত দেশগুলির দিকে আরো বেশী করে নজর দিতে হবে। উন্নত দেশগুলির আয়ের একটা বড় অংশ উন্নতিশীল দেশগুলির জন্য খরচ করতে হবে। এ যদি না করা হয় তা হলে নিজেদের উন্নতি করার চেষ্টায়,

উন্নতিকামী দেশগুলি মালটি ন্যাশান্যাল কর্পোরেশান জাতীয় সুপার মনোপলির খপ্পরে এসে পড়বে। আবার এই সুপার মনোপলির মাধ্যমেই সারা পৃথিবী জুড়ে আর এক নয়া সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হয়ে বসবার চেষ্টা করছে।

আর্জেন্টিনার এই অধ্যাপক কি তা হলে বললেন যে, উন্নতিশীল দেশগুলি উন্নতিকামী দেশগুলিকে দয়াভিক্ষা দেবে ও তারা সেই ভিক্ষা গ্রহণ করবে? ঠিক তার উল্টো। যখন একটা সেতু বানানো হয়, তখন এ কূল না ওকূল কারো দয়া কি ভিক্ষার উপর সেই সেতু গড়ে ওঠে কি? সেই সেতুই হল বিচ্ছিন্নতা দূর করে দুই কূলের সংযুক্তি। এরই ফলে হয় দুই কূলেরই সমৃদ্ধি। কিন্তু ভোগবাদের হিষ্টিরিয়া আজ এমন ভাবে উন্নত দেশগুলিকে পেয়ে বসেছে, যে তারা তাদের জাতীয় সম্পদের এক কণিকাও উন্নতিকামী দেশগুলিকে দিতে নারাজ। তারা উন্নতিকামী দেশগুলির যে তাদের কাছে তথাকথিত দেনা আছে, তারও একপয়সা ছাড়তে রাজি নয়। আবার উন্নতিকামী দেশের কুটিরশিল্প বা অনুরূপ প্রাইমারি প্রোডাক্টস, এমনকি কাঁচামালকেও উন্নত দেশে ঢোকার সময়, এত উঁচু শুল্কের দেয়াল টপকাতে হয়, যাকে লজ্জাজনকই বলা উচিত। কিন্তু ডঃ প্রেবিশও কি উন্নত দেশগুলিকে লজ্জা দিতে পারবেন?

যে প্রশ্নগুলি নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে একটা বিতর্ক হক এ প্রস্তাব সমর্থন করেছি, পাঠকের মনে হবে, যে তার মধ্যেও কেন শেষের দিককার প্রশ্নগুলি প্রথমে তুললাম? এর উত্তর হল এই: প্রশ্নগুলি সারা বিশ্বের সমস্যা নিয়ে। শক্তি, সম্পদ, খাদ্য, আবহাওয়া, ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই আমাদের সমস্যা। তাই এর আলোচনা ও সমাধান, মালটি-ন্যাশান্যাল স্তরেই করতে হবে। কিন্তু আমরা এ গুলো মালটি-ন্যাশান্যাল স্তরে করতে প্রস্তুত নই; যদিও তার আগে মুনাফাবাজিকে মালটি ন্যাশান্যাল স্তরে নিয়ে গেছি। এখানে ইচ্ছা করেই ইণ্টারন্যাশান্যাল ও মালটিন্যাশান্যাল কথাগুলো নিয়ে একটু কারচুপি করলাম। বিদগ্ধ পাঠক তা বুঝতে পারছেন। তাই এ কথা বলাই বোধ হয় ঠিক হবে, যে মালটিন্যাশান্যাল বানিজ্যের ঝোঁকে, আজ ইণ্টারন্যাশান্যাল সহযোগিতা, যা ছাড়া আজ মানব সভ্যতা বিপন্ন, তাই আর করে উঠতে পারছি না।

ডঃ প্রেবিশের আর একটি কথাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। ওই দিল্লীর বক্তৃতায় আমাদের কাছে তিনি আর একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তিনি বলেছেন যে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির আজ স্লোগান হল "এক্সপোর্ট অর পেরিশ" অর্থাৎ রপ্তানি কর অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে—এই প্রতিযোগিতার ফেরে পড়ে যেন উন্নতিশীল দেশগুলি নিজেদের বিক্রি করে দিতে না বসে। উন্নতিশীল দেশগুলি যেন নিজেদের উন্নত দেশের মডেলে ঢেলে সাজবার মোহ ত্যাগ করে। উন্নতিশীল দেশের লক্ষ্য হল দারিদ্র্য দূর করা। কিন্তু তা করতে গিয়ে তারা চাইছে নিজেদের দেশকে ইউরোপ আমেরিকা বানাতে।

তথাকথিত "লেসে-ফেয়ার" বা যেমন চলছে চলুক এই তথাকথিত স্বাধীন অর্থনীতির স্বাধীনতা কার স্বার্থে? বিশেষ শ্রেণী সম্প্রদায়ের স্বার্থেই যে তা, এ কথা বলে দেবার প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের অর্থনীতির উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ, আজ অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থেই প্রয়োজন। উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপরই বিশেষ করে, এই নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। বলাবাহুল্য, এ নিয়ন্ত্রণের এথিকস হতে হবে সাম্যনীতি। যেমন উৎপাদন ও বণ্টনের কথা হল, তেমনি ভোগ বা কনসামসানের কথাও আসে এই নিয়ন্ত্রনের আওতায়। উন্নত দেশগুলিতে যে ভোগবাদের পর্যায়ে কনসামসান প্যাটার্নকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার ফলে বিনিয়োগের জন্য মূলধন জমবার আগেই, তা খরচা হয়ে যেতে থাকবে, ভোগাপণ্যের পিছনে দৌড়তে গিয়েই। তার ফলে মূলধনের অভাব দিন দিন না কমে বাড়তেই থাকবে।

এখানে হয়ত কেউ প্রশ্ন করবেন, যে ক্যাপিট্যালিজম আসবার আগে, ইউরোপে ক্যাপিট্যালিজমের উপযুক্ত মূলধন জমা হয়েছিল কি করে? কিন্তু যারা ইতিহাসের খবর রাখে, তারা জানে, কি ভাবে আর কত দীর্ঘদিন ধরে, সেই মূলধন জমে উঠেছিল। তা ছাড়া সেই ইতিহাস এমন গৌরবময়ও ছিল না, যে তা আবার এলে ভাল হত, এ কথা বলা চলবে।

অবশ্য ধন, উৎপাদন, বণ্টন, শিল্প, ইত্যাদি সবকিছু যদি মার্কসীয় আদর্শে বিন্যস্ত হত, তা হলে হয়ত একটা উপযুক্ততর বিকল্প, পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু দুই অর্থনীতির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান, ও দুই মার্কসীয় অর্থনীতির বিবদমান অবস্থানের মাঝখানে, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্ব; সহজ ভাষায় যাকে বলা যায় অনুন্নত, অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলি। কাজে কাজেই এই উন্নয়নশীল দেশগুলির, উন্নত দেশগুলির আদর্শলিপি নামক কপিবুক থেকে লিপি নকল না করে, অন্য কিছু একটা করা দরকার। কারণ মর্কসবাদী অর্থনীতির মধ্যেও ন্যায়সঙ্গত

বণ্টনব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক ভাবে চালু হতে পারে না। সেখানেও তা সুনীতির খাতিরেই করতে হয়।

থিয়োরি হিসাবে এ কথা বলা হয়েছে, যে একটা সামগ্রিক অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা ভাবা হক। তার মানে হল এই যে পৃথিবীর ধন, জন, খনিজ ও জৈব সম্পদ, জ্বালানি, খাদ্য, জল, ভূমি, আকাশ, এই সব কিছু নিয়ে একটা সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করা হক। কিন্তু কেউ নিজের একটুও এর জন্য ছাড়তে রাজি নয়। আমেরিকা নিজের স্বার্থ একটুও না ছেড়ে, পৃথিবীর যেখানে যত কয়লা, তেল, ধাতুজাত পদার্থ আছে, সব কিছুর উপর তাদের হাতটি রাখতে চায়। আর দরিদ্র দেশগুলিও, তাদের দেশের দারিদ্র সীমার নিচে যে লোকগুলি, তাদের কথা না ভেবে, যারা এই সীমার উপরে, তাদেরই আমেরিকানাইজ করার চেষ্টাতেই মগ্ন।

কিন্তু এই হরেক রকমের হয়ে ওঠা, যার মূল উদ্দেশ্যটা হল বিভিন্ন উপায়ে, বিবিধ রকমের আরাম খোঁজা, তাতেই একটি জিনিস আমাদের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে, সে জিনিসটি সুন্দর। এ যেন সেই রবীন্দ্রনাথের কথায়,

"সুন্দর এসে ফিরে যায়, ফিরে যায়
তবে কার লাগি মিথ্যা এ সজ্জা।"

সত্যি, আমাদের স্বচ্ছলতার যে গড়ন, তা পুরোপুরি ব্যর্থ, তার মধ্যে যদি সেই সুন্দরের ছোঁয়া না থাকে। কিন্তু সুন্দরের মধ্যে থাকে, সাবজনীন না হলেও, অনেকজনীনতার ছোঁয়া। তাই আত্মপরায়ন দৃষ্টিভংগী নিয়ে সৌন্দর্যের সাধনা হয় না। স্বার্থপরতার সঙ্গে সৌন্দর্যের একটা গভীর গরমিল রয়েছে। তাই এসথেটিকস আর এথিকস, পরস্পরের কাছ থেকে দূর নয়। খাবার রুচিটা মানুষের নিজের, কিন্তু পোষাক খোঁজে অন্যের রুচির, অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধের সমর্থন। সৌন্দর্য তাই একটা বোধ ও বিশ্বাস।

তাই আমরা গাঁ বা সহরের সার্বিক উন্নতির কথা যখন বলি, তখন বলি গাঁ খানার যেন ছিরি (শ্রী) ফিরে গেছে। এক ইকোসিস্টেমের সম্পদ, পাশের বা অন্য কোন ইকোসিস্টেমের সুবিধার্থে ব্যবহার করেই আমরা সেখানের উন্নতি, অর্থাৎ শ্রীসাধন করি। এ শ্রীসাধনের কাজটাও হল সামাজিক কাজ। এতে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যোগ দিতে হয়। যেমন গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরি, ময়লা পরিষ্কার করা, ঘরবাড়ী গুলোকে একটু রং চং করে সাজানো, খানাখন্দ-

গুলোকে বুঝিয়ে, পুকুরগুলোকে পরিস্কার ও স্বাস্থ্যপ্রদ করে তোলা, ইত্যাদি সামাজিক কাজ। অনুরূপ সামাজিকতার মাধ্যমেই আমরা ছন্দোবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হতে পারি। এই একটু আগে যে বললাম, আমেরিকা অনেক সময় স্বার্থপরের মত ব্যবহার করছে অন্যদেশের সঙ্গে, তার ফলে এই শ্রীই ব্যাহত হচ্ছে। নেহাৎ এক গাঁয়ের এ পাড়া ওপাড়া নয় বলে, আমেরিকা বা অনুরূপ আত্মসর্বস্ব দেশ, পৃথিবীর সামগ্রিক শ্রীকে যে ব্যাহত করছে, তা উন্নত দেশগুলি দেখেও দেখছে না। কিন্তু আজ যখন আমরা বুঝতে শিখেছি যে ছোট এই পৃথিবী নামক মহাকাশযানটির সার্বিক শ্রীতেই আমাদের অস্তিত্ব, তখন তার প্রতি উদাসীন থাকা আর চলে কি?

সৌন্দর্য মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, যার জন্য হয়ত মানুষ কুৎসিৎ আচরণে লজ্জা অনুভব করে। সুন্দরের আর একটি গুণ হল, যে তা সব সময়, সীমা ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মানুষের মনে সেই তথাকথিত মহাসাগরীয় অনুভূতি, তা এই সৌন্দর্যবোধেরই কারণে। সেক্সপীয়ার কি রবীন্দ্রনাথ বা আইনষ্টাইন, মানবজাতীর জন্য যে মানসিক সম্পদ সৃষ্টি করেছেন, তা এই মহাসাগরীয় অনুভূতি বা ওসেনিক ফিলিং জাত।

আর ভালবাসা? সুন্দরের বোধ আর ভালবাসা যে মনের একই ঘরের বাসিন্দা, এ আমাদের জানা। শুধু ভালবাসা নয়, সুন্দর দিতে পারে আনন্দ। এই আনন্দের কথা অনেক বড় করে দেখেছেন আমাদের ঋষিরা সে ঐতিহ্য কি আমরা ভুলে যাব? আনুপূর্বিক এই গ্রন্থটির একটি জিজ্ঞাসা: মানব সভ্যতার ধ্বংস কি আসন্ন? সভ্যতা কথাটাই যদি প্রথমে ধরি, সভ্যতা হল তাই, যা অজস্র মানুষকে একসঙ্গে ধরে রেখেছে সুন্দর ভাবে। এখানে এই সুন্দর কথাটা একটু একপেশে হয়ে রয়েছে বলে, কেউ সভ্যতায় সুন্দরের ভূমিকাটাকে ছোট বা একপেশে বলে না মনে করেন। সভ্যতায় সুন্দরের ভূমিকাটি একক ও অনবদ্য। অথবা বলা যায়, মালায় গেঁথে সুন্দর করে তোলাই যে সভ্যতা। তাই এই প্রশ্নটির সার্বিক আলোচনার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দরের কথাটা ওঠে। আর এ কথাও ঠিক, যদি সুন্দরকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তা হলে সভ্যতাও বেঁচে থাকবে। তাই যেন আমরা মনে রাখি সৌন্দর্যকে বাঁচানই সভ্যতাকে বাঁচান।

এতক্ষণ আমরা বেশ একটা এ্যাবষ্ট্র্যাক্ট বা বিমূর্ত্ততার সমতলে কথা বল-

ছিলাম। এবার আমরা একটু কাঠ, খড়, কেরোসিনের সমতলে কথা বলব। এই সমতলে কথা বলতে গেলে, আলোচনা উঠবে শক্তি, বস্তুসম্পদ, খাদ্য, আবহাওয়া ইত্যাদি। এই আলোচনাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে, মাল মশলা নিতে হবে। যতদূর সম্ভব ঋণ স্বীকারটা সঙ্গে সঙ্গে করবার চেষ্টা করব। তবুও অনবধানে সামান্য সামান্য ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা আগেই করে রাখছি।

১৯৭৫ সালে সারা পৃথিবী জুড়ে যতটা, ও বিবিধ ধরণের যে শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে, তার হিসাবে দেখা যায় যে আনবিক শক্তি ব্যবহার সুরু হবার দুই দশক পরেও, ১৯৭৫ সালে আনবিক শক্তি সারা বিশ্বে, সমগ্র শক্তি ব্যবহারের মাত্র ১·৩% শতাংশ ব্যবহৃত। সেই জায়গায় পেট্রল-জাতীয় তরল ফসিল জ্বালানির ব্যবহার হয়েছে সব চেয়ে বেশী অর্থাৎ শতকরা ৪৪·০% ভাগ। এর পরই আসে কয়লা জাতীয় কঠিন ফসিল জ্বালানি, যার ব্যবহার ৩০·৬% শতাংশ। প্রকৃতিজাত গ্যাসের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার ১৮·৫% শতাংশ। আর জলশক্তি ও ভূ পৃষ্ঠের অভ্যন্তরীণ তাপ ইত্যাদির ব্যবহার ৪·৭% শতাংশ।

একজন বিজ্ঞান কম জানেন, এমন মানুষও যদি উপরের এই তালিকার দিকে দৃষ্টি দেন, তাঁর মনে হবে যে, উপরের ওই তালিকাটার একটু হেরফের হওয়া উচিত ছিল। পেট্রলিয়াম জাত যে জ্বালানি, তার তো একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবেই, অথচ তার ব্যবহার হয়েছে সর্বাধিক। আর আনবিক শক্তি, সব চেয়ে কম। অবশ্য আনবিক শক্তি ব্যবহারে, রেডিও এ্যাকটিভিটি একটি বড় সমস্যা। কিন্তু তবু তথাকথিত নিরাপদ আনবিক বস্তু ও তা ব্যবহারের উপযুক্ত গবেষণা আমাদের করা আজও হয়ে ওঠে নি। জলশক্তি, ভূতাপ ও সৌর-শক্তি সম্পর্কেও বলা যায় যে এগুলি সম্পর্কেও কতটুকু গবেষণা হয়েছে? আর কতটুকুই বা সেগুলিকে আমরা কাজে লাগিয়েছি? কাজে যে লাগানো হয়নি, তার কারণটাও বেশীদূর খুঁজতে হয় না। টিউব লাগিয়ে পাম্প চালালেই হলো। পেট্রল তোলা তা এত সহজ বলেই, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি টাকা এই দিকে গিয়ে পড়ল আর সেই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিটাও।

আর একটা হিসাবের দিকে আমাদের একটু নজর দেওয়া দরকার, সেটা হল, ১৯০০ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই পঁচাত্তর বছরে, পেট্রল, তৈল ও কয়লার কথাটা ধরি: ১৯০০ সালে কয়লার ব্যবহার যদি আট ইউনিট থাকে, ১৯৩০ সালে তা হয়ে উঠল আঠারো ইউনিট, আর ১৯৭৫ সালে হল পঁচিশ

ইউনিট। সেই জায়গায় অন্য তেল ১৯০০ সালে দশ ইউনিট, ১৯৩০ সালে কুড়ি ইউনিট, আর ১৯৭৫ সালে পঞ্চাশ ইউনিট। পেট্রল ইত্যাদি ১৯০০ সালে দশ ইউনিট, ১৯৩০ সালে পঁচিশ ইউনিট আর ১৯৭৫ সালে একশো দশ ইউনিট।

শক্তির ব্যবহার যে ক্রমশঃ বাড়ছে তার আর একটা কারণ হল, মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, স্বচ্ছল হচ্ছে, ততই তাদের মাথাপিছু শক্তির চাহিদা বাড়ছে। এর একটা হিসাব ধরা যাক। এইভাবে যদি চাহিদার হার বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, তা হলে দেখা যাবে দেশ হিসাবে এই হার ক্রমশঃ বেড়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। সব চেয়ে নিচে ইথিওপিয়া। তারপর যথাক্রমে, নাইজেরিয়া, পাকিস্থান, সুদান, ভারত, মিশর, ইরান, মেক্সিকো, স্পেন, ইসরায়েল, ইতালি, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, কানাডা, আমেরিকা। আবার দেখা যায় এই যথাক্রমিক হারেই এই সব দেশের জাতীয় উৎপাদনের হারও বাড়তে থাকে। এক কথায় মনে হবে, স্বচ্ছল দেশে শক্তি ব্যবহারের মাথাপিছু হারও বেশী। অবশ্য এ হিসাবটা গড়পড়তা।

একটু আগে কয়লা, তেল, গ্যাস ইত্যাদি জ্বালানির কথা কিছু কিছু আলোচনা করলাম। এখন আর একটা হিসাবের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়া যাক। এটা আমেরিকা, পশ্চিম ইউরোপ ও জাপানের হিসাব। কি ধরনের শিল্পে কি ধরনের শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে এটা তারই হিসাব। এই হিসাব অনুযায়ী, (বিশেষ ইউনিটে এই হিসাব) শিল্পে আমেরিকা কয়লা খরচা করে ৯১·৩ ইউনিট। ইউরোপ করে ৬২·৫ ইউনিট। আর জাপান করে ৩৯·৭ ইউনিট। সেই জায়গায় ঘরোয়া সাংসারিক খরচ কয়লার, আমেরিকাতে ৯·৭, ইউরোপে ৪১·০ ও জাপানে ·৯ ইউনিট মাত্র। শুধু এই হিসাব থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার। তিনটিই প্রায় সমান স্তরের শিল্পোন্নত এলাকা। কিন্তু কয়লার মত একটা সুবিধাজনক জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই কমবেশী থেকে বোঝা যায়, যে শিল্প গড়ে তুলতে হলে, শুধু যে তার একটা রাস্তাই, তা নয়।

আর কয়েকটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। শক্তি ব্যবহার বা উৎপাদন করতে গিয়ে যে ক্ষতি হয়, তা তিনটি এলাকাতেই প্রায় সমান, অর্থাৎ ৬·৬৫ ইউনিট থেকে ৭·৬৫ পর্যন্ত। অর্থাৎ এই তিন এলাকার শিল্পযোগ্যতা সমান। কিন্তু আবার ঘরোয়া কাজে শক্তির ব্যবহার আমেরিকায় ২৮·০৫, ইউরোপে ৩১.৮৪ আর জাপানে মাত্র ১৬·৮৫ ইউনিট। বলা বাহুল্য ঘরে শক্তির

ব্যবহারটা প্রধানতঃ হয় ব্যক্তিগত ভোগে। দেখা যাচ্ছে ভোগবাদকে অর্দ্ধেক কমিয়েও একটি দেশ অতি সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। তাও তো এই সব দেশগুলি ধনতান্ত্রিক দেশ।

যাতায়াত, শিল্প, গৃহ, খাদ্য ও লোকসান, এই পাঁচটি খাতে সারা বিশ্ব জুড়ে যে শক্তি ব্যবহার হয়, তার দিকে এক লহমা দৃষ্টিপাত করা যাক। এ হিসাবটি ১৯৬৪ সালের। চীনকে এ হিসাবে ধরা হয় নি।

চলাচল	১৯.০%
শিল্প	২৬.৫%
গৃহ	১৯.৭%
খাদ্য	৫.৩%
লোকসান	২৯.৬%

কারুকে কিছু বলতে হয় না, উপরের ওই শতকরা হারের তালিকার দিকে তাকালেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে লোকসান খাতে। লোকসানের খাতে দেখা যায়, শক্তি, যা আমরা ব্যবহার করতে চাই, পারি করতে তার তিনভাগের একভাগ-মাত্র। যখন উত্তাপকে শক্তিতে লাগাচ্ছি, কিম্বা কয়লা বা পেট্রলের মত ফসিল ফুয়েলকে শক্তিতে রূপান্তর করছি, তখন আমরা জানি পুরোটা তার, আমরা ব্যবহার করতে পারি না। পদার্থবিদ্যার যে যুগে এক ধরনের শক্তিকে অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব, আর বস্তুকেও শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব, এটা জানা গেল, তখন থেকেই বৈজ্ঞানিকদের কাছে এটা একটা সমস্যা যে গুড়ের অনেকটাই যেন পিঁপড়েই খেয়ে যায়। এটা কমাবার জন্য চেষ্টা চলছে দীর্ঘদিন ধরে, কিন্তু ফল এখনো পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, তা সামান্যই।

তারপরই তালিকার আর একটি জায়গায় নজর পড়ে। এটা হল চলাচল খাতে। অবশ্য "চরৈবেতি" কথাটি ভারতের মর্মবাণী। আর সেই কথাটি জীবনের মর্মবাণী করেছে ইউরোপ। কিন্তু যে যতবড় ভক্তই হক চরৈবেতির, আমাদের যতটা শক্তি আছে তার শতকরা উনিশ ভাগ চলে যাবে চলাচলে, এটা সহ্য করা শক্ত। আর সে চলাচলও জনগণের আত্মিক বা মানসিক উন্নতির জন্য নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়ার জন্য নয়, তার বেশীর ভাগটাই কাজে যেতে, আর আসতে। সেই যাকে আমরা বলি অফিসে যাওয়া ও অফিস থেকে বাড়ী

ফেরা এই করতেই হয়ত প্রতিদিন আমেরিকায় একজনকে পঞ্চাশ মাইল যেতে ও পঞ্চাশ মাইল আসতে হয়। কি আমাদের দেশেও একজন আশি মাইল দূর বর্দ্ধমান থেকে রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারী করছে। আর এই ডেলিপ্যাসেঞ্জারী চিরস্থায়ী করবার জন্যই আমাদের দাবী হল, আরো দ্রুতগামী ট্রেন চাই, আরো বাস। কিন্তু দাবীটা যেখানে প্রতিষ্ঠিত করার কথা, যে কথাকথিত অফিস কেন শুধু কলকাতা বা বড় সহরমুখী হবে? এর ফলে শুধু মুষ্টিমেয় দু একটি সহরে জমা হয়েছে সব সম্পদ। আর তামাম দেশের লোক শুধু ছুটে আসছে এই সহরে। আজ সময় এসেছে এই ধরনের সহরমুখীনতা দূর করার।

মাথাভারী দু' একটি সহর যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনি সেই সব সহরের ক্ষিধেও তো আছে। ক্ষুধা মেটাবার জন্য সহর প্রতিদিন হাজার হাজার টন খাদ্য নিয়ে আসতে হয়। এর জন্যও আমাদের শক্তির অনেকখানি ব্যয় করতে হয় যানবাহনে। তাতেই সমগ্র শক্তির এক পঞ্চমাংশ খরচা করতে হচ্ছে যাতায়াতে। এ জন্য ভবিষ্যতের মানব উপনিবেশগুলি মাথাভারী সহরের আকার নেবে না; তার বদলে সেই উপনিবেশের কাছাকাছি জায়গায় থাকবে তার খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বানিজ্য শিল্প, সাহিত্য, ব্যাঙ্ক, বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছুই থাকবে এই সব উপনিবেশগুলিতে। কতকটা এই ধরনের উপনিবেশের কথা ভাবা হয়েছে বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক সাহায্য পুষ্ট কম্প্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রামে। কিন্তু একদিকে এই প্রোগ্রামও রইল, আবার অন্যদিকে কলকাতাকে পুষ্ট করার জন্য টাকা ঢেলে যেতে লাগলাম। দেশের মানুষের শরীর ও মনের পূর্ণতম চাহিদাটা দেবার উপযুক্ততা যদি ডেভালপমেণ্ট প্রোগ্রামই না দিতে পারে, তবে আর কি হল?

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে যদি সমস্ত দেহকে বঞ্চিত করে কেবল মুখে রক্ত সঞ্চার করা যায়, তাকে যেমন স্বাস্থ্য বলা যায় না, তেমনি সমগ্র দেশকে শোষণ করে সহরের পুষ্টি দেশের স্বাস্থ্য নয়।

তারপর যদি আমরা আমাদের তালিকায়, খাদ্য খাতে কতটা শক্তি আমরা ব্যয় করছি, তার দিকে তাকাই, তা হলে আমাদের এমন মনে হবে না যে, এই খাতে খুব একটা শক্তি খরচা হচ্ছে, যখন এর পরিমাণ মাত্র ৫·৩%। কিন্তু তবু একটা কথা আছে। খাদ্যই তো শক্তি। প্রাণীর শারীরিক শক্তির ভাণ্ডার

তো খাদ্য। তা হলে কি বলব, এটা শক্তি উৎপাদন করতেই শক্তির ব্যবহার? কতকটা তাই বটে। একটু ভাল করে বললেই বোঝা যাবে।

যেমন ধরা যাক কৃষিতে ক্রমাগত উন্নতির কথা, যা আজ উন্নত দেশগুলিতে আনা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে, অধিকতর শক্তিনির্ভর বস্তু ও সেবা, মাটিকে দেয়া হচ্ছে বলেই। তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের মূলেও কিন্তু ওই একই কথা। যেমন বেশী ফলাতে হলে বেশী সার চাই। সার, যদি জৈব সার হয়, তবে তার উৎপাদনের শক্তিটুকু সূর্যের দেয়া। আর তা না হলে ফ্যাক্টরিতে শক্তি ব্যয় করে, তবেই তা উৎপন্ন করতে হবে। তেমনি সেচের জল, পাম্প, ইত্যাদি সবই শক্তিনির্ভর। আমরা এখানে একটু আগের আলোচনায় দেখেছি যে শক্তির সমীকরণে দুটো দিক একেবারে সমান হয় না। তার কারণ প্রায় তিরিশভাগ লোকসানে যাচ্ছে। সেই লাভ লোকসানটা যদি খাদ্যের ক্ষেত্রে হিসাব করা যায়, তা হলে কি দাঁড়াবে? সবুজ বিপ্লবে যে শক্তি, উৎপাদনে খরচা করা হচ্ছে, তার কতটা লোকসানে যাচ্ছে? এ হিসাবটা নির্ভুলভাবে করা শক্ত। তবু এই সবুজ বিপ্লব যা দিয়েছে, তার মূল্যে শক্তির সমীকরণে যদি বা কিছু লোকসান থাকে, তা যেন পুষিয়ে গেছে। তবে এখানেও একটা কথা আছে। সবুজ বিপ্লব, আরো বেশী করে দিন দিন সবুজ থেকে সবুজতর হতে থাকবে, এ আশা দুরাশা। আর সেই ভরষায় প্রজাবৃদ্ধি করে যাওয়া চলবে না।

সার উৎপাদনের সঠিক ইকোনমিকস বা অর্থনীতিটা কি হবে, এটা অনেকদিন ধরেই ভাবা হচ্ছে। প্রথমে মনে করা হত, খুব বড বড় ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি তৈরি করে, যদি সারের ব্যাপারটা আরো বেশী করে সেণ্ট্রালাজ বা কেন্দ্রীভূত করা হয়, তা হলেই বুঝি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এখানে বোধ হয় বৃহদাকার যানবাহন ও ক্ষুদ্রাকার যানবাহনের ইকোনমিকসটা ভেবেই সার কারখানার কথা ভাবা হয়েছিল; আমরা সব সময়েই উপমানের সাহায্যে ভাবতে অভ্যস্ত কি না। কথাটা যখন উঠল তখন বৃহদাকার যানবাহনের ইকোনমিকসে আসি।

একটি বড় জাহাজ যে খরচায় ৮৮০ টন মাল বইতে পারবে, একটি ট্রেন সেই খরচায় পারবে ২২০ টন। কাজেই মনে হতে পারে, তা হলে বোধ হয়, ফার্টিলাইজারের বড় ফ্যাক্টারি, মাঝারি বা ছোট ফ্যাক্টরির চেয়ে ভাল। কিন্তু

অভিজ্ঞতায়, বিশেষতঃ ভারতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে মাঝারি ফ্যাক্টরিই ভাল। আর সেগুলি ছড়ান থাকবে সারা দেশ জুড়ে। প্রত্যেক কম্প্রিহেন-সিভ এরিয়া ডেভালাপমেণ্ট প্রজেক্টের সঙ্গে যেমন থাকবে কলেজ, ব্যাঙ্ক, চাষের যন্ত্রপাতির ফ্যাক্টরি, তেমনি থাকবে সারের ফ্যাক্টারি। এই উন্নয়ন প্রকল্পকে যদি সর্বাঙ্গিক হতে হয়, তা হলে তো সেই প্রকল্পের আওতায় সব কিছুকেই আসতে হবে। ক্লাব অফ রোম এককথায় এই সেণ্ট্রালাইজেসান, ডিসেণ্ট্রালাই-জেসান প্রশ্নটির কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন "The centralisation versus decentralisation issue implies ballancing benefits."

এক কথায়, আমরা যে ভাবে ভাবতে অভ্যস্থ হয়েছি এতকাল, আজ সেই ভাবনাটাই বদলাবার দিন এসেছে। আজকের পাওয়ার ষ্টেশান তৈরিতেও এই বিকল্প ভাবনা কাজে লাগান হয়েছে দুটি বিভিন্ন নামে। এর মধ্যে একটির নাম হল "ব্যাক প্রেসার পাওয়ার ষ্টেশন" ও অন্যটি "কনডেন্সিং পাওয়ার ষ্টেশন।" এর মধ্যে প্রথমটি থেকে যে জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে, তার পঁয়ত্রিশ ভাগ শক্তি উৎপাদন করছে, দশভাগ বয়লারে নষ্ট হচ্ছে, আর বাকি যে উত্তাপ পঞ্চান্ন ভাগ, যে উত্তাপকে ঠাণ্ডা করতে জল দরকায়, সেই গরমজল শীতের দিনে ঘরবাড়ীর ভিতরে গরম করতে ব্যবহার হয়। সুইডেনে ভাস্তেরাস নামে যে সহর, সেই সহরের দেড়লাখের মত অধিবাসীদের ঘরবাড়ী তাতানোর কাজে ও রাস্তার বরফ গলাতে অনেকদিন ধরে এই গরমজল ব্যবহার হয়ে আসছে।

সেই জায়গায় কণ্ডেসিং সিষ্টেমে শক্তি একটু বেশী, অর্থাৎ চল্লিশ ভাগ পাই। কিন্তু ঠাণ্ডা করতে যে পঞ্চাশ ভাগ শক্তি যাচ্ছে, তা আর কোন কাজেই লাগছে না। আনবিক শক্তির ক্ষেত্রে, উত্তাপ ঠাণ্ডা করতে অনেক সময় এত জল লাগে, যে হয়ত একটা পুরো নদীই তার জন্য ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু এতখানি শক্তি আমরা এখনো ভালভাবে ব্যবহার করতে পারছি কই ?

আমরা যখন স্থির শান্ত ভাবে শুয়ে আছি, তখন আমাদের বিপাক ক্রিয়া, চলছে ঠিক ঠাক, কিন্তু শক্তির ব্যয় নিম্নতম। "জিরো এনার্জি গ্রোথ" নামে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন আমেরিকার ফোর্ড ফাউণ্ডেশান ১৯৭৪ সালে। আলোচকরা বলেছিলেন যে এই শতকের শেষ ভাগ নাগাদ আমেরিকায় এই প্রোগ্রাম চালু করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানের দিক থেকেও হিসাব করে দেখা গেল যে এটা সম্ভব। অবশ্য বলা বাহুল্য জিরো এনার্জি

গ্রোথের জীবন দর্শন ও অর্থনীতি, বর্ত্তমানের জীবনদর্শন ও অর্থনীতি থেকে একটু আলাদা হবে। কিন্তু সে নতুন অর্থনীতিও একেবারে নিশ্চল হয়ে যাবে না। আমাদের বর্ত্তমান অর্থনীতি অল্পমূল্যে কেনা কিছু শক্তির অকারণ ব্যবহার করাতেই সীমাবদ্ধ। যে সমাজ জানে তার সম্পদগুলির উপর সত্যিকারের প্রভুত্ব সহকারে কি করে সদ্ব্যবহার করতে হয়, সে সমাজের অর্থনীতি তো একটু ভিন্নরকমের হবেই।

শক্তি ব্যবহারকে প্রায় শূণ্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবার সময়কার যে সামাজিক বিবর্ত্তন, তার গবেষণায় হাত লাগাবার সময় এসেছে আজ। এ গবেষণায় একযোগে হাত লাগাতে হবে বস্তুবিজ্ঞানীদের সঙ্গে, জীববিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, অর্থশাস্ত্রবিজ্ঞানী, শিল্পও কলাবিজ্ঞানী সবাইকেই। ক্লাব অফ রোমের যে কর্মীদল, তাদের মধ্যে এমনি বিবিধ বিদ্যাবিদের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে ফসিল জ্বালানি আছে, তা তোলার খরচার তারতম্য অনেক। পেট্রল জাতীয় জ্বালানির কথা ধরি। ব্যারেল হিসাবে ক্রুড তেলের দর ডলারে ধরলে যা দাঁড়ায় তার তালিকা:

জায়গা	দর
পারস্য উপসাগর	১·৬৫
নাইজিরিয়া	২·২৫
ভিনিজুয়েলা	১·৯৫
উত্তর সাগর	৪·১৫
অন্য সাগরে	৫·৩২
আমেরিকায়	৪·৩৫
পিচ বালিতে	১২·০০
বিবিধ	১৫·০০

এর মধ্যে পারস্য সাগরে একশো ফিট জল ও উত্তর সাগরে ৫০০ ফিট জলের তলায় পৌঁছতে হয়। এতে দামটা বাড়ে ও আরো বাড়ছে। অন্য সাগরেও খুব কম হলে ১০০ ফিট জলের তলায় নামতেই হবে। তাই বম্বে-হাইতে দামটা খুব একটা সস্তা পড়বে না।

এবার একবার পৃথিবীর ম্যাপের দিকে তাকান যাক। এ দিকে তাকালে

দেখা যায় যে, নতুন যে প্রস্পেটিং করা হয়েছে, তাতে উত্তর ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, (যার অনেকখানিই রাশিয়ায়) জুড়ে রয়েছে তেল। তেমনি আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব উপকূলে, আমেরিকা ভূখণ্ডের মধ্যাঞ্চলে, দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে, অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম—মধ্যাঞ্চলে, ভারতের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে, নিউগিনি দ্বীপাঞ্চলে, এখনও নতুন করে তেলের সন্ধান মিলতে পারে। এ তো গেল ডাঙ্গায়। এ ছাড়া উত্তর সাগর অঞ্চলে, আলাস্কা ও উত্তর আমেরিকার সাগর অঞ্চলে, দক্ষিণ আমেরিকার সাগরাঞ্চলে, ভারতের উপকূল অঞ্চলে নতুন তেল পাওয়া যাবে মনে হয়। তা ছাড়া চীনে ও পামির মরু অঞ্চলে তেল পাবার যে নতুন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে আমাদের যে চিরাচরিত ধারণা পেট্রল কি ভাবে মাটির তলায় জন্মেছে, তাও যেন বদলে যেতে বসেছে।

তবে আবার যদি বা কিছু কিছু অঞ্চলে, নতুন করে পেট্রল পাওয়া যায়, তবু মানবজাতী আবার দ্বিতীয় পেট্রল যুগ এলো মনে করে, নাসিকায় কিছু তেল ঢেলে আবার ঘুমতে না থাকে। কারণ একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এই নতুন তোলা পেট্রলের দাম অনেক জায়গায় বেশী পড়ে যাবে। তা ছাড়া আরো একটা জিনিস মনে রেখেই যেন আমরা নতুন কাজে হাত দি। অতীতে পেট্রল শুধু যে ক্রেতারাই নষ্ট করেছে, তা নয়। অনেকক্ষেত্রে তেল তোলবার সময়, শতকরা ষাটভাগই হয়ত তোলা যায় নি। এর কারণ হল, হয়ত তুলতে তুলতে দেখা গেল, যে খরচা বেড়ে যাচ্ছে ও তার জন্য লাভের অঙ্কে টান পড়ছে। এ ধরনের সমস্যা যদি আজ দেখা দেয়, তা হলে সেখানে কি করতে হবে, তা আজ আমরা কিছু কিছু জেনেছি। কিন্তু তখন এ সব জানা ছিল না। তা ছাড়া সেদিন পেট্রল তোলা ছিল শুধু মুনাফার ব্যাপার। আজ তা মানুষের চরম প্রয়োজন।

পেট্রলের আকাল যখন থেকে সুরু হয়েছে, তখন থেকেই একটা কথা, আশার কথা শোনা যাচ্ছে। সেটা হল পেট্রলের মতন জালানি কয়লা থেকেই পাওয়া যাবে। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতনও নয়, আবার, এই সবে মাত্র ভাবতে সুরু করা হয়েছে, এমন পর্যায় থেকেও কতকটা এগিয়েছে। এ সম্পর্কে উইস্কাব, কপারস ও লুরগিদের এক একজনের নিজস্ব নিয়ম পদ্ধতি আছে। এর মধ্যে লুরগির নিয়ম পদ্ধতির ব্যবহার বেশী। এই পদ্ধতিগুলিকে বলে

গ্যাসিফিকেশান। লুরগি পদ্ধতিতে গ্যাসিফিকেশান করে তৈরি জ্বালানি, জার্মানিতে প্রায় তিরিশ বছর হল ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে কয়লা থেকে পেট্রলের মত জ্বালানি তৈরি করার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। ক্লাব অফ রোমের বিশেষজ্ঞরা এ রকম পনেরোটি নিয়ম পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছেন। এর মধ্যে সবগুলিরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব আছে। এ থেকে দুটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তারও একটু আলোচনা করি।

প্রথম হল এই: পেট্রলের তুলনায় কয়লা এখনও পরিমানে যতটা আছে, তা অনেক বেশী। তাই পেট্রল—এই বুঝি কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে—এই রকম একটা মনোভাব, কয়লা সম্পর্কে দেখা দেয় নি। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে কয়লারও তো আর অফুরন্ত ষ্টক নেই। তাই কয়লাকে গ্যাসিফাই করার গবেষণা যা চলছে, নানান দিকে, তার জন্য এত পরিশ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তি খরচ না করে, তার খানিকটা বরং অন্য জ্বালানি আবিষ্কারের দিকে প্রয়োগ করলে ভাল হত। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও কথা আছে। রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে দেখলে, কয়লা এমনই একটি মনোগ্রাহী বস্তু, আর তা থেকে এত হাজারো রকমের বস্তু তৈরি করা সম্ভব, যে রাসায়নিকদের ঝোঁকটা ওই দিকে পড়বেই। তাই গবেষণা যে কোন লাইনেই হক, চলতে থাক। নতুন পথের সন্ধান যে কোথা থেকে আসবে কে বলতে পারে?

ইংরাজিতে যাকে Shale বলে, তা একরকমের মসৃন শ্লেট পাথর। এর মসৃণতার কারণ হল এর মধ্যে তৈলজাতীয় বস্তু আছে। বৈজ্ঞানিকরা হিসাব করে দেখেছেন যে আমরা যে পরিমাণে পেট্রল ও তেল, এতদিনে ব্যবহার করেছি, বোধ হয় শুধু মাত্র এই শেল থেকে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ তেল পাওয়া যেতে পারে। এ বস্তুটি থেকে কোন পদ্ধতিতে কতটা তেল আহরণ করা সম্ভব, এর পূর্ণজ্ঞান আজও আমাদের নেই। সেই জন্য এ বিষয়ে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন। কয়েকটি পদ্ধতির সাহায্যে আমেরিকাতে এখন তেল নিষ্কাষণ করা হচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত জানা পদ্ধতিগুলিতে, নিষ্কাষণের কাজে প্রচুর জল লাগে। আবার ব্যাপার হল এই যে, যেখানে এই ধরনের পাথর পাওয়া যায়, সেই সব জায়গা মরুভূমি অঞ্চল। তাই সেখানে জল পাওয়াটাই একটা সমস্যা হয়ে ওঠে। আজ গবেষণার প্রয়োজন, সোজাসুজি কি ভাবে এই পাথর থেকে তেল বার করা যায়।

ক্লাব অফ রোমের অফুরন্ত সুযোগ থাকায়, তারা মানব জাতির সম্ভব সমস্যাগুলি, যা পার্থিব সম্পদ শেষ হলে বা তাতে তলানি পড়লে দেখা দেবে, তার আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তার কিছু কিছু আলোচনা করছি। আমরা মূল ও বড় বড় সমস্যাগুলির দিকেই নজর দেবার চেষ্টা করছি। তাই থেকেই পরিষ্কার হয়ে উঠবে সমস্যার আনুপূর্বিকতা।

আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম, অন্ততঃ সহরে প্রতি ঘরে ঘরে থকত— যাকে বলা হত স্পিরিট স্টোভ। সামান্য একটু মেথিলেটেড স্পিরিট ঢেলে এই ষ্টোভ জ্বালানো যেত। যদিও বলা হত মেথিলেটেড স্পিরিট, এতে থাকত কিন্তু মিথাইল এ্যালকোহলের বদলে ইথাইল এ্যালকোহল। কথাটা বললাম সাধারণ পাঠককে এইটা বোঝাতে যে, ইথাইল এ্যালকোহলের চেয়ে আরো সরল গঠনের এ্যালকোহল, হল মিথাইল এ্যালকোহল। আবার খনিজ গ্যাসকে খুবই সহজে মিথাইল এ্যালকোহল বা মিথানলে পরিণত করা যায়। মিথাইল এ্যালকোহলকে সহজে বিবিধ কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই আজ ক্রমশঃই আরো বেশী করে মিথানল তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছে। জ্বালানি হিসাবে মিথানল অনবদ্য। গাড়ী চালাতেও মিথানলের কথা ভাবা হচ্ছে; একেবারে শুধু মিথানল না হলেও, পেট্রলের সঙ্গে মিশিয়ে। তা ছাড়া প্রোটিন তৈরির ব্যাপারেও মিথানলকে ব্যবহার করে পরিক্ষাগারে প্রোটিন তৈরি করতে পারলে, খাদ্য সমস্যারও সমাধান হতে পারবে। এই সব কিছু চিন্তা করে ক্লাব অফ রোম, মিথানলের ব্যবহার ও গবেষণা আরো জোরদার করবার উপদেশ দিয়েছেন।

ক্লাব অফ রোম, আনবিক শক্তির সম্ভাবনা, তার সুবিধা অসুবিধা, ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আমরা পূর্ব অধ্যায়ে কিছু আলোচনা করেছি। বিভিন্ন ইউরেনিয়ামকে যেখানে U 235 ও U 238, যে দুটি ধরনের ইউরেনিয়ামে পরিণত বা পরিশ্রুত করতে হয়। এটা করতে হয়, কারণ এই দুটি ধরনের ইউরেনিয়ামই তেজস্ক্রিয়। এর জন্য প্রচুর ব্যয়। সে খরচাটা আবার যে শক্তি উৎপাদিত হবে, তার ঘাড়ে চেপে বসছে। ক্লাব অফ রোম বলছে, এ খরচাটা কি পদ্ধতি গ্রহণ করলে কম হবে, সেটাই এখন গবেষণা সাপেক্ষ।

আর একটা অসুবিধার কথাও ভাবতে বলছেন ক্লাব অফ রোম। এটা হল,

বেশীর ভাগ দেশেই আনবিক শক্তি কেন্দ্রে, শক্তির এক দশমাংশ ১০% মাত্র বিদ্যুতে পরিণত করা যাচ্ছে। এর ব্যতিক্রম সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকা, যেখানে এক চতুর্থাংশ, অর্থাৎ ২৫% পর্যন্ত বিদ্যুতে পরিণত করা সম্ভব হবে, ১৯৮৫ সালের মধ্যে। অবশ্য ইউরেনিয়ামও আজ হক, কাল হক, শেষ হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর ইউরেনিয়ামের কথা ধরলে, আর পৃথিবীর সমস্ত দেশে ও মানুষের মধ্যে তা সমানভাবে ভাগ করে নিতে রাজি হলে, তা পেট্রল ও কয়লার চেয়ে অনেক বেশীদিন চলবে। ইউরেনিয়ামের তুলনায় পৃথিবীতে থোরিয়াম আরো অনেক বেশী আছে। তবে থোরিয়ামকে কাজে লাগানর ব্যাপারে কয়েকটি টেকনিক্যাল অসুবিধাও আছে। এই লাইনে ব্রিডার রিঞ্যাকটার, যার কথা এর আগের অধ্যায়েও উল্লেখ করেছি, যেখানে ছুটি প্লুটোনিয়াম অনু তৈরি হয়ে, পরের ধাপে অনুভাঙ্গার কাজে সাহায্য করে। ক্লাব অফ রোম মনে করেন যে ব্রিডার রিঞ্যাকটারেরও এখনও বেশ কিছু সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সব সমস্যার মধ্যে একটি অতি গুরু সমস্যা হল, তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিকে দূর করা হবে কি উপায়ে? কারণ এমন কিছু কিছু তেজস্কর পদার্থ আছে যার তেজস্ক্রিয়তার জীবনার্ধ বা হাফলাইফ হাজার বছরের উপর।

এ ধরনের তেজস্কর বস্তু রাখা হবে কোথায়? মাটির অনেক নিচে খনিগর্ভের ভিতরে ষ্টিলের আধারে এ গুলিকে রাখার প্রস্তাবও কেউ কেউ করেছেন। আবার প্লুটোনিয়াম? তার হাফ লাইফ তো পঁচিশ হাজার (২৫০০০) বছর। দেড় মাইক্রোগ্রাম ($\frac{1}{1000}$) মাত্র মানুষকে মারতে যথেষ্ট। আর ব্রিডার রিঅ্যাকটার এই ধরনের বিষ তো তৈরি করবে টন হিসাবে। এ রকম মারাত্মক বস্তুর দায় ও দায়িত্ব নেবে কারা, এ প্রশ্ন 'ক্লাব অফ রোম' তুলেছেন। এমনি আরো কত যে সমস্যা আছে।

এ তো গেল আনবিক শক্তির একদিক। আনবিক বিভাজন বা ফিশনের দিক। মেণ্ডেলের পিরিয়ডিক টেবলের বিন্যাসে, যে সব ভারী ভারী মৌলিক পদার্থ, যেমন ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, প্লুটোনিয়াম তাদের আনবিক বিভাজন ঘটে। আবার টেবলের প্রথমদিকে যে সব হালকা মৌলিক পদার্থগুলি, যেমন হাইড্রোজেনের বিভাজনের পরিবর্তে ঘটে ফিসান বা সংযুক্তি। আগের অধ্যায়ে এ আলোচনা করা হয়েছে কিছু, পাঠকের মনে পড়বে। 'ক্লাব অব রোম' যেমন

ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম, ইত্যাদি বিভাজনমূলক বা ফিশানেবল বস্তু নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, ততটাই মাথা ঘামিয়েছেন হাইড্রোজেনের মত সংযুক্তিসম্ভব বস্তু নিয়েও। এরও কারণ আছে। হাইড্রোজেন পরমাণু যখন সংযুক্তির ফলে হিলিয়ামে পরিণত হয়, তখন সূর্যের ধরনে অমিত শক্তির অধিকারী হয় তখনই আমরা বলতে পারি।

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেৎ যুগপদুত্থিতা
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥"

(গীতা। ১১। ১২)

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমার আনবিক বোমার কথা বলতে গিয়ে গীতার একাদশ অধ্যায় থেকে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করেছিলেন। সেই শক্তির উদ্ভব হয় হাইড্রোজেন ফিউশানে। 'ক্লাব অফ রোম'এ সম্ভাবনাটি খুবই খুঁটিয়ে দেখেছেন।

অন্য ধরনের সমস্যা হাইড্রোজেন ফিউশানে থাকলেও, তেজস্ক্রিয়তার সমস্যাটা অত বড় নয়। তাই 'ক্লাব অফ রোমে'র বিশেষজ্ঞরা সুপারিশ করলেন, যে হাইড্রোজেন ফিউশানের গবেষণায় আরো বেশী মনোযোগ দেয়া হক। তবু এ কথাও আবার ঠিক, হাইড্রোজেন ফিউশানের ফলে উদ্ভূত শক্তিকে কাজে লাগাতে আরো বহুদিন লেগে যাবে। বিশেষজ্ঞ দল সমস্ত টেকনিক্যাল দিকগুলি নিয়েও চিন্তা করলেন।

বর্ত্তমানে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করে ফিউশান ঘটান হয়। এর মধ্যে একটিতে ক্ষমতাশালী চুম্বকক্ষেত্র, অপরটিতে লেসার বা ইলেকট্রন ব্যবহার করা হয়। বলা যেতে পারে লেসারের সাহায্যে, অল্পতম কালের জন্য ক্ষুদ্রতম বিস্ফোরণের সাহায্যে নেয়া হয়। এ গুলো যত সহজে বলা হল, ঠিক ততটাই দুরূহ। এ জন্য এ সমস্যার ২০০০ অব্দের আগে, অর্থাৎ আরো কুড়ি পঁচিশ বছরের আগে সমাধান হবে বলে মনে হয় না। যে উত্তাপ এ কাজে লাগে, তা দশকোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সোভিয়েট ইউনিয়নের পরীক্ষায় চুম্বকক্ষেত্র ব্যবহার করে এই উত্তাপ ও আয়নায়নের (ionisation) কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়েছে। ওদের এই পদ্ধতিটির নাম টোকোম্যাক। যদিও এখনো হতে অনেক দেরী, তবু হিসাব করে দেখা গেছে রাশিয়ায় এই পদ্ধতিতে পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করলে তার ক্ষমতা দু হাজার থেকে পাঁচ হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারে।

লেসার পদ্ধতিটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আমরা জানি, লেসার নিম্নতম সময়ের মধ্যে (১০-৯ মিঃ সেকেণ্ড) অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের দশকোটি ভাগের এক ভাগের মধ্যে, এক অসাধারণ উত্তাপ তৈরি করতে। এ উত্তাপও কয়েক হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। এই উত্তাপ আবার প্রয়োগ করতে হবে, এক সেকেণ্ডে অন্ততঃ দশবার, অর্থাৎ সারাদিনে দশলক্ষ বার। এটা করার চেষ্টায়, ভারী হাইড্রোজেনের বরফের একটি কণিকাকে, বায়ুশূন্য একটি চেম্বারে ফেলবার সময় লেসার দিয়ে আঘাত করা হয়। এতেই কিন্তু ফিউশান সুরু হয়ে যায় না। হঠাৎ হাইড্রোজেনের জমাট কণিকার উপর লেসারের আঘাতের উত্তাপে, বাষ্পীভূত হাইড্রোজেন, ঐই কণিকাটির অবশিষ্ট অংশে, এমন চাপ সৃষ্টি করে, যাতে কণিকাটির ঘনত্ব দশ হাজার গুণ বেড়ে যায়। এই চাপ ফিউশান সৃষ্টির কতকটা অনুকূল।

যে হাইড্রোজেন ফিউশান শক্তির উপর আমাদের এত ভরসা ছিল, যে ভরসার সৃষ্টি ১৯৫০ সালে, ১৯৫০তে এসেও তা পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। ১৯৫০ সালের 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে'র সভাপতি ডাঃ অজিত সাহা, তাঁর সভাপতির ভাষণে, হাইড্রোজেন ফিউসান ও তার সমস্যার কথা বর্ণনা করে বলছেন, "Like nuclear fission, nuclear fusion may give rise to unexpected surprises and problems and it would not be wise to be too optimistic. In any case, the perfection of this technology will not take place before the twentyfirst century is well under way. Fusion energy may not contribute to mitigate our immidiate energy crisis."

সৌরশক্তি সম্পর্কে 'ক্লাব অব রোম' অনেকখানিই আশা পোষণ করেছেন। আমরা পূর্ববর্ত্তি অধ্যায়ে, সৌরশক্তির সম্পর্কে অনেক কথাই আলোচনা করেছি। তবু 'ক্লাব অফ রোমে'র আলোচনার মাধ্যমে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য যে সব কথা বার হয়ে এসেছে, তার কিছু আলোচনা দরকার। সৌর শক্তির বিতরণে পৃথিবীতে জায়গা হিসাবে পার্থক্য আছে। মেরু অঞ্চলে তা যদি ১৪০০ ইউনিট হয়, বিষুব রেখার কাছাকাছি অঞ্চলে তা ২৮০০ ইউনিট, অর্থাৎ প্রায় ডবল। বর্ত্তমানে তথাকথিত সেমিকণ্ডাক্টার নিয়ে বহু গবেষণা চলছে। আর তার কারণও আছে। কারণ তথাকথিত সেমিকণ্ডাক্টারের গবেষণায় আজ অনেক কিছু আশা করার মত ঘটার সম্ভাবনা।

যদি দুটি অনুরূপ সেমিকণ্ডাক্টারের দুটি পৃষ্ঠের একটি স্যাণ্ডউইচ বানানো হয়, মাঝে একটি অন্য বস্তু—যাকে ট্রানজিশান লেয়ার বলে—রেখে; আর যদি, সেই সেমিকণ্ডাক্টারের একটি পৃষ্ঠকে সূর্যালোকে রাখা হয়, তা হলে সূর্যালোক থেকে সরিয়ে নিলেও সেটি একটি ব্যাটারির মত কাজ করবে। বিভিন্ন গবেষণার সাহায্যে এই ব্যাটারি যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে। এর ফলে, এই ধরনের ব্যাটারির সাহায্যে আমাদের ঘরে রাতের শক্তির চাহিদা মিটে যেতে পারে। আর দিনে যখন সূর্যালোক রয়েছে, তখন তাকে প্রতিফলকের সাহায্যে কাজে লাগান তো বহুকাল ধরেই হচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়াও নতুন টেকনোলজি আমাদের হাতে আসছে।

ইজরায়েল খুব অগভীর জলের ট্যাংকির জলে লবনের পরিমাণ এমন করে তোলা হয় যাতে সূর্যের উত্তাপ, ট্যাংকির তলাটা খুব গরম করে দেয়। এই উত্তাপকেই তারপর অন্য শক্তিতে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করা হয়। এটা মাত্র একটা উদাহরণ দিলাম। কিন্তু সৌরশক্তিকে কতরকম ভাবে যে ব্যবহার করা সম্ভব, তা গবেষণা সাপেক্ষ। 'ক্লাব অফ রোম' সেই সব গবেষণাই আরো জোরদার করার সুপারিশ করেছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের যে উত্তাপ তাকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এই শক্তির ব্যবহারে অগ্রণী ইতালি। ইতালিতে ১৯২০ সাল থেকেই প্রায় এ শক্তির ব্যবহার হচ্ছে। তখন সেটা মাত্র কয়েক মেগাওয়াট মাত্র ছিল, এখন তা চার পাঁচ শো মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, রাশিয়া—সব দেশেই ১৯৬০ এর পর এ কাজে হাত লাগানো হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র আমেরিকা ও নিউজিল্যাণ্ডই পাঁচশো মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে।

পৃথিবীর যে অভ্যন্তরের উত্তাপ, তাকে নানা ভাবেই কাজে লাগানো সম্ভব। এর বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপায় চালু আছে। তবে সেই পদ্ধতি ও উপায়ই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে আরো গবেষণা প্রয়োজন। 'ক্লাব অফ রোম' এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে হাইড্রো—ফ্রাকচারিং সিষ্টেমটি কার্যকর বলেছেন। এই পদ্ধতিতে পাম্প করে ঠাণ্ডা জল অনেক নিচে নামিয়ে দেয়া হয়। নিচের স্তরে এসে সেই জল, ওই স্তরে ফাটল ধরায়। ফাটল ধরালে, সেই স্তরের উত্তাপ, জলটাকে তিনশো ডিগ্রি বা তার বেশীতে নিয়ে যায়। এই শক্তিই তারপর ইচ্ছামত কাজে লাগানো

হয়। এই পদ্ধতি কি অন্য পদ্ধতিতে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে তাপ উৎপাদনের যে সম্ভাবনা আছে, ক্লাব অফ রোমের হিসাব অনুযায়ী, এর এক শতাংশমাংশও এখনো কাজে লাগাতে পারা যায় নি।

'ক্লাব অফ রোম' দেখেছেন যে, জলবিদ্যুতকে, সারা বিশ্ব তার পূর্ণসম্ভাবনার মাত্র ২% শতাংশ কাজে লাগিয়েছে। এর মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, জাপান ও রাশিয়া ছাড়া এশিয়ায় ও পূর্ব ইউরোপে তা সব চেয়ে কম। এ সব দেশের আজ যা করা উচিত, তা হল জলবিদ্যুতকে আরো বেশী করে কাজে লাগান। শুধু জলবিদ্যুতকে কাজে লাগানই নয়, এই কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়ে এসব দেশগুলি হয়ত একটা ভিন্ন ধরনের অর্থনীতিতে চলে যেতে পারবে। সে অর্থনীতি হয়ত বা মুক্তির।

বর্তমানে আর একজায়গায় বিজ্ঞানী মহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে : এটা হল পুনরাবর্তন মূলক জৈব পদার্থ, যেমন গাছপালা, শৈবাল, ইত্যাদি পদার্থ, যে গু'লকে রাসায়নিক বা জৈব উপায়ে জ্বালানি বা ইন্ধনে পরিণত করা যায়। দাবী করা হচ্ছে, আমেরিকার জমির খুব অল্প পরিমানও যদি ছেড়ে দেয়া হয়, এই সব জিনিস চাষ করার কাজে, তাহলে তাইতে আমেরিকার বিদ্যুত উৎপাদনের কাজটা ওতেই সম্পন্ন হতে পারবে। তবে এ রকম দাবী করার আগে, খাদ্য উৎপাদনের জন্য কতটা জমি প্রয়োজন, তা ভেবে দেখা দরকার। মোটামুটি সব কথা ভেবে, ক্লাব অফ রোম আমাদের দেশে, কি কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে, যে রকম গোবর গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে, তাই সুপারিশ করেছেন। এতে ইন্ধন আর অতি উৎকৃষ্ট জৈব সার একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। এমনকি ক্লাব অফ রোম, বড় বড় সহরেও, এ ধরনের প্রকল্প চালু করার সুপারিশ করেছেন। এ সম্পর্কে উন্নততর গবেষণায়ও সুযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া বাতাস, নদীস্রোত, সমুদ্র তরঙ্গ, সমুদ্রতাপের তারতম্য, সমুদ্রস্রোত সব কিছু থেকেই শক্তি পাওয়া যেতে পারে। আর কিছুই আজ মানবজাতির কাছে ফেলনা নয়। যেখানে যেখানে যতটা মনোযোগের প্রয়োজন, সেদিকে সঠিক অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন ক্লাব অফ রোম। ইউরোপের অনেক দেশে আজ যে বিদ্যুত উৎপাদন হচ্ছে, তার মধ্যে জলবিদ্যুত—২২·৫%, আনবিক—৩·৬%, ভূউত্তাপ—০·২%, তাপবিদ্যুত—৭৩·৭%। প্রায় শতকরা ৭৪ভাগ যে তাপবিদ্যুত

এর তাপটা আসছে কয়লা, পেট্রল কি এই ধরনের ইন্ধন থেকে। এই ইন্ধনগুলির সবগুলিই আজ ক্ষয়িষ্ণু। কাজেই ভাবতে হচ্ছে আজ নতুন ইন্ধনের কথা।

মহাবিশ্বে যত মৌলিক পদার্থ রয়েছে, তার মধ্যে হাইড্রোজেনের পরিমাণ সর্বাধিক। হাইড্রোজেন আবার, আনবিক গঠনে সরলতম। সূর্যের, শুধু আমাদের সূর্য কেন, মহাবিশ্বের অজস্র সূর্যের উত্তাপ হাই:ড্রাজেন ফিউশানজাত। তা ছাড়া—এই তা ছাড়াটা একটা বিরাট তাছাড়া—মহাবিশ্বে বিভিন্ন তারামণ্ডলি, নীহারিকাপুঞ্জ ইত্যাদির মাঝখানে যে বিরাট শূণ্যস্থান বহু আলোকবর্ষ জুড়ে যার বিস্তার, সেখানেও হাইড্রোজেন। এ হাইড্রোজেনের ঘনত্ব এত কম, যে তাকে আলট্রা গ্যাস বলে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন অসাধারণ ঘন অবস্থায়ও আছে তথাকথিত ব্ল্যাক হোল গুলির মধ্যে। যাই হক প্রচুর হাইড্রোজেন যে আছে এটা বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীতে কিন্তু এই হাইড্রোজেন, এখন আর শুধু হাইড্রোজেন অবস্থায় নেই। তা জল ও অন্য বস্তু হিসাবে সংযুক্ত অবস্থায় আছে। এ হাইড্রোজেন পেতে হলে, জলকে বিদ্যুতযোগে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হয়। হাইড্রোজেন নিজেই এক অতি পরিচ্ছন্ন ইন্ধন হতে পারে। তা ছাড়া হাইড্রোজেন থেকে এ্যামোনিয়া, হাইড্রাজিন, মিথানল এ সব তৈরি হতে পারে।

'ক্লাব অফ রোম' বলছেন যে, হাইড্রোজেন ইন্ধন হিসাবে অতি পরিচ্ছন্ন। ঘর গরম বা ঠাণ্ডা রাখা থেকে, বিদ্যুত উৎপাদন, মোটর গাড়ীর জ্বালানি, শিল্পের জ্বালানি থেকে সুরু করে সর্ব কর্মে ব্যবহার করা যেতে পারে। অল্প জায়গায় কি করে হাইড্রোজেনকে রাখা যাবে সেটাই বরং গবেষণার বস্তু।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায়েই আমাদের পড়তে হয়, বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য ব্যাটারির কথা। এতে দুটি মৌলিক পদার্থ ও মাঝখানে একটি তরল বস্তু থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়, এই দুটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে একটি ইলেকট্রনদাতা ও অন্যটি ইলেকট্রন গ্রহীতা। ইলেকট্রন চলাচলের জন্য সার্কিটে তারের মধ্যে দিয়ে চলছে বিদ্যুত। কাজেই মৌলিক পদার্থের মধ্যে খুব বেশী ইলেকট্রন দেবার ক্ষমতা যে পদার্থের, ব্যাটারি তৈরী করতে গিয়ে, তার সঙ্গে যদি খুব বেশী ইলেকট্রন গ্রহণকারী পদার্থের সংযোগ হয়, তা হলে তা থেকে বেশী বিদ্যুত পাওয়া যাবে। আমরা দস্তা, সীসা, কার্বন থেকে বড় জোর কয়েকশো ইউনিট শক্তি পাই। সেই জায়গায় ফ্লুরিন ও লিথিয়াম ব্যবহার

করলে, ছ হাজার ইউনিটের উপর শক্তি পেতে পারতাম। এমনি বিভিন্ন মূল পদার্থ ছুটি থেকে, আমরা বিভিন্ন রকম কমবেশী ইউনিটে বিদ্যুত পেতে পারি। তবে এর টেকনিক্যাল অসুবিধাও আছে, যেমন ফ্লুরিনের মত কোন পদার্থ আবার বায়বীয়; তবে গবেষণার ফলে এ অসুবিধা যে দূর হবে না এমন নয়।

ছোটবেলায় ভূগোলের বইয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে যে সব বস্তুর তালিকা থাকত তার মধ্যে খনিজ বস্তুগুলির তালিকা থাকতই। লোহা, সীসা, তামা ইত্যাদি নামগুলি থেকে ছোট ছেলেদের হয়ত মনে হতে পারে, লালচে রংয়ের তামা, বুঝি হাত কয়েক মাটি খুঁড়লেই উঠে আসবে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। খনিজ পদার্থগুলি, বেশীরভাব এত জটিল রাসায়নিক মিশ্রতা নিয়ে মাটির ভিতর থাকে, যে তাকে পরিচ্ছন্ন মৌলিক ধাতুতে পরিণত করা একটা বুদ্ধির খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এর পিছনে অন্য মূল্যবান সম্পদ, যে পরিমানে খরচ করতে হয়, তাতে মাঝে মাঝে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এত খনিজ বস্তু ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল হয়ে মানুষ কি ভুল করে নি? এ কথা বলছি, তার কারণ হল, এই কাজ করতে গিয়ে জলের ৪৫% ভাগ, জ্বালানির ৪৭% ভাগ আর ইলেকট্রিকের ৩৯% খরচ হচ্ছে। বিশ্বাস না হয় টাটা ইস্পাতের কারখানা বা ওই রকম কারখানার কথা ভাবতে হবে। এ যেন লাভের গুড় পিঁপড়ের খেয়ে যাচ্ছে। তবু কিন্তু এ ছাড়া উপায় আছে কি? আজ আমাদের প্রয়োজন এমন একটা পর্যায়ে, যে এ আমাদের করে যেতেই হবে সেই সুতোয় বাঁধা আমাদের সভ্যতা।

এই সব ব্যাপারে হয়েছে কি, হয়ত কোন খনিজ পদার্থ, আমরা আমাদের নিজস্ব খনিতে তুলছি। কিন্তু আমাদের চাহিদা অনেক বেশী। তাই আবার অন্য দেশ থেকে তা আমদানি করতে হয়। ১৯৭৩ সালের 'বিজনেস উইক' পত্রিকায় একটা হিসেবে দেখা যায়, এলুমিনিয়াম, তামা, লোহা, সীসা, নিকেল, গন্ধক, টিন ও দস্তার হিসাব থেকে দেখা যায় যে সমস্ত দেশগুলির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়াই, এ সব পদার্থের যতটা নিজেদের দেশে উৎপাদন করে ততটাই তারা খরচা করে। অর্থাৎ খুবই উন্নত দেশ হওয়া সত্বেও কোথায় যেন ওদের একটা সামঞ্জস্য আছে। পূর্ববর্ত্তি অধ্যায়ে, প্রকৃতিতে সামঞ্জস্যের কথা অনেক বলেছি। এখানের সামঞ্জস্যটা একটু ভিন্ন। তবু তারও গুরুত্বটা আমরা পরবর্ত্তি কোন অধ্যায়ে দেখব।

যাই খরচ করি, আমাদের প্রথমে দেখতে হবে, কোন জিনিস কতটা আছে, আর তার কোনটাকে পুনরাবর্ত্তনের চক্রে কতটা ফেলতে পারব। এই দিক থেকে আমাদের কয়েকটি সম্পদের দিকে তাকাই :

বস্তু	...	শতকরা
অক্সিজেন	...	৪৬.৬%
সিলিকন	...	২৭.৭%
এ্যালুমিনিয়াম	...	৮.৬৩%
লোহা	...	৫.০০%
ক্যালসিয়াম	...	৩.৬৩%
সোডিয়াম	...	২.৮৩%
পোটেসিয়াম	...	২.৫৯%
ম্যাগনেসিয়াম	...	২.০৯%
টিটেনিয়াম	...	০.৪৪%
ফসফরাস	..	০.১২%
ম্যাঙ্গনিজ	...	০.১০%
অন্যান্য	...	০.৭৭%

উপরে যে তালিকাটি দেয়া হল, তা থেকে বোঝা দুষ্কর হয় না যে, আমাদের যে বস্তুটিই যত থাক, তার পরিমাণ যেহেতু সীমাবদ্ধ, তাই সেই বস্তুগুলির পুনরাবর্ত্তন অত্যাবশ্যক। ধরা যাক অক্সিজেনের কথাই। যদিও প্রচুর পরিমাণে আছে তবু এর পুনরাবর্ত্তন চাই। গাছপালা এ কাজটা করতে পারে। তাই গাছপালা লাগিয়ে যেতে হবে বেশী করে। ঠিক অনুরূপ ভাবে, যে বস্তুর পুনরাবর্ত্তন যতটা করা যায়, আমরা তাও করি না। যেমন ধরা যাক লোহার কথাই। জাহাজ, প্লেন, ও বড় বড় যন্ত্রপাতি তৈরিতে যে লোহা লাগানো হয়েছে, তার শতকরা একশো ভাগই আবার কাজে লাগানো সম্ভব। তেমনি চাষবাসের যন্ত্রপাতি থেকে সুরু করে, খনি যন্ত্রপাতি, বাড়ীর কাজে লাগানো লোহা, ইত্যাদির শতকরা ৯০—৯৫% আবার কাজে লাগানো যায়। আর রেল থেকে সুরু করে ঘরের কাজে ব্যবহার করার জিনিসপত্র ইত্যাদির শতকরা ষাট থেকে তিরিশ ভাগ ৬০—৩০% পর্যন্ত পুনর্ব্যবহারে লাগানো যায়। কিন্তু তা হচ্ছে কি? অথচ এইটি আজ সব চেয়ে বড় কাজ।

নতুন করে কোথায় কোন খনিজ পদার্থ মিলতে পারে ; আর খনিজ বস্তু যে অবস্থায় ভূগর্ভে মেলে, কি ভাবে তাকে পরিচ্ছন্ন করে তাকে মৌলিক ধাতুতে পরিণত করা যায়, তাতে সাহায্য করাই, বর্তমান ভূতত্ত্ববিদের কাজ। কিন্তু ভবিষ্যতের ভূতত্ত্ববিদকে জানতে হবে নিম্নতম খরচে কি ভাবে ব্যবহৃত ধাতুকে আবার পুনর্ব্যবহার করা যায়।

সারা পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ সমস্ত ধাতব পদার্থ যদি আমরা ধরি, তা হলে দেখা যায়, এখনো পর্যন্ত আমরা এক অষ্টমাংশ মাত্র ব্যবহার করতে পেরেছি। বাকী সাত দশমাংশকে এতদিন খরচে পোষাবে না বলে, তাতে হাত দিতে চাইছিলাম না। এখন ক্রমশঃ নতুন প্রক্রিয়া বার হওয়াতে, পড়ে থাকা খনিজ পদার্থগুলির উদ্ধারও ক্রমে লাভজনক হয়ে উঠছে। এটা একটা আশার কথা।

১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদনের হিসাবটা যদি ধরা যায়, তা হলে দেখা যাবে, তা একশো ইউনিট থেকে একশো তিরিশ ইউনিটে উঠেছে। আর সেই জায়গায়, সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা একশো ইউনিট থেকে একশো কুড়ি ইউনিটে উঠেছে। মনে হবে, এখানে তো পুরো দশ ইউনিট লাভ থেকে যাচ্ছে। কিন্তু আবার তথাকথিত উন্নতিশীল দেশগুলিতে লোকসংখ্যা একশো বত্রিশ ইউনিটে উঠে গেছে। অর্থাৎ কিনা সবুজ বিপ্লব উৎপাদনের যেটুকু সুরাহা করলে, তা জন্মহার বৃদ্ধিতে শেষ হয়ে গেল। জন্মহার বৃদ্ধি যেটা দেখাচ্ছে, সঠিক জন্মহার বৃদ্ধি ততটা নয়, যতটা শিশুমৃত্যুর হ্রাস ও বহু রোগের ওষুধ আবিষ্কারের সুফল। কাজেই এই ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণই একমাত্র ভরসা।

খাদ্য উৎপাদন যদি আরো বাড়ানো যেত, তাহলে কি খাদ্য সমস্যার সমাধান হত? যদি ধরে নেয়া যায় জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে খাদ্য উৎপাদন তার চেয়ে অনেক দ্রুততার সঙ্গে ইচ্ছামত বাড়িয়ে ফেলা গেল। তবু কি খাদ্য সমস্যার সামাধান হয়ে যাবে? তাও হবে না। যে চল্লিশটি দরিদ্র দেশের হিসাব ক্লাব অফ রোম করেছেন, তাদের শতকরা ৪০% ভাগ লোক এত দরিদ্র যে এদের হাতে, জাতীয় আয়ের মাত্র ১৪% শতাংশ আছে। কাজেই খাদ্যের প্রাচুর্য থাকলেও এদের ক্রয় ক্ষমতা কোথায়? জাতিগুলির স্বচ্ছলতা, ও অসচ্ছলতার প্রকৃতি এমন, যে যদি দানা শস্যের কথা ধরা যায়, তা হলে দেখা যাবে যে আমেরিকায় দানা শস্য পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়, আর দরিদ্র

দেশগুলিতে তা হল মানুষের খাদ্য। সে খাদ্যটুকুও তারা সংগ্রহ করতে পারে না। কাজেই তথাকথিত বিপন্ন মানব সভ্যতা মেরামতের কাজটা এই দারিদ্র্য দূর করার কাজ। এক মূল্যে খাদ্য ভাণ্ডারে ধনী আর দরিদ্র পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এই প্রসঙ্গেই 'ক্লাব অফ রোম' বলছেন—"China is an example of how, under extreme conditions, a radical political change may be necessary to achieve income redistribution : through this change, malnutrition has been practically eliminated for 800 million persons since World War II in a relatively brief period of time. It is odd that while there is general agreement on the fact that a citizen has the right to have public transport, low cost education, old age penson or public health services, our society still seems to ignore the fundamental requirement of norishment." এই কথার উপর কোন ভাষ্যের প্রয়োজন নেই।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক ছাড়াও বর্তমান পৃথিবীর খাদ্য মূল্য কমানো যেতে পারে। খাদ্য ঠিক যেখানে উৎপন্ন হচ্ছে, সেইখান থেকে আর যখন আমাদের মুখে ওঠে, এর মধ্যে অন্ততঃ বার আটেক বিভিন্ন ভাবের মুনাফার মধ্যে দিয়ে সেই খাদ্যকে মুখে উঠতে হচ্ছে। এর মধ্যে কতকগুলি হল, (১) কৃষক যখন বীজ কিনছে (২) উৎপাদনের পর কৃষকের বিক্রির সময় (৩) জোৎদার যখন আড়ৎদারকে দিচ্ছে (৪) দালাল (৫) পাইকারী থেকে খুচরা বাজারে আসতে (৬) খুচরা বাজার থেকে ক্রেতার ঘরে যেতে (৭) ক্রেতাকে রাঁধবার জিনিস যখন কিনতে হয় (৮) খাবার জন্য থালা বাসন ইত্যাদি কিনতে হয়।

খাদ্য কি কি ভাবে নষ্ট হতে পারে, তারও আনুপূর্বিক তালিকা 'ক্লাব অফ রোম' করেছে। এগুলি হল : (১) ভূমিক্ষয়ের জন্য (২) ফসল লাগানর সময় (৩) পোকার উপদ্রবে (৪) গাছের পুষ্টির অভাবে (৫) জলের কমবেশীতে (৬) ফসল তোলার সময়ে (৭) ফসল তোলা ও রাখার সময়ে কিম্বা শুকনো করার সময়ে (৮) নিয়ে যাবার পথে (৯) খাদ্য ভাণ্ডারে (১০) ভাণ্ডারে রাখার উপায়ের তারতম্যের জন্য (১১)

বাজারে নিয়ে যাবার সময় (১২) বাজারে থাকতে থাকতে (১৩) বাড়ীতে খাবার তৈরির সময়ে (১৪) তৈরি খাবার রাখার সময় (১৫) খাবার পর হজম না হওয়ায়।

অনেকের কাছে মনে হবে, এ তালিকার প্রয়োজন কি? সাধারণ বুদ্ধি থেকেই তো এ তালিকা বানানো যায়। বক্তব্যটা ঠিক ওইখানেই। মানব সভ্যতার বর্ত্তমান সঙ্কটের কথা বুঝতে, সাধারণ বুদ্ধিই যথেষ্ট। আবার এই সাধারণ বুদ্ধি উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করলে মানবজাতী এই সঙ্কটের মধ্যে পড়ত না। এই সাধারণ বুদ্ধি ব্যবহার করেই মানুষ এ সংকট থেকে বাঁচতে পারে। আবার এ ও ঠিক, এই সাধারণ জ্ঞান বা বুদ্ধি প্রয়োগেই মানুষ কৃপণ বা অক্ষম।

যখনই আমরা খাদ্যের কথা বলছি, মনে রাখি বা না রাখি, খাদ্য বলতে বোঝায় কার্বন বা অঙ্গার, যে ভাবে প্রাণী তা গ্রহণ করতে পারে। কোথা থেকে আসে এই কার্বন? দুটো জায়গা থেকে আসতে পারে এই কার্বন। এক হল আবহাওয়ার কার্বন ডাই-অক্সাইড আর অন্যটি হল তেল, গ্যাসোলিন বা পেট্রল জাতীয় বস্তু। এগুলি অক্সিজেন বিযুক্ত যাকে বলে রিডিউসড কার্বন। এ ধরনের আলোচনা পাঠকদের কাছে নতুন নয়, কারণ পূর্ববর্ত্তি অধ্যায়ে এ আলোচনার কাছাকাছি আলোচনা করা হয়েছে।

যাই হক আবহাওয়ার কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সূর্যালোকের সাহায্যে গাছ করে তুলছে বিবিধ প্রাণী ভোজ্য খাদ্য। আবার এই গাছের কিছু অংশ, কোন কোন প্রাণী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে, তাদের কাছ থেকে মানুষের খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে। এরা হল বন্য তৃণভোজী, গৃহপালিত তৃণভোজী, এক পাকস্থলী বিশিষ্ট পাখী ও প্রাণীকুল, পুকুরের মাছ অন্য প্রাণী, সমুদ্র বা হ্রদের মাছ ও অন্যপ্রাণী।

আবার গাছ বিশেষই সূর্যালোক থেকে আলোর সাহায্যে তাকে কার্বন আছে, এমন যৌগিক পদার্থে পরিণত করলে, তারপর তাকে বিবিধ খাদ্যে পরিণত করা যেতে পারে। এই পর্যায়ের খাদ্য পৃথিবীর খাদ্যাভাবেও অনেকখানি লাঘব করতে পারে, সঠিক ভাবে যদি এ ধরনের খাদ্য কাজে লাগানো যায়। এ ধরনের খাদ্যের উদাহরণ হল সয়াবীন জাত বিভিন্ন খাদ্য, চিনি ইত্যাদি।

তারপর রিডিউসড্ কার্বন ব্যবহার করে যে খাদ্য উৎপাদন করা যেতে পারেঃ এই পর্যায়ে আসে বিভিন্ন বীজাণু; যারা প্রোটিন, কার্বহাইড্রেট বা চর্বি জাতীয়

পদার্থে পরিণত করে, বিভিন্ন ধরনের কার্বনের যৌগিক পদার্থকে। আজ আমাদের এই জায়গায় নজর দেয়া ও গবেষণা চালান সব চেয়ে প্রয়োজন। কারণ, যদি প্রাণীকে দানা শস্য খাইয়ে, তারপর সেই প্রাণীকে মানুষের প্রোটিন খাদ্যে পরিণত করতে হয়, তা হলে দেখা যায় বছরে দু থেকে তিন টন প্রোটিনের জন্য যে পরিমান খাদ্য লাগে, তা দশ থেকে বারো টন কার্বোহাইড্রেটের মূল্যের সমান। সবটা দানা শস্য দিয়ে মূল্য দিতে হয় না বলেই অর্থাৎ পাতা, খড়, ঘাস ও অন্য পদার্থও এ সব প্রাণীর খাদ্য তাই কিছুটা বাঁচোয়া। না হলে অঙ্কটা আরো লোকসানে দাঁড়াত।

সিঙ্গল সেল প্রোটিন (SCP) বা এককোষী প্রোটিন তৈরী করা হচ্ছে। কার্বোহাইড্রেটের উপব ইষ্ট নামে এককোষী প্রাণীর চাষ করে প্রাণীদের উপযুক্ত প্রোটিন খাদ্য তৈরি করা যাচ্ছে। এ ধরনের খাদ্যকে মানুষের খাদ্য করতে আরো কিছু গবেষণার প্রয়োজন। কিছু কিছু শৈবাল যে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে তা হয়ত মানুষের পক্ষে উপযুক্ততর হতে পারে। স্পাইরুলিনা (Spirulina) বলে এক রকমের সবুজ শৈবাল আছে। এর পক্ষে মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল। মেক্সিকো ও আফ্রিকার চাদ অঞ্চলে এর ব্যবহার হয়েছে। এতে আছে ৬৩% প্রোটিন, ২-৩% স্নেহ পদার্থ, ১৬-১৮% কার্বোহাইড্রেট। স্পাইরুলিনাতে সেলুলোজ খুবই কম আছে বলে, এটা সহজে হজমও হবে। চাষও এর করা যেতে পারে খোলা জায়গায় সূর্যের আলোয়, আর তা না হলে আলো জালিয়ে, ঘরের ভিতরে। চাষের সমস্যার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে কাবন ডাই-অক্সাইডের যোগান দিতে পারাটাই একমাত্র বড় সমস্যা। তা ছাড়া চাষ বাড়াতে হলে, এ শৈবালগুলিকে নাড়া চাড়া করতে হয়। প্রতি হেক্টারে ৪০—৫০ টন শুকনো শৈবাল, বছরে পাওয়া সম্ভব। আরো বেশী পরিমাণে, এই শৈবালের উৎপাদন কি করে করা যায়, এ নিয়ে গবেষণা চলছে।

পৃথিবীতে চাষ করবার উপযুক্ত জমি এখনো আছে কি ? থাকলে কোথায় কতটা ? পৃথিবীর হিসেব থেকে দেখা যায়, চাষের উপযুক্ত জমি, এখনও সর্বাধিক পড়ে আছে দক্ষিণ আমেরিকায় ও তার পর রুশ দেশে। তারপর আমেরিকায়। এ ছাড়া অন্য জায়গায় চাষের জমির টানাটানি। ১৯৭৫ সালের হিসেব অনুযায়ী আমরা যদি ইউনিট হিসেবে ধরি, তা হলে দেখা যায়, উন্নত দেশগুলিতে যে

জায়গায় ১৭৮ ইউনিট জমি সেচ পেয়েছে : উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা মাত্র ৪৪ ইউনিট অর্থাৎ চারভাগের একভাগ।

১৯৬১-৬৫ সালের কৃষি উৎপাদনকে আমরা যদি মানদণ্ড হিসেবে ধরি, তা হলে ১৯৭৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, কৃষি পশ্চিম ইউরোপে হয়েছে ১২০। উত্তর আমেরিকায় ১১০। সমগ্র উন্নতদেশ সমূহে ১১৫। উন্নয়নশীল দেশে ৯৪-৯৯। অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশে সবুজ বিপ্লব হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদন কমেছে। এর কারণ জনসংখ্যা। বেশী ফলনশীল ফসল চাষের উপায়, যাকে আমরা সবুজ বিপ্লব বলে স্বাগত জানালাম, সেটাকে নিয়ে আমরা একটু বেশী উল্লসিত হয়েছি। পশ্চিম ইউরোপ, যেখানে ২০% বেশী ফসল নীট লাভ দেখা যাচ্ছে, সেই লাভও এমন কিছু নয়, যদি আমরা সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবি। আর উন্নতিশীল দেশগুলির কথা বোধ হয় বলবার কোন প্রয়োজন নেই। তাই সবুজ নয়। বং নির্বিশেষে বিবিধ বিপ্লব আজ প্রয়োজন, খাদ্য উৎপাদন ও নতুন খাদ্য গ্রহণ ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে, জন্ম ও পরিবার পরিকল্পনা ও কল্যাণের ক্ষেত্রে : শিল্প উৎপাদন ও বিলাস বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে, নতুন সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এক কথায় হয়ত বলা যায়, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে, একটা নতুন জীবনের আশায়।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে অনেক কথা বলা হল। সব আলোচনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে। সেটা হল যে আজ পরিবেশের এক মারাত্মক অবনতি চোখে পড়ে। আর সেই সঙ্গে প্রায় সব জিনিসেরই ক্রমবর্দ্ধমান মূল্য। এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যে আমরা আমাদের পার্থিব সম্পদগুলিকে যেমন করে মিতব্যায়ীতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত ছিল তা করি নি। অর্থাৎ নষ্ট করেছি। অবশ্য, পদার্থবিদ্যার নিয়ম, সেই থার্মোডাইনামিকসের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে, বস্তু বা বস্তুসমূহের শৃঙ্খলার অবনতির পথটা যত সহজ, উন্নতির পথটা তার কঠিন। যেমন খানিকটা চকচকে লোহা রেখে দিলে, সেটায় সহজে মরচে ধরে সেটা টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু কিন্তু টুকরো টুকরো মরচে ধরা লোহা রেখে দিলে সেগুলো জুড়ে এক হয়ে চকচকে হয়ে যাবে না। এইটাই হল থারমোডাইনামিকসের এনট্রপি সমীকরণ। এ সমীকরণের বক্তব্য হল, এনট্রপি বা আনবিক বিশৃঙ্খলতার গতি, বাড়ে সহজে। কিন্তু কমাতে হলে অনেকখানি বাড়তি শক্তির প্রয়োজন। ঠিক এই জন্যই, শক্তিকে রূপান্তরিত

করলে, ঠিক সমপরিমাণ রূপান্তরিত শক্তি পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় একটু কম। এ যেন সময়ের তীর। একদিকে ছুটে চলেছে। এনট্রপির দিক থেকে, বিশ্বে এনট্রপি সহজে বাড়ে আর সহজে কমে না, সেখানে জীবন্ত যা কিছু, তারাই শুধু এনট্রপি সীমিত রাখতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে, অল্প উত্তাপে জীবনের পুরো যন্ত্রপাতি চলছে বলে। উত্তাপের আধিক্যে অণুপরমাণুর অস্থিরতা—যাকে বিশৃঙ্খলা বলে—তা বাড়তে পারে নি। এই পদ্ধতিতে যদি আমরাও শক্তি উৎপাদন করতে পারতাম, তা হলে আমাদের সম্পদটা অনেক কম নষ্ট হত। কিন্তু তা করা যাচ্ছে এখনও কই ?

ঠিক এই কারণেই যা আমরা ব্যবহার করছি, তার পুরোটা পুনরাবর্তন বা পুনর্নবীকরণে ফেরৎ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে যতটা বেশী পেতে পারি, তার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে। দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে আমরা যতটা সম্পদ নষ্ট করছি, সেটাতো অন্ততঃ বন্ধ করতে পারি। এমনকি নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে আমরা যা ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছি, একদিন তাও সমস্যা হয়ে উঠতে পারে যেমন ফসফরাস। সারের জন্য ফসফরাস আমাদের বেশী বেশী করে খরচ করতে হচ্ছে। এর কতটুকুই বা পুনরাবর্তনে ফেরৎ পাচ্ছি ? কিন্তু ফসফরাসের যখন ঘাটতি হবে, তখন ? এই জন্যই একেবারে ভিন্ন গোত্রের খাদ্যের কথা ভাবতে হবে। আর সেই সঙ্গে ভাবতে হবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতীক রাজনৈতিক চিন্তার বিপ্লবের কথা। এ সম্পর্কে 'ক্লাব অফ রোমে'র বক্তব্য হচ্ছে, "In addition, there are basic problems of power politics, inequality of income distribution among nations and classes, and many other unsolved problems which are evident in international affairs. The vital need, therefore, is an integrated approach to economic, social and technological policies with a long term perspective and global outlook."

আজ মানব সভ্যতার সামনে যদি কোন সঙ্কট দেখা দিয়ে থাকে, তার মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সমস্ত মানবজাতীকে এক হয়ে। ক্লাব অফ রোম, তাদের "Goals for Mankind" বইখানির দুটি অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন। সম্মিলিত জাতীপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে অর্থনৈতিক ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী একটা সমতা আনার প্রস্তাবও করেছে। তাঁদের প্রস্তাব

হল সম্পদ, বণ্টন ও টেকনলজির মধ্যে একটা বিশ্বব্যাপী সমতা আনা হক। এতে সাড়া দিয়ে জাতীপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করলেন :

"We proclaim our united determination to work urgently for the establishment of a new international economic order based on equality, sovereign equality, interdependence, common interest and co-operation among all States, irrespective of their economic and social systems, which shall correct inequalities and redress existing injustices, make it possible to eliminate the widening gap between the developed and developing countries and ensure steadily accelerating economic and Social development and peace and justice...... The prosperity of international community as a whole depends upon the prosperity of its constituent parts."

এই ঘোষণা অনুযায়ী Development Assistance এই নামের এক প্রোগ্রামে, পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির জীবনমান উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা ১৯৬৫ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের প্রথম কথাটি হল এই যে, মানুষের মধ্যে কোন উচ্চ, নীচ নেই। কাজেই পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা সমান মর্যাদায় সকলকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। এদের এখানকার প্রচেষ্টা হল উন্নয়নশীল দেশগুলিকে শিল্পোন্নত করা। উন্নয়ন প্রকল্পের নাম দেয়া হয়েছে "Development Decade" বা উন্নয়নের দশক। এর মধ্যে আবার উন্নত দেশগুলিকে ভার দেয়া হয়েছে সাহায্য দেবার। প্রকল্পের কাজই বা কেমন চলছে, আর যাদের সাহায্য দেবার দায়িত্ব, তারাই বা কতটা দিচ্ছে, এটাও মাঝে মাঝে দেখা হয়। দেখা গেল যে উন্নত দেশ গুলির মধ্যে একমাত্র সুইডেন, তাদের যা দেয় ছিল, বরং তা ছাড়িয়ে গেছে। আর সেই জায়গায় আমেরিকা তাদের অঙ্গীকারের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে নি। অথচ বিশেষ বিশেষ দেশকে অস্ত্রসাহায্য দিতে, দেখা যায় আমেরিকা অগ্রণী। বিশ্ব ব্যাংকও এ ব্যাপারে কম সুদে ঋণ দেয়।

এ ছাড়া জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান, ভূগর্ভের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ বিশ্ববাসীর কল্যাণে কি ভাবে লাগানো যায়, তার প্রকল্প করে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। আনবিক

শক্তির জন্যও একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করে, সেই শক্তিকে কি রকম কাজে লাগান যায়, তা দেখা হচ্ছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান এক বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা গঠন করে বিশ্বে খাদ্যের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। ১৯৭৪ সালে রোমে একটি বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন হয়ে গেল। পাঁচ হাজার ছশো তিরিশ লক্ষ ডলার খাদ্যের প্রোগ্রামে খরচ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। উন্নয়নশীল যে সব দেশে খাদ্যাভাব, তাদের সঙ্গে নিজেদের বাড়তি খাদ্য ভাগ করে খাবার ব্যাপারে, বরং উন্নত দেশগুলির উৎসাহ বর্ত্তমানে বেড়ে উঠছে, দেখা যাচ্ছে। ক্ষুধা তবু এক জাতির মানুষের সঙ্গে আর এক জাতির মানুষের যোগ সূত্র হয়ে উঠছে। এমনি করে যদি সারা বিশ্বের মানুষ ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হতে পারে, তবেই আশা, মানবজাতি ও তার সভ্যতা বেঁচে থাকবে।

ক্লাব অফ রোমের "Goals for Mankind" বইয়ে কি ভাবে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একযোগে বিশ্বব্যাপী এই সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা সম্ভব, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ই এ ব্যাপারে মুখ্যভূমিকা নেবে। তাদের প্রভাব দেশের গভর্ণমেণ্টের উপর ও সাধারণ মানুষের উপর পড়বে। এই বৃহত্তর প্রভাব সেই জাতিকে এই সব সমস্যার সমাধান করতে উদ্বুদ্ধ করবে। এক জাতি আবার অন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাঁদের মতে এই ভাবে এক বিশ্বমানব সমাজের প্রতিষ্ঠা আজ সন্নিকট।

এই অধ্যায়ে 'ক্লাব অফ রোমে'র প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। হয়ত কোন পাঠকের মনে হতে পারে, একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান, হোক না তা এক আন্তর্জাতিক বিদ্বৎসভা, তাদের উপর এতটা নজর দেবার কি আছে? বিশেষ করে কারুর হয়ত মনে হতে পারে যে 'ক্লাব অফ রোম' প্রতিষ্ঠাও হয়ত উন্নত দেশগুলির উদ্দেশ্য প্রণোদিত। কি, বা কতটা গভীর, এই উদ্দেশ্য, তা নিয়ে মতভেদ, এই উদ্দেশ্য, তা নিয়ে মতভেদ আছে। একটি থিয়োরি হল, যে আমেরিকা ও আমেরিকার প্রভাবাধীন সম্পন্ন ও স্বচ্ছল দেশগুলি, 'ক্লাব অফ রোম' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে এক হতাশার দর্শনে দীক্ষা দিতে চাচ্ছে। তাদের কাছে এদের বক্তব্যটা হল, যখন মানব সভ্যতা বিপন্ন, তখন হে বৎসগন, ত্যাগের পথ গ্রহণ কর।

আবার আর একটি থিয়োরি হ'ল, এই 'ক্লাব অফ রোম' তাদের বিশিষ্ট

হতাশাস্থচক দর্শনের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে মার্কসবাদ বিরোধী প্রভাবে প্রভাবিত করতে চাইছে। কারণ মানবজাতির ভবিষ্যত সম্পর্কে মার্কসবাদীদের কোন হতাশা নেই। তারা উগ্র আশাবাদী।

'ক্লাব অফ রোম' সম্পর্কে এই রকম বিভিন্ন থিয়োরী বিশ্বের বাজারে চালু আছে। আর তা থাকবারই কথা। এমনি নানা চিন্তার বিচিত্র স্রোত রয়েছে বলেই তো মানব সভ্যতা এমন জীবন্ত। সেই স্রোতের জলও আমাদের ছুঁয়ে দেখতে হবে, ঠিক যেমন দেখতে হবে, এই বিচিত্র স্রোতের উদ্ভব হল কোথা থেকে। ক্লাব অফ রোম এমনি একটি আলোড়ন। তাই আমাদের পুরো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে, তার মধ্যে কল্যাণকর কি আছে বা ছিল। আজ মানব জাতি এমনই এক সভ্যতার সঙ্কটের মুখোমুখি, যখন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ, অর্থনীতির ধরন, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত দর্শন সব কিছুর উপরে মানব জাতির সমগ্র অস্তিত্বের কথা ভাবতে হবে। সেই অস্তিত্ব, যাতে সামগ্রিক ও বিশ্বজনীন ভাবে সুস্থ ও কল্যাণপ্রদ হয় তাই আমাদের দেখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষ বেলার বাণী "সভ্যতার সঙ্কটে" বলছেন, "সিভিলিজেশন,' যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন সদাচার।" সদাচার যে ক্রমশঃ লোকাচারে পরিণত হয়ে তার সৌষ্ঠব হারায়, এও রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন। সেই হারান সৌষ্ঠব পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম আজ। আবার নতুন করে করতে হবে সদাচার প্রতিষ্ঠা। এ সদাচার শুধু বিশ্বমানব ও ব্যক্তি মানবের প্রতিই নয়। তাকে করতে সর্বজীব ও উদ্ভিদমুখীন। শুধু তাও নয়। হতে হবে সর্বতো-মুখীন।

ওই নিবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ আবার বলছেন যে, "বর্তমান সভ্যতা। তার শক্তি রূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তরূপ দেখাতে পারে নি।" ১৯৪১ সালে ঋষি ক'ব যা দেখতে চেয়েছিলেন, তা আজও আমরা দেখতে ও দেখাতে পেরেছি কি? বোধ হয় এতদিন পরে মাত্র বললাম তথাস্তু অর্থাৎ তাই হক। শোনা যায় গণ্ডারের পুরু চামড়ার ভিতর দিয়ে, তার স্নায়ুতে কোন অনুভূতি পৌছতে একটু সময় লাগে। আর আমাদের? আমাদের তো চল্লিশ বছর কেটে গেল :

তবু সাড়া জেগেছে কি ? তবু রবীন্দ্রনাথই আমাদের আশা রাখতে বলেছেন। তিনি বলেছেন "মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ।" তারই কথা।

ঋষিরা ভবিষ্যদ্রষ্টা। তাই বুঝি তাঁরা হন আশাবাদী। আমাদের যুগের এমনি একজন ঋষি রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর বাণী থেকে আমরা যে কোন সঙ্কটের মুহূর্তে নতুন আশা পাই। ঋষি কল্পনা করেছেন, এ বিশ্বের উদ্ভব মধুরসে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন।

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধু রসে ক্ষয় নাই তার।"

সমস্যার গভীরতার স্বাদ যতই তিক্ত, আশা আছে ভবিষ্যত আমাদের হবে মধুময়।

বিভিন্ন দর্শনে নেতিবাদ ঃ ইতিবাদ

এতক্ষণ এই বিভিন্ন অধ্যায়গুলিতে আমরা মানব জাতি ও তার সভ্যতার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করেছি। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে, পৃথিবীর সম্পদকে কি ভাবে অপব্যবহার করে ক্ষেত্র বিশেষে তাকে বিলুপ্তির পথেও পাঠানো হয়েছে, তাও কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এ আলোচনাতে স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মনোভাব ও পারস্পরিক আচার ব্যবহারের কথাও উঠেছে। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এ প্রসঙ্গগুলিও আমরা ছুঁয়ে গেছি। ছুঁয়ে গেছি, এই কারণে, যে পূর্ববর্ত্তি অধ্যায়গুলিতে, যেখানে সম্পদ ও তার ফলাফলের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই ছিল প্রধান, সেখানে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ ততটা ছিল না। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনাই করছি।

মানুষের পরিবেশ, ও সেই পরিবেশজাত প্রেরণা, তারা যা করছে, সেকাজে মানুষকে নিয়োজিত করে। আবার তারা যা করছে, তা পরিবেশকে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্ত্তনও করছে। পরিবেশ ও পরিবেশের প্রেরণায় যে কর্ম, সে কর্মে প্রধানতঃ অন্য মানুষ ও অন্য প্রাণী উদ্ভিদরাও তার সঙ্গী। এই প্রতিবেশতির ফলে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধু যে মানুষে মানুষে সম্পর্কই থাকে, তা নয়। অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সঙ্গেও মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বলা চলে, এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই মানুষের যা কিছু সব। হক তা ভাষা, হক তা শিল্প, হক তা সাহিত্য, বিজ্ঞান কি দর্শন। আবার মানুষের এই সব সৃষ্টিগুলিও মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত করে। এই অধ্যায়ে আমরা মানুষের সৃষ্টি গুলির মধ্যে, দর্শন কি ভূমিকা বর্ত্তমানে নিয়েছে, তাই আলোচনা করছি।

আজ যে আমাদের চারিদিকে একটা নেই নেই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তেল নেই, কয়লা নেই, খাদ্য নেই, শক্তি নেই। সারা পৃথিবীর লোক, তাই যেন হয়ে উঠেছে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর সেই "ছন্নছাড়া" কবিতার ছেলেগুলোর মত, "নেই রাজ্যের বাসিন্দা।" এই নেই রাজ্যের

বাসিন্দাদের সকলের না হলেও, বেশ কিছু লোকের একটা নেতিবাদের দর্শনের উপর ঝোঁক হওয়া স্বাভাবিক সেই আলোচনাতে প্রথমে আসি।

ক্যালিফোর্ণিয়া ছেড়ে রেভারেণ্ড জিম জোনস ও তার প্রায় এক হাজার ভক্ত, গুয়ানার জঙ্গলে পুত্র কন্যা পরিবার সহ এসে কলোনি স্থাপন করেছিল। দিনে বারো চোদ্দ ঘন্টা পরিশ্রম করে, ঘর, বাড়ী, সমাজ, সভ্যতা, ছেড়ে এই গুয়ানার জঙ্গলে তারা রেভারেণ্ড জিম জোনসের প্রেরণায় কলোনি স্থাপন করে। বেশ কয়েক বছর আগে জিম জোনস, পিপলস টেম্পল চার্চ বলে এক প্রতিষ্ঠান ক্যালিফর্ণিয়াতেই স্থাপন করে। তার বেশ কিছু ভক্তও জুটে যায়। জোনস অনেক ভাল কথাও বলছিল। যে তারা নাকি আর্থিক বৈষম্য বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদির অবসান চায়। কিন্তু ক্যালিফর্ণিয়া সরকারের অভিযোগ ছিল, যে জিম জোনস প্রতারক। ভক্তদের অর্থ আত্মসাৎ, বলাৎকার ইত্যাদির অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ছিল। ভক্তরা নিজেরাই সব অভিযোগ অস্বীকার করাতে জোনস ছাড়া পায়। জোনস দেখল, যে এখানে আর থাকা চলবে না। আর ভক্তরাও এমনই প্রভাবিত, যে প্রায় হাজার ভক্ত তার সঙ্গে গুয়ানার জঙ্গলে ১৯৭৩ শালে আসে।

পাঁচ বছর পরে, জোনসের ভক্তদের আত্মীয়রা, আমেরিকার সরকারকে, তদন্তের জন্য আমেরিকা থেকে, সেনেটার রায়ানকে পাঠাতে সমর্থ হয়। জোনস রায়ানকে ও তার সহযাত্রীদের খুন করে। তার পর ১৯৭৮ শালের ২৩ নভেম্বর জোনস তার একহাজার শিষ্যদের ও তাদের পুত্রকন্যা সহ, সায়নাইড মেশানো পাণীয়ে আত্মহত্যা করতে সকলকে রাজি করে। এরাও এমনভাবে প্রভাবিত ছিল এই সব চিন্তায়, এ পৃথিবীর শেষ হয়ে আসছে, ইত্যাদিতে, যে তাদের মধ্যে প্রায় আটশো জন আত্মহত্যা করে। এ খবরটি আমাদের দেশেও কাগজে বার হয়েছিল, পাঠকদের মনে আছে। সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল, এক হতাশাবাদী অসুস্থ দর্শনের প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে তাই দেখে।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের গণ-হিষ্টিরিয়া দেখা গিয়েছে। ইহুদি সম্প্রদায়ের উপর রাষ্ট্রের সামগ্রিক আক্রমণ ও তার পিছনে দেশের জনগণের সমর্থনও মাস-হিষ্টিরিয়ার আকারে হিটলারের জার্মানিতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু ১৯৭৮ সালের নভেম্বর জোনস টাউনে যে গণ আত্মহত্যা সংঘটিত হল, তার তুলনা জানা নেই। বিষ খাওয়া সত্তেও যারা মৃতপ্রায় হয়ে বেঁচে গিয়েছিল, এ রকম আশীজন

লোককে আমেরিকার মনোরোগ বিশারদ ডাঃ সুখদেও পরীক্ষা করেন। তাঁর মতে, এরা জোনস অভিভাবিত, মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, বিষাদগ্রস্ত, বিভ্রান্ত ও বিহ্বল। জোনসের জীবন বিমুখ দর্শনের প্রভাবে এদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে পুরানো বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে। গুয়ানার জোনস টাউনে যে গণ আত্মহত্যার ট্র্যাজেডি ঘটেছিল, সে সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা আরো কাজ হয়েছে। আমাদের দেশে ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় "মানব মন" পত্রের একাধিক প্রবন্ধে করেছেন।

আমরা এখানে এই ট্র্যাজেডির উল্লেখ করলাম, তার কারণ, একেই তো দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে জনগণের মনে পাপবোধ, হতাশা, বিষণ্ণতা, গ্লানি ইত্যাদি চাপাবার চেষ্টা করেছেন তার উপর সম্পদ, শক্তি, খাদ্য এ সবের অবস্থাও আজ অনুকূল নয়, সে জন্য এই হতাশাবাদের দর্শন মানুষকে আজ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। তাই নৈরাশ্যবাদের দর্শন আলোচনার আগে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ভূমিকা হিসাবে উল্লেখ করলাম।

শেয়ারের বাজারে দু রকমের লোক থাকে। একদল যারা আশাবাদী, তাদের প্রভাবে বাজার তেজী হয়ে ওঠে আর এক দল যারা নিরাশাবাদী, তাদের প্রভাবে বাজার মন্দা হয়ে যায়। এদের একদল কেনে বেশী, আর এক দল বেচে বেশী। ঠিক এইরকম, দার্শনিকদের মধ্যেও দু দল আছেন। এঁদেরই কারো কারো দর্শনের আলোচনা করছি।

পূর্বে আমরা হিটলারের নাৎসী দর্শন জার্মানির কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি। আজ আর কাউকে বলে দেবার দরকার হয় না, যে নাৎসীবাদ বিশ্ব জুড়ে কায়েম হতে না পারলেও, মানবতা ও মানব সভ্যতার কি ক্ষতি করেছে। মানুষের প্রাণনাশ, ধ্বংস, অত্যাচার, এ সব নিয়ে এখানে আলোচনা না করেও, শুধু বস্তুবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলেও দেখা যায় যে নাৎসীবাদ সভ্যতার পক্ষে কত বড় বিপদ যখন অকারণে যুদ্ধ প্রস্তুতির কাজে লাগিয়ে, অস্বাভাবিক ভাবে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চলে, তখন তো শুধু মানব জাতির পার্থিব সম্পদগুলিরই অপব্যবহার করে, তা নষ্ট করা হয়। পেট্রল, কয়লা, খনিজবস্তু, শক্তি, খাদ্য সবই এই ভাবে নষ্ট করা হয়েছে। তারপর পূর্ব অধ্যায়ে যে এনট্রপি—অর্থাৎ আনবিক পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা—বৃদ্ধির কথা বলেছিলাম, ধ্বংস মানেই সেই এনট্রপি বৃদ্ধি। পাঠকের মনে আছে এনট্রপি বেশী হওয়া,

সব জৈব অস্তিত্ব বিরোধী। যে নেতিবাদী দর্শন নাৎসীবাদকে পুষ্ট করেছে, তা ছিল নিৎসের দর্শন।

অসুস্থ, খুব একটা শক্তিশালী নয়, এই রকম একজন মানুষ ছিলেন নিৎসে। বোধ হয় ক্ষীণজীবী বলেই তৎসঞ্জাত হীনমন্যতায় তিনি এক বিরাট গোঁফ রেখেছিলেন গোঁফের কথা থাক। সাধারণতন্ত্র, কি সাধারণ মানুষের উপর তার কোন শ্রদ্ধা ছিল না তিনি বলতেন, যে বিরাট মানুষদের কর্তব্যই হল সাধারণতন্ত্রকে বাড়তে না দেয়া। কারণ এতে 'জনগণ" কি "মেয়েদের" আর 'মাঝারি" লোকদের বাড়তে দেয়া হয়। এ হল "নিচু"দের কর্তৃত্ব। বহু জায়গায় তিনি তার ভাবাবিষ্ট "ইচ্ছাশক্তি"র জয়গান করেছেন। এবং মাধ্যমে সৃষ্টি হবে শক্তি, যা মানুষকে মহামানব করবে। এই "মহা' বা "অতি' মানব সম্পর্কে নিৎসের দুর্বলতা অসীম। রবীন্দ্রনাথ যেখানে মহামানবকে বলেছেন সর্বমানব, তারই জয়গান করেছেন, নিৎসে ঠিক তার উল্টো। নিৎসে রবীন্দ্রনাথের মত বলতে পারবেন না।

"জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়

মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।"

খুব চটকদার কথা, যেগুলো শুনলে বা পড়লে, এই চমকের জন্যই তা অভ্রান্ত বলে মনে হবে, নিৎসের লেখা এইরকম কথা দিয়ে ঠাসা। আর নিজের বক্তব্যটা জোরালো মনে হবে, এ রকম বক্তব্য পেলেই তার সুবিধাজনক ব্যবহারও তিনি করতেন। যেমন "আর্য"দের প্রশস্তি করার সময় তিনি মনুর উদ্ধৃতি না দিতে পারলেও মনুসংহিতা অবলম্বনে বলছেন যে মনুই নীতির চরম কথা। আর এই হল "আর্য মানবতার" চরম বক্তব্য, যে বক্তব্যের "পবিত্রতা অসামান্য, আর প্রাচীনতম ঐতিহ্য "পবিত্র রক্তে"।

নিৎসে নীতিকে অনুরূপ দুর্মার্গে ফেলে "প্রভু" নীতি ও "ক্রীতদাস" নীতির পর্যায়ে দু'ভাগ করেছেন। তাঁর "মহামানবের" নীতিই যে "প্রভু" নীতি, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর শেষ বইখানির নাম, নাম ঠিক নয়, উপনামটি হল "হাতুড়ির দর্শন"। শুধু হাতুড়ির কেন, নিৎসের দর্শনটাকে যে একটু হাতুড়েও মনে হয়, এটা অস্বীকার করা শক্ত। তবু তা জার্মান জাতির মত এক জাতি কি করে গ্রহণ করল, তাই আশ্চর্য।

এক জায়গায় তিনি বলছেন, "তোমাদের দীর্ঘকাল একজনের আদেশ মেনে

চলতে হবে। তা না হলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, এমন কি শেষ সম্মানটুকু পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে।' বলাবাহুল্য এ কথা তিনি কোন মহামানবের উদ্দেশে বলেন নি। "বলেছেন সেই মনুষ্য নামের প্রাণীদের"। উদ্ধৃতিটি আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক কাউফম্যানের "From Shakespeare to Existentialism" বই থেকে নেয়া। নিৎসে সম্পর্কে তিনি বলছেন যে বিভিন্ন সময়ে নিৎসের মূল্যায়ণ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কখনো তাকে বিবর্তনবাদের প্রবক্তা বলেছেন তাঁর ভক্তরা। আবার কখনো তাঁকে দেখা গেছে নাৎসীবাদের ঋষি হিসাবে। হিটলারের পরাজয়ের পর তার জন্যই অস্তিত্ববাদ বা একজিসটেনসিয়ালিজমের জন্ম হয়েছে এ কথাও অনেকে মনে করেন। কিন্তু কাউফম্যানের মত হল যে, এর মধ্যে কোন মতবাদই নিৎসে সম্পর্কে শেষ কথা নয়। তিনি বলছেন নিৎসেকে দেখতে হবে ট্রাডিশানধর্মী হিসাবে। অথচ নাৎসীবাদ এই ট্রাডিশনকে অস্বীকার করেই। চিন্তার জগতে নিৎসে যে বিপ্লব এনেছিলেন তা ঠিক কোন জায়গায়? কাউফম্যানের মতে তা এথিক্স বা নীতি শাস্ত্রে। যে আলোচনা করেছি, তা থেকে এ বক্তব্যের স্পষ্টতা অনেকটা বোঝা যায়। ঠিক আবার এটা আর এক ভাবেও দেখা যায়। নিৎসে নিজেকে খ্রীষ্টবিরোধী বা এ্যান্টি ক্রাইষ্ট বলেছেন। শুধু বললেই তো আর হল না, এটা দেখাবার জন্য "ভবিষ্যতের নবীর" একটানা নাটকীয় স্বগতোক্তিতে অনেক কথা বলে গেছেন। যাতে তাঁর বক্তব্যগুলি খৃষ্টবিরোধী সমান্তরাল নীতি হয়ে ওঠে।

এই অধ্যায়ের নাম দেয়া হয়েছে বিভিন্ন দর্শনে নেতিবাদ : হতবাদ। দার্শনিক না হলেও, নানান বক্তব্য ধার করে, জোনস মুষ্টিমেয় লোককে এক জীবনবিমুখ চরম হতাশাবাদে এনে ফেলেছিল। তার ফলে এই গণ আত্মহত্যা সংঘটিত হল। আবার নিৎসে প্রভাবিত নাৎসীবাদের কথা যদি ধরি, তা হলে যুদ্ধের আগের পর্যায়ে, এমন কি যুদ্ধ পর্যায়েও দেখি বিশাল কর্মকাণ্ড। কিন্তু সে কর্ম কোথায় নিয়ে গেল? মৃত্যুর দিকে, ধ্বংসের দিকে, অপচয়ের দিকে। সায়নাইড পাণীয়ে যে পথে গেল জোনসের শিষ্যরা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলিকে না দেখে যদি নিছক পদার্থ বিজ্ঞানের থারমোডাইনামিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখি, এই দুই ক্ষেত্রেই সেই এনট্রপি (আনবিক বিশৃঙ্খলা) বৃদ্ধি। সেই জীবনবিমুখতা। এনট্রপির কথাই যখন উঠল, তখন সাধারণ পাঠকদের জন্য বলি,

যতক্ষণ এ দেহ জীবন্ত, ততক্ষণ এই দেহের অনুগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ; তখন এনট্রপি কম। আর ছাই হলে বা কবরস্থ হলে দেহের অনুগুলি ছিন্নভিন্ন বিশৃঙ্খল, এনট্রপি তখন বেশী। এই ভাবে দেখা হয় পদার্থবিজ্ঞানে। পদার্থবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রয়োগ করলেও দেখা যায়, যে কোন চিন্তা, কর্ম বা দর্শন জীবনবিমুখ তা এনট্রপি কমানোর চেয়ে তা বাড়াতেই সাহায্য করে।

একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিজম্‌, যাকে এর আগে বাংলায় অস্তিত্ববাদ বলে উল্লেখ করেছি, বর্ত্তমানে তা এক বহু আলোচিত নাম। আলোচিত বললে বোধ হয় ঠিক হল না, বলা উচিত বহুলোচ্চারিত; কারণ বুঝি বা না বুঝি, আমরা বলে থাকি যে অমুক একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিষ্ট লেখক। কিন্তু তাদেরই যদি জিজ্ঞাসা করা যায় একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিজম্‌ কি? দেখা যাবে যে তাদের কোন ধারণাই নেই। কাউফম্যানেরও মত হল, শুধু অনুবাদের মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু ইংরাজিতে এসে পৌঁছেছে বলে, ইংরাজি ভাষাভাষীদের কাছেও এ দর্শন তত স্পষ্ট নয়।

যাই হক এই দর্শনে ভাবতান্ত্রিকতা একটু বেশী। কির্কেগার্ড, সাত্র, কামু ইত্যাদি বহু বিশ্ববিখ্যাত নাম এই দর্শনের সঙ্গে জড়িত। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর, জীবনের যে হতাশা, দুঃখ, বেদনা তারই উপযুক্ত হতে পারে, এই অশ্বাস নিয়েই এই দর্শন ইউরোপে এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যে কির্কেগার্ডের নাম করেছি, ডেনমার্কের লেখক ও দার্শনিক সোরেন কির্কেগার্ডের, "Either/or", "Fear and Trembling", ইত্যাদি বই জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারকে প্রভাবিত করে ও তিনি "Peing and Time" বইখানি প্রকাশ করেন। যিনি প্রথম একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিষ্ট বলে পরিচিত, সেই কার্ল জেসপার আবার প্রভাবিত হন হাইডাগারের প্রভাবে। এ দর্শনের অনেকগুলি দিক আছে, ফলে প্রোটেষ্টাণ্ট নীতিদর্শন থেকে সুরু করে, সাইকো-এ্যানালিসিস পর্যন্ত ইউরোপের সমসাময়িক বহু চিন্তায়, এ দর্শনের ছাপ পড়েছে। এমন কি ইউরোপে বহু লেখক ও শিল্পীও এই দর্শনে প্রভাবিত হন। যেমন স্প্যানিস লেখক উনামুনো যখন লিখলেন "The Tragic Sense of Life". কি ইস্‌রায়েলের মার্টিন বিউবার যখন লিখলেন "I and Thou" অথবা কামু যখন লিখলেন "Plague", তখন সবাই বললে, এই হল অস্তিত্ববাদী লেখা। যদিও হাইডেগার সাত্রকে দার্শনিক বলে স্বীকার করতে রাজি হন নি, তবু আজকে সারা পৃথিবীর লোকের কাছে, একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিজম্‌ মানেই সাত্র।

আগেই বলেছি যে এ দর্শন ভাববাদী। তাই শুধু বাইরের বিশ্ব ও তার রূপ কি, শুধু এ নিয়েই মাথা না ঘামিয়ে, অস্তিত্ববাদ, ব্যক্তির জীবনে মূল্যগুলির প্রতি, কি ঈশ্বরের প্রতিও কি মনোভাব, তার সমস্তটাকে একসঙ্গে ধরেই হল এই দর্শন। প্রথম প্রশ্নই এখানে হল সত্তা আর অস্তিত্ব নিয়ে। তথাকথিত সত্তা বা এসেন্স বলতে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, সেই দিকটি, যাকে দেখা যায়, পরীক্ষা করা যায়, বোঝা যায়। আর অস্তিত্ব হল, সেই সত্যটি যার মাধ্যমে পরিবর্ত্তনীয়, বিপদসঙ্কুল বিশ্বে, তার একটি ঠাঁই রয়েছে। এই ঠাঁই থাকাটাও আবার অপরিহার্য।

যে হেতু অস্তিত্বই মূল, সুতরাং প্রত্যেকটি আত্মসচেন প্রাণীর, নিজের অস্তিবোধ থাকবে। এ অস্তিবোধ হচ্ছে কি করে? হচ্ছে তার তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার বোধের চিন্তায় ও পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ থাকার জন্য। আবার এ বোধ (অস্তিত্ব বোধ) ঘটছে, কারণ এ বিশ্বের সে একজন স্বাধীন অংশীদার। ফলে তার ব্যক্তি সত্তা, শুধু যে জানে (অভিজ্ঞতা লাভ করে), তাই নয়, সে ভয় পায়, আশা করে, বিশ্বাস করে, ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন খুঁজে পায়।

কিন্তু শুধু চিন্তার সাহায্য আমরা কি আমাদের অস্তিত্বের পুরো খবর পাই? যেমন, "মানুষ মাত্রেই মারা যাবে," এ সত্যটি আমাদের অস্তিত্বের সত্য। কিন্তু এটিকে উপলব্ধি করতে করতে হলে, "আমিও মারা যাব," এই উপলব্ধিটির ঘাত-প্রতিঘাত, আমার অস্তিত্বের উপরে লাগা চাই।

অস্তিত্ববাদীদের বক্তব্য হল, ঠিক এই কারণেই, পুরোপুরিভাবে বস্তুতান্ত্রিক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়! আর সেই জন্য পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততার সঙ্গে কিছু লক্ষ্য করা যায় কি? যখন সমস্যাগুলি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

জীবনে অংশ যারা নেবে না, জীবনের দ্বার তাদের কাছে বন্ধ। তাছাড়া তার কাছে জীবনের মূল্যই বা কি? এই সব কারণে একজন অস্তিত্ববাদীর পক্ষে নিছক যুক্তিবাদী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাঁদের মতে যুক্তিবাদী তো, অভিজ্ঞতার যে নিদারুণ সমস্যা, তাদের বাদ দিয়ে চিন্তায় আশ্রয় নিতে চায়। জীবনের গুরুতর দিকগুলি যেমন অসাফল্য, অন্যায়, পাপ, অজ্ঞানতা, যুক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায় না। কির্কেগার্ডের মতে ঈশ্বরও যুক্তি গ্রাহ্য নয়। কির্কেগার্ডের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ঈশ্বর চিরন্তন।

জীবন ক্ষণস্থায়ী। তাই জীবন আর মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে হালকা ভাবে আলোচনার কি মূল্য? অথচ আমরা তা এমনভাবেই করি, যাতে মনে হবে আমাদের সামনে বুঝি অনন্ত কাল পড়ে রয়েছে। তার চেয়ে বরং অজানায় ঝাঁপ দেয়া শ্রেয়। অজনায় ঝাঁপ দেয়ার অর্থ হল, ঝাঁপ দেবার আগে কোন এক জায়গায় পূর্ণ আত্মসমর্পণ। তাই অস্তিস্তবাদীদের মধ্যে আছেন ভক্ত খৃষ্টান, সাইকো এ্যানালিষ্ট, অবিশ্বাসী, ইত্যাদি সব রকমের লোক। ১৯৫০ সাল নাগাদ, ইউরোপে একজিস্‌টেন্‌সিয়ালিস্ট সাইকোএ্যানালিষ্ট অনেকে ছিলেন। আর তাঁদের প্র্যাকটিশও ছিল বেশ ভাল। এই দর্শনে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ভাববাদের প্রভাবের জন্য মনোসমীক্ষণের দিকে বেশী লোক যে ঝুঁকেছিল, সেটা স্বাভাবিক। এ ছাড়া লেখক শিল্পী ইত্যাদি, যারা, এই দর্শনে প্রভাবান্বিত; তারাও ছিল অজস্র।

অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী আর একদল তরুণ তরুণী পঞ্চাশদশকের ইউরোপে দেখতে পাওয়া যেত। বর্তমানে যারা হিপি, তথাকথিত হরেকৃষ্ণবাদী, বা শৈব কাল্টের ভক্ত, তাদেরই যেন একদল পূর্ব সূরী দেখা যেত তখনকার ইউরোপে। অবশ্য বর্ত্তমান যুগের এই তরুণ তরুণীদের মত, পঞ্চাশদশকের এই তরুণ তরুণীরা কিন্তু গাঁজা, চরস, মারিহুয়ানাসেবী ছিল না। না ড্রাগ এডিক্ট। হতাশময় পরিস্থিতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে তারা ছিল পলাতক। অস্তিত্ববাদের দর্শন তাদের পলায়নী মনোভাবকে বরং আশ্রয় দিয়েছিল। তারাও তথাকথিত আনকনভেনসানাল পোষাকে হয়ত কোন লেকের ধারে শুয়ে থেকে, কি অল্প পয়সার কাফেতে, আধপেটা খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, শুধু কথা, কথা আর কথা বলে কাটিয়ে দিত। বর্ত্তমান যুগের উন্মার্গগামীদের সঙ্গে তুলনা করলে ওদের অনেক ভাল বলে যেন মনে হয়। অবশ্য বর্ত্তমানের উন্মার্গগামীদের হয়ত শুধুই দোষ দেয়া যায় না। তাদেরও বিচার করতে হবে সামগ্রিক পরিবেশের কথা মনে রেখে। যাক সে আলোচনায় পরে আসছি।

নেতিবাদের দর্শনের কথা বলতে গিয়ে যেমন নিৎসে ও তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত নাৎসীবাদের কথা বলেছি, তেমনি অস্তিত্ববাদও যে নেতিবাদের দর্শন, এ বোঝা শক্ত নয়।

এই নেতিবাদী দর্শন, হয়ত ফ্যাসিবাদ বা নাৎসীবাদের মতন কোন

আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত করার প্রেরণা না দিতে পারে, তবু এই দর্শনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষয়িষ্ণু মানব সভ্যতাকে বাঁচান যাবে না। আর যদি আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের এনট্রপি ভাবনারও সাহায্য নি, তা হলেও দেখি যে পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তায় এনট্রপি কমাতে সাহায্য করে না। তা করে, পূর্ব অধ্যায়ে যে আমরা জিরো গ্রোথ রেট ডেভালাপমেন্টের কথা বলেছি, সেই জিরো গ্রোথ রেট ডেভালাপমেন্টে। কাজেই জীবন দর্শনে যথোপযুক্ত প্রেরণা থাকতেই হবে।

পূর্ব প্যারাগ্রাফে আমরা যে বর্ত্তমান সমাজের উন্মার্গগামী তরুণদের কথা বলেছি, তাদের জীবনদর্শনে, যদি তাদের দর্শন বলে কিছু থাকে; তারই আলোচনা করছি বর্ত্তমান সময়ের মেডিকেল জার্ণালগুলি খুলে দেখলে দেখা যাবে, যে তথাকথিত ড্রাগ এডিকশান সম্পর্কে অনেক বেশী প্রবন্ধ এখন প্রকাশিত হচ্ছে। এর কারণ হল এদের সংখ্যা এত বাড়ছে. যে তা একটা সমস্যা হয়ে উঠেছে। ড্রাগ এডিকশান বলতে বোঝায় নেশার জিনিসের উপর নির্ভরতা। এর মধ্যে চিকিৎসকরা মদ, গাঁজা, চরস, আফিং, মারিহুয়ানা, এল-এস-ডি, বিভিন্ন ধরনের ঘুমের পিল, ষ্টিমুলেণ্ট বা উত্তেজক ওষুধগুলি ধরেছেন। অবশ্য ডাক্তারি জার্ণালে, এ গুলিকে শ্রেণী অনুযায়ী ভাগ করা হয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন অন্য জায়গায়। আমাদের প্রশ্ন হল কি চিন্তা থেকে তারা জীবনের ক্ষতি ও হানিকর এই অভ্যাসের বশবর্ত্তি হয়ে নিজেদের আয়ুক্ষয়ের ও মানসিক বৈলক্ষণ্যের পথে পা বাড়াচ্ছে? আর এর পিছনে কি কোন বিশেষ জীবন দর্শন আছে?

বহু বৈজ্ঞানিক এ সম্পর্কে খুব ভাল কাজ করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কোন উদ্দেশ্য বা জীবনদর্শন থাকার চেয়ে, না থাকাটাই এদের উন্মার্গগামীতার কারণ। অবশ্য চোখের সামনে, নেবার মত বড় আদর্শ কি তেমনি বিরাট পুরুষ আজ আর নেই। আজ যারা পাদপ্রদীপের সামনে, তারা নিজেরাই আদর্শভ্রষ্ট, মদ্যপ, লম্পট, মিথ্যাবাদী, শঠ। তা ছাড়া ধর্মের অন্ধ-বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিয়েছে বিজ্ঞান। সেই পুরাতন গৃহ, যা ছিল অনেকের স্নেহ দিয়ে ছায়া স্নিগ্ধ, তা আজ টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ, সিজোফ্রেনিয়া রোগীর ব্যক্তিত্বটা যেমন টুকরো টুকরো হয়ে যায়, তেমনি হয়ে যাচ্ছে সমাজ। কে জানে? তাই কি এরা একাধিক হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ, যেমন, এল-এস-ডি, মারিহুয়ানা, চরস, গাঁজা, ইত্যাদি খাচ্ছে?

একটা জিনিস কিন্তু এদের মধ্যে দেখা যায়, তাহলো, এরা যে সমাজ বা পরিবারের তার প্রতি এদের বীতরাগ, বিদ্বেষ। তাই জন্য আমেরিকার ধনী সমাজের যারা, তারা ফকির বা সন্ন্যাসী সেজে, গাঁজা টানছে ভারতের চরম কষ্টকর পরিস্থিতিতে। আবার যারা ভারতের, তারা হয়ত বারবিটিউরেট খেয়ে, ঝিমুতে ঝিমুতে স্বপ্ন দেখছে যে তার দেশ থেকে ইমিগ্রেট করে চলে যাবে, আমেরিকার প্রাচুর্যে। এককথায় এরা ছিন্নমূল।

আর এদের দর্শন? কোন দর্শনের গভীর যেতে ওরা পারে না, তাই এরা যখন হরেকৃষ্ণ করে, তখন বৈষ্ণব দর্শনের গভীরতায় না গিয়ে, সবটুকুই ভাষা ভাষা। আবার আমাদের দেশের যারা আমেরিকার স্বপ্ন দেখে তাদের সে স্বপ্নের রসদটা জোগায় সস্তা অমেরিকান উপন্যাস ও ক্রাইম ফিকশান। একটা প্রশ্ন স্বভাবতই এসে পড়ে। এর জন্য দায়ী কারা? দায়ী কিন্তু এই তরুণরা নয়। যে বড়রা এদের ঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন নি তারাই। কিন্তু সে আলোচনার জায়গা এটা নয়।

বর্ত্তমান সভ্যতাকে কতটা বিপন্ন এরা করে তুলতে পারবে? সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এদের সংখ্যা ও কতটা প্রভাব এরা বিস্তার করতে পারবে সমাজের উপর, এইতেই। মনে হয় এদের ক্ষতি করার ক্ষমতা খুব একটা নেই। কারণ এদের চিন্তার মূলে এমন কোন একটি নেতিবাদী দর্শন নেই, যা দীর্ঘদিন ধরে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবে। তাই এরা, যত সংখ্যাতেই হক বা মুষ্টিমেয় হক, তারা নিজেদের দগ্ধ করে অদূর ভবিষ্যতে ছাই হয়ে মিলিয়ে যাবে।

পৃথিবীবিখ্যাত মানবদরদী দার্শনিক চিকিৎসক ডঃ এলবার্ট সোয়াইটজার তাঁর সুবিখ্যাত বইটির, "Civilisation and Ethics" এর ভূমিকাতে বলেছেন, "The history of thought always written, merely as a history of Philosophical Systems, never as man's effort to arrive at a conception of the universe." সত্যি আমাদের চিন্তায় এই দিক থেকে একটা মারাত্মক গতানুগতিকতা থেকে গেছে। তার ফলে আমরা আবার ঠিক উল্টোদিক থেকেও একটা জিনিস করি। একটা বিশেষ খাতে ফেলা দার্শনিক চিন্তা বিশেষ করে যদি তার ঢক্কাবাদনটা একটু জোরালো হয়, তা হলে তারই মডেলে ফেলে, শুধু যে সবকিছু বুঝতেই চেষ্টা করি, তা নয়, কাণ্ডকর্ম, পৃথিবীকে দোহন পর্যন্ত চলে সেই ছকে। নেতিবাচক চিন্তা, ভাবনা ও দর্শনের বিপদটা এইখানেই।

সোয়াইটজারের কথার প্রতিধ্বনি করেই আবার আমরা বলতে পারি, যে সভ্যতার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল, মানুষকে আরো স্বাধীনতা দেয়া। কিন্তু তার বদলে কি হয়েছে, মানুষ বরং আরো দাসখত লিখে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ঠিক উপরে বলা ড্রাগএডিক্‌টদের কথাই যদি ধরি, তারা নিজেদের স্বাধীন করা তো দূরের কথা, অন্য বাঁধনের উপরে নেশা করার ড্রাগের বাঁধনে, নিজেদের নতুন দাসত্বে শৃঙ্খলিত করেছে। নাৎসীবাদের কথা বোধকরি আর বলার প্রয়োজন নেই। এমনকি যে কম্যুনিজমের পরম আশ্বাস হল, যে একদিন রাষ্ট্র পর্যন্ত মিলিয়ে যাবে ; কিন্তু তাও আসার আগে পর্যন্ত মানুষের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা আসবে না। এখানে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে, পার্থিব সম্পদ, সুখ স্বাচ্ছন্দই কিন্তু সভ্যতা নয়। ইতিহাসে অনেক সময় পার্থিব সুখ সম্পদের অধিকারী লোকেরা, এমন একটা মানসিকতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে যে তারই ফলে তাই হয়ে উঠেছে সত্য।

আমরা এখানে প্রতিটি ইতিবাচক, বা নেতিবাচক দর্শন বা চিন্তার কথা উল্লেখ করে ভার বৃদ্ধি করব না। তা হলে তো সুররিয়্যালিজমের বা আরো বহু ইজমের কথাই বলতে হয়। অথচ সেই দিক থেকে আমরা যদি বিশ্বের রূপ সম্পর্কে যে চিন্তা ও ধারণা মানুষ অর্জন করেছে ; তাতে দেখি যে তা দিয়ে অনেক কিছুই করেছি আমরা। প্রথমে ধরা যাক শক্তির রূপান্তরের কথা। এক ধরনের শক্তিকে অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়, এই ধারণাটিকে ভিত্তি করেই শিল্পবিপ্লব। আবার জড়বস্তুকে যে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, এই চিন্তার ফলাফল থেকে আনবিক শক্তি, আজও ভবিষ্যতের গর্ভে, অনেক সম্ভাবনা নিয়ে।

"The people of the earth, the family of man.
wanted to put up something proud to look at."

কার্ল স্যাণ্ডবার্গের সেই চিন্তাটি সমস্ত মানুষের চিন্তা হয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে দিনে দিনে, কত ধ্যান ধারণার ফসলে, যার মাধ্যমে আমরা জানবার চেষ্টা করেছি এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুর স্বরূপ। তবু আজ সমস্যা হয়ে উঠেছে, যা অর্জন করেছি, তা কি রাখতে পারব? পারব কি করে?

এই সব কথা বলতে গিয়ে মনে প্রশ্ন জাগছে, যা রাখার জন্য আমরা এত উদগ্রীব, সেই সভ্যতা কি? সমস্ত মানবজাতি এক, এই বিশ্বচিন্তায় যিনি জীবন

উৎসর্গ করেছেন সেই সোসাইটজার সভ্যতা সম্পর্কে বলেছেন, "What then is civilisation ? It is the sum total of all progress made by men and the individual man in every sphere of action and from every point of view, in so far as this progress help towards the spiritual perfecting of individuals as the progress of all progress." ইতিহাসের সুরু থেকে আজ পযন্ত মানুষ, যাকে সোয়াইটজার স্পিরিচুয়াল প্রগতি বলেছেন, তারই চেষ্টায় নিয়তই উদগ্রীব। অন্য বাংলা শব্দ ব্যবহার না করে স্পিরিচুয়্যাল কথাটি ব্যবহার করলাম। কারণ সংস্কৃত বা বাংলা শব্দ,এই বিষয়বস্তুর উপর কম নেই। কিন্তু সেই শব্দগুলিতে একটা সমস্যা। সেই কথাগুলির কোন কোনটি জাগতিক স্তর থেকে উঁচুতে, ঐশ্বরিক পর্যায়ের কাছাকাছি, আবার কোন কোন শব্দে মানসলোকের যে ঐশ্বর্যটুকু স্পিরিচুয়াল কথাটিতে আছে, তা যেন প্রকাশ করে না। প্রতিশব্দ হিসাবে আধ্যাত্মিক কথাটি প্রয়োগ করলে মনে হয় যেন বেশী উঁচুতে হয়ে গেল। আবার অন্য শব্দ নিচু হয়ে যায়। আমার ইচ্ছা হয় ঐশ্বর্যশীল কথাটি প্রয়োগ করে, বলতে ইচ্ছা করে ঐশ্বযশীল প্রগতি।

মানবজাতির, সামগ্রিক ঐশ্বর্যশীল প্রগতির কথাই সোয়াইটজার ভেবেছেন। এই চিন্তার মধ্যে যে একটা বিরাটত্বের মহাসাগরিক অনুভূতি রয়েছে, সেটা না রাখলে, এতবড় ব্যাপারের সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন দর্শনের কথা যখন আলোচনা করতে বসেছি, তখন সেই বিরাটত্ব যদি কোন দর্শনের কাছে আশা করতে হয়, তা হলে তা দেবার উপযুক্ততা থাকবে খুব অল্প দর্শনেরই বা দার্শনিকের। তবু ইউরোপীয় দর্শনের আলোচনা করতে বসলে, কয়েকটি নাম বাদ দেয়া অসম্ভব যেমন কান্ট, হেগেল, ডারউইন, মার্কস, আর রাসেল ও ডিউয়ি। তবে তার আগে এই অধ্যায়ের এতদূর পর্যন্ত যদি পাঠক এসে থাকেন, তা হলে তাঁর মনে যে প্রশ্নটি জাগা সম্ভব, সেই প্রশ্নটি আমি নিজেই তুলছি। প্রশ্নটি হল এই মানব সভ্যতা যদি বিপন্নই হয় ; আর তার কারণ যদি সম্পদের অভাব, শক্তির স্বল্পতা, ইত্যাদিই যদি কারণ হয় তা হলে দার্শনিকরা সে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন ? আমার মনে হয়, কেউ পারলে তারাই পারবেন। কেননা, অভাব যে যে জিনিসেরই হক, পুরো ব্যাপারটা আমাদের এ্যাটিচিউড বা দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত। কারণ পার্থিব সম্পদের সঠিক বা অপব্যবহার, দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই

ঘটেছে। আবার তার পরিবর্তনই হক আবার মেরামত বা সংস্কারই হক তাও সম্ভব দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে। দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করবেই তো দর্শন: তাই দর্শনের আলোচনা শুধু উপযুক্তই নয়, বরং তারও বেশী। এইজন্য এটিচিউড শব্দটির অনুবাদে যে দৃষ্টিভঙ্গী কথাটি খুবই উপযুক্ত মনে হয়।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, কাণ্ট ও তাঁর সমসাময়িক আদর্শবাদী দার্শনিকদের কথা বলতে গিয়ে বলছেন যে অষ্টাদশ শতাব্দির ইউরোপের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছিলেন লক, বার্কলে, হিউম প্রমুখ দার্শনিকরা। রাসেল বলছেন, এদের মনের মধ্যে এক সংশয়, দ্বন্দ্ব ছিল। এঁরা নিজেরা সামাজিক চেতনা সম্পন্ন হলেও তখনকার প্রচলিত চিন্তার ভাববাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়াও ছিল তাঁদের পক্ষে দুষ্কর।

তথাকথিত জার্মান আদর্শবাদ, যা এই দোটানাকে দূর করতে চেষ্টা করল, তার প্রথম পথিকৃৎ জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কাণ্ট। মানব স্বাধীনতার একজন প্রবক্তা ছিলেন কাণ্ট। তিনি বলেছেন যে, একজন মানুষকে যে অন্য একজন মানুষের ইচ্ছায় চলতে হয়, এর চেয়ে জঘন্য আর কি হতে পারে? কাণ্টের যে বিখ্যাত বইখানির নাম আজও পর্যন্ত সকলের জানা, সেটি হল ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "The Critique of Pure Reason." এই বইখানিতে তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন যে, যদিও অভিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে কোন জ্ঞানই নয়, তবু এর কতকটা অভিজ্ঞতার বাইরের; যা আমরা ধরে নিয়েছি। এই অংশটুকু যুক্তিশাস্ত্রের বাইরে। তিনি ভাগ করেছেন জ্ঞানকে: এর একটা দিক হল বিশ্লেষণমূলক, আর অন্যদিকটি সংশ্লেষ বা সংগঠনধর্মী। সংশ্লেষধর্মী জ্ঞান যে আমাদের অভিজ্ঞতাজাত, এটা মেনে নিতে কাণ্ট রাজি ছিলেন না।

পরস্পর বিরোধী দুটি চিন্তা বা ধারণা আমাদের মনে আছে। এর মধ্যে একটি বা অপরটি প্রমাণ করা যায়। কাণ্ট এন্টিমনি বা এই পরস্পর বিরোধী চিন্তার কথা তাঁর বইয়ে পর পর কয়েকটি থিসিসে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে কোনটি বস্তু, কোনটি সময়, আবার কোনটি কার্য কারণ সম্পর্কিত। এই এ্যান্টিমনিগুলি হেগেলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল ও তাঁর ডাইলেকটিকস কাণ্টের এ্যান্টিমনিজাত।

কাণ্টের পরিণত বয়সে লেখা আর একখানি বইয়ের কথা না বলাটা অন্যায় হবে। এটি হল ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Perpitual Peace' বইখানি।

এই বইয়ে তিনি চেয়েছেন পৃথিবী জুড়ে স্বাধীন দেশগুলির একটা ফেডারেশন। সেগুলি যুদ্ধ বিরোধী একটি সনদে মিলিত হবে। তার মতে যুক্তি হল সর্বতো-ভাবে যুদ্ধবিরোধী। তিনি আরো বলেন যে, দেশগুলিও হবে এক একটি রিপাবলিক, যা বলতে তিনি বুঝেছেন, শাসনযন্ত্র ও আইন সভার পারস্পরিক স্বাধীনতা। রাজার শাসনেও তার আপত্তি ছিল না। সাধারণতন্ত্র সম্পর্কেও তার বক্তব্য ছিল যে এ ও সার্বজনীন শাসন নয়, শুধু সংখ্যাধিক্যের শাসন।

কান্টের উত্তরসূরী হিসাবে দর্শনের ক্ষেত্রে এসে দেখা দিলেন হেগেল। হেগেলের বক্তব্য ছিল যে, যা কিছু বাস্তব তাই যুক্তি নির্ভর। কিন্তু অন্য দার্শনিকদের বাস্তব আর হেগেলের বাস্তব এক নয়। হেগেল অন্য সকলের থেকে ভিন্ন দুটি কারণে। এর মধ্যে একটি হল হেগেলের যুক্তি নির্ভরতা ও যুক্তি প্রীতি। আর একটি ডাইলেকটিক বা পরস্পর বিরোধিতা। ডাইলেকটিক সম্পর্কে একটু বিষদভাবে বলা উচিত। কাণ্ট সম্পর্কে আলোচনায় দেখলাম যে পরপর বিরোধী যুক্তি ও চিন্তাগুলির কথা; যেগুলিকে এ্যান্টিমনি বলা হয়েছে। হেগেল এই বৈপরীত্যের একটি দিককে বললেন থিসিস্ এর বিপরীতের নাম হল অ্যান্টীথিসিস। ডাইলেকটিক কথাটা কিন্তু মোটেই নতুন নয়। কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ যা থেকে ডায়ালগ (কথাবার্ত্তা অর্থে) শব্দটি এসেছে। সত্য জানবার জন্য গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিশ যাকেই দেখতেন, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন। কথাবার্ত্তা বলতে গেলেই একজন একটা কথা বলে। আর একজন হয়ত বলে ঠিক তার উল্টো। এমনি করে বিপরীত বক্তব্যের বাদানুবাদের মধ্যে দিয়েই সত্যে পৌছানো যায়। এই যে দুই বিরুদ্ধ বক্তব্য, এর একটিকে বলা হয় থিসিস অন্যটি এ্যান্টিথিসিস। আর এই দুটির বৈপরীত্যের মাধ্যমে যা বার হয়ে এলো, তাকে বলে সিন্থিসিস। তার মানে থিসিসঃ এ্যান্টীথিসিস : সিন্থিসিস, এই হল ডাইলেকটিক্সের মূল কথা। মার্কসের আলোচনায় আবার আমাদের এ প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হবে।

আবার হেগেলের কথায় ফিরে আসি। ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে হেগেল বলছেন, ইতিহাসের মূলে রয়েছে বস্তু নয়, ভাব। সেটাই ইতিহাসের চালিকা শক্তি। বস্তুর মূলে আকর্ষণ। আর ভাবের মূলে তার বিপরীত স্বাধীনতা। আকর্ষণ শব্দটি আবার হেগেল মাধ্যাকর্ষণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে হেগেলের শব্দের জটিলতার কথাটা বলি। দুরূহতার

জন্য হেগেলের খ্যাতি আছে। আবার সেটারও কারণ তাঁর বিশেষ শব্দ ব্যবহার। জার্মান ভাষা যারা একটুও চর্চা করেছে, তারা জানে যে এই ভাষায় যে, একেবারে সঠিক একটি মাত্র মানে হবে, এ রকম জার্মান শব্দ যেমন আছে, তেমনি গুরুগম্ভীর দ্ব্যর্থবোধক শব্দেও জার্মান ভাষা সমৃদ্ধ। ঠিক তেমনি এক দ্ব্যর্থক আত্মসম্পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই হেগেল বলেছেন। যার কথা বলতে গিয়ে রাসেল রসিকতা করে বলেছেন, যে এ এক সুপারফাইন স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতায় অভিসিক্তরাও কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে থেকে প্রাণ দিতে পারে। এ থেকেই বোঝা যায়, হেগেলের দ্ব্যর্থবোধক নেতিবাচকতাকে কাজে লাগাতে নাৎসী পুঙ্গবদের কোন অসুবিধাই হয় নি। সেদিক থেকে বরং শান্তি, বিশ্বরাষ্ট্র ইত্যাদি কথা বলে কান্টই নাৎসীদের একটু অসুবিধায়, ফেলেছিলেন।

জার্মান জাতির গৌরবের কথাও হেগেল বার বার বলেছেন। ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি যে জার্মান গৌরবগীতি গেয়েছেন, তা বোঝাবার জন্য রাসেল বলছেন যে, আমাদের মনে রাখতে হবে নেপোলিয়নের হাতে জার্মানীর অপমান। হেগেলের লেখা তারই সান্ত্বনা হিসাবে। রাষ্ট্রের কথা বলতে গিয়েও হেগেল বলছেন যে রাষ্ট্রই নীতির চূড়ান্ত কথা। যুক্তি-বাদী স্বাধীনতারও প্রতীক এই রাষ্ট্র। জার্মান কথাগুলো যে রকম জোরালো সে জোর বাংলায় আনা শক্ত, তাই পাঠককে হেগেলের মত জার্মান প্রফেসরদের খানিকটা আন্দাজ করে নিতে হবে।

নীতির কথা বলতে গিয়েও হেগেল লক্ষ্য আর পথ, এ দু'টিকে এক করে, জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। ঠিক যেমন জটিলতার উদ্ভব হয়েছে হেগেলের দর্শনে সত্যকে নিয়েও। হেগেলের মত অনুযায়ী সম্পূর্ণ না জানলে যে সত্যই জানা যাবে না, এ ধারণা রাসেল প্রমুখ দার্শনিকরা অস্বীকার করেছেন। কারণ তা হলে, রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেল যে কথা বলেছেন, তাই বা তিনি বললেন কি করে? কারণ মানব ইতিহাস তো আর শেষ হয়ে যায় নি, যে তার সম্পর্কে জানা পূর্ণ হওয়া সম্ভব?

যদিও একজন বিরাট দার্শনিক, তবু হেগেলেরও দু'দিকই আছে। তাই নেতিবাদী নাৎসীদের পক্ষেও হেগেলকে নিজেদের সুবিধা মত ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা হয় নি। আবার মার্কসও হেগেলের ডাইলেকটিকসটি নিলেন ও তাকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করলেন। কিন্তু হেগেলের দর্শনকে তিনি

শীর্ষাসন, অর্থাৎ পা উপরে আর মাথা নীচে, যাকে বলা যায় উল্টো করে ঝুলিয়ে দিলেন। কিন্তু তা থেকেও বার হয়ে এলো ইতিবাদ ও আশাবাদের দর্শন। মার্কসের আলোচনায় এলে, এ প্রসঙ্গে বিষদ ভাবে বলার সুযোগ হবে। কিন্তু তার আগে আমরা বিশেষ করে আলোচনা করছি এমন একজনের, যিনি জীব বিজ্ঞানী। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁর প্রভাব অসামান্য। দর্শনের বই মাত্রেই তাঁর কাজ ও কি তার প্রভাব, তার উল্লেখ অজস্র; তবু রাসেল পর্যন্ত তাঁর পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে, চার্লস ডারউইনের জন্য আলাদা কোন অধ্যায় করেন নি। কিন্তু অধ্যায়ভুক্ত অনেক দার্শনিক রাসেলের বইয়ে যতটা জায়গা পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশী জায়গা রাসেল ডারউইনকে দিয়েছেন। অবশ্য শুধু মাত্র সেটাই ডারউইনের প্রসংশাপত্র নয়।

বৃটেনে যেমন একদিন নিউটনের প্রভাব ছিল, তেমনি ছিল ডারউইনেরও, নিউটনের পরবর্তী যুগে। ডারউইন, বিবর্ত্তনবাদ বা থিয়োরি অফ ইভলিউসানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এ জন্য আমরা ডারউইন ও বিবর্ত্তন, এ দুটি কথা একেবারে এক নিঃশ্বাসে ব্যবহার করি। কিন্তু এই জৈবিক ক্রমোন্নতি গ্রীক দার্শনিকরা জানতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ফরাসীদেশ থেকে বুফোঁ ও লার্মাক ক্রমবিবর্ত্তনের কথা বলেছিলেন। তা ছাড়া ভূতত্ত্ববিদ জেমস হুটন ও উইলিয়াম স্মিথ, ভূগর্ভের স্তরে স্তরে, প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমানে যে ক্রমোন্নতি ঘটেছে, তার স্বাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে, ডারউইনের আবিষ্কারই সম্ভব হত না। স্মিথ দেখেছিলেন যে ভূগর্ভের নিচের স্তরে স্তরে, প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ শীলীভূত হয়ে থেকে গেছে। বিভিন্ন স্তরগু'ল, তারা কে কোন যুগের, তারই নির্দেশ দেয়। এটা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে সহজ ও সরল থেকে ক্রমশঃ জটিলতর উদ্ভিদ ও প্রাণীর ফসিলের দেখা মিলছে। আবার জলের প্রাণীদের পরে দেখা দিয়েছিল স্থলের প্রাণীরা।

বাইবেলে যে সৃষ্টির ইতিহাস, তা ঘা খেয়ে গেল এই আবিষ্কারে; দেখা গেল মাছ এসেছিল উভচর প্রাণীর আগে। সরিসৃপরা এলো তারপর। পরে এল পাখীরা ও স্তন্যপায়ী জীবের। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এমনি বিবর্ত্তনে এসেছে মানুষ। ভূস্তরের থেকেই দেখা যায়, কোন কোন প্রাণী ক্রমোন্নতি না হয়ে এখনো কোন মতে টিঁকে আছে, আর না হয় তো মিলিয়ে গেছে। আবার কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ, তার নিজস্ব ঢংয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করে এখন পৃথিবীতে রয়েছে।

বিবর্তনের কিছু প্রমাণ ভূগোল থেকে পাওয়া যায়। যেমন একদিন অস্ট্রেলিয়া এশিয়া ভূখণ্ডের সঙ্গে জোড়া ছিল' তখনকার কিছু প্রাণী যেমন কাঙারু জাতীয়, যাদের বিবর্তনে ঠিক স্তন্যপায়ীদের আগেই স্থান, তারা বিচ্ছিন্ন হবার পরও অস্ট্রেলিয়াতে টিকে আছে। বাচ্চা হবার পর, বাচ্চা খুব ছোট থাকে ও পেটের সামনে এদের একটি থলি থাকে। বাচ্চা সেই থলিতে থেকে বেড়ে ওঠে। এই প্রাণীদের বলে অঙ্কগর্ভ। এদের ক্ষেত্রে শরীরের ভিতরে জরায়ু তৈরি হবার আগের পর্যায়ে, পেটের সামনে একটা থলির মত তৈরি হয়। পৃথিবীর অন্য মহাদেশ থেকে, নানান চাপে এই অঙ্কগর্ভ প্রাণী লুপ্ত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে অনুরূপ চাপে না পড়ায় শুধু কাঙারু নয়, বহু জাতীয় অঙ্কগর্ভ প্রাণীই এই মহাদেশে বেঁচে রয়েছে। অঙ্কগর্ভ প্রাণী হিসাবে, এদের মধ্যে নানা বিবর্তনও ঘটেছে যেমন এখানে ইঁদুর বা শেয়ালের মত অঙ্কগর্ভ প্রাণীও সেখানে দেখা যায়।

এই ধরনের প্রাণীজগতের বিবর্তন ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ডারউইন, বিউগ্‌ল জাহাজে এক দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করেন। আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, একটি দ্বীপ গ্যালাপাগসেও তিনি দেখতে পান, এ রকম বহু প্রাণী, যা অন্য জায়গায় বিলুপ্ত। এইগুলি থেকে তিনি বিবর্তনের অনেক হদিশ পান।

প্রাণীর শরীর যখন মাতৃগর্ভে দুটি কোষের সমন্বয় থেকে, হয়ত একটি পূর্ণ মানবকে পরিণত হচ্ছে, তখন মাতৃগর্ভের মধ্যেই, প্রাণীরা হাজার হাজার বছরের বিবর্তনে যে পথ অতিক্রম করেছে, তা যেন একবার পুরানো পড়ার মত ঝালিয়ে নেয়। কারণ দেখা যায় ভ্রূণ অবস্থায়, মাছের মত কানকো দেখা দিয়ে, ভ্রূণ আরো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে যায়। ভৌগলিক ও ভূতাত্ত্বিক প্রমাণ ছাড়া, এটি হল বিবর্তনের শারীরবৃত্তিক প্রমাণ।

১৮৫৯ সালে ডারউইন তাঁর "The Origin of Specis by Means of Natural Selection" বইটি প্রকাশ করেন। এই বইখানিতে তিনি দেখান যে বিবর্তন ঘটছে চারটি উপায়ে। এ বইখানিকে মানব সংস্কৃতি ও চিন্তায় একটি স্তম্ভ বলে মনে করা হয়। এ জন্য এই বইখানি প্রকাশের শতবার্ষিকীও সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

যে চারটি উপায়ে প্রকৃতি বিবর্তন ঘটাচ্ছে, সেগুলি হল, জীবন সংগ্রাম

যাকে Struggle for Existance বলে, বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তন, উপযুক্তের জীবনাধিকার—Survival of the Fittest, ও প্রাকৃতিক নির্বাচন—Natural Selection.

জীবন সংগ্রাম, বাঁচার লড়াই যে প্রকৃতিতে অহরহ চলছে, এ তো চোখ মেললেই দেখা যায়। এমনকি যেখানে সূর্যের আলো কম, সেখানে প্রাপ্তব্য সূর্যের আলোটুকুর জন্য একাধিক গাছ, ডাল পাতা বাড়িয়ে সংগ্রামে লিপ্ত যেন সেই আলোটুকু পাবার জন্য। জীবন সংগ্রামে যাতে কিছু অন্ততঃ বেঁচে থেকে, প্রজাতীকে রক্ষা করে, সে জন্য গাছে অজস্র বীজ। আবার প্রাণীদের মধ্যে বিবর্ত্তনের নিচের ধাপে, তাদের বহু সন্ততি জন্মায়। সংগ্রামেরর এও একটা উপায়।

একই প্রজাতীর একটি প্রাণীর সঙ্গে আর একটি প্রাণীর তফাৎ থাকে দেহগত ও স্নায়ুগত। ঐ পরিবর্ত্তনগুলি আবার বংশানুক্রমে বাহিত হয়। এর মধ্যে যদি কোন পরিবর্ত্তন প্রজাতীর বাঁচার জন্য উপযুক্ত হয়, তাহলে তা সেই প্রাণীর প্রজাতীকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

উপরের প্যারাগ্রাফ থেকেই বোঝা যায়, যে প্রাণীদের মধ্যে বাঁচার লড়াইটা বেশী, সেখানে যার উপযুক্ততা বেশী, সেই যে বেঁচে থাকবে এটাই নিয়ম। যেমন যেখানে খুব লম্বা লম্বা গাছ, সেখানে অন্য তৃণভোজীদের তুলনায় লম্বা গলা জিরাফের বাঁচতে সুবিধা হবে। এই সুবিধাজনক চরিত্রটা আবার বংশ-পরম্পরায় অনুক্রমন হতে থাকবে।

আস্তে আস্তে প্রকৃতির সৃষ্ট পরিবেশও বদলাতে থাকে। এই পরিবর্ত্তিত পরিবেশে যে জীবের বাঁচার উপযুক্ততা আছে, তারাই কেবল বেঁচে থাকে। প্রকৃতি, যেন মনে হয় শুধু যারা ওই পরিবেশে বাঁচার উপযুক্ত, তাদেরই নির্বাচন করে, বেছে নিচ্ছে।

বর্ত্তমানের জীববিজ্ঞানে ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের থিয়োরির কিছু কিছু পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়েছে; জীববিদ্যায় যে নতুন জ্ঞান লাভ হয়েছে, তারই আলোয়। কিন্তু সে আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। স্বয়ং রাসেল ডারউইনের সম্পর্কে বলেছেন যে সপ্তদশ শতাব্দতে গ্যালিলিও আর নিউটন যেমন চিন্তা জগতের দিকপাল, উনবিংশ শতকে ডারউইনও তাই।

ডারউইনের বক্তব্য, যে প্রাণীদের মধ্যে পারস্পরিক ভিন্নতা যে আছে, এ

থেকে কেউ কেউ [illegible] উইলবারফোর্সের বক্তব্য যে [illegible], [illegible] ডারউইনের বক্তব্যের বিরোধিতা করতে চাইলেন। কিন্তু তাদের এ বিরোধিতা খুব বেশীদিন দানা বাঁধতে পারল না, ডারউইনের পূর্বসূরী লামার্কের মত। লামার্ক বলেছিলেন যে এক প্রজাতীয় প্রাণী মাত্রেই সমান। যে পরিবর্তন তাদের মধ্যে দেখা যায়, তা পরিবেশজাত ও সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টায়।

ডারউইনের আবিষ্কার থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে মানুষ ও পশু প্রাণীদের একই পূর্বপুরুষ। ভগবান স্বয়ং নিজেদের হাতে যে মানুষকে গড়েছেন, বাইবেলের কথাটি তার জোরটাই হারিয়ে ফেললে।

উদারনৈতিকরা প্রগতিতে বিশ্বাস করতেন। সেই ধারণা খুবই জোরালো হয়ে উঠল ডারউইনের বিবর্তনবাদের কল্যাণে। ডারউইন মার্কসকে প্রভাবিত করেন তা আমরা দেখতে পাব, মার্কসের সম্পর্কে আলোচনায়। কিন্তু একথা বললেই বোঝা যাবে মার্কস ডারউইনের কাছে ঋণ স্বীকার করতে, তাঁর বই-খানিও ডারউইনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন।

ডারউইনের বক্তব্যের সুযোগ আরো দুটি মতবাদের লোক নেবার চেষ্টা করতে লাগল। এদের একদল 'স্বাধীন প্রচেষ্টার' (Free Enterprise) পক্ষে ও অপর দল 'সমাজতন্ত্রবাদী'। সমাজতন্ত্র কথাটি প্রথম ব্যবহার হল আওয়েনের মতবাদে বিশ্বাসীদের উল্লেখ করে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। সব কিছুর মূল্য শ্রমজাত, তাই সব কিছুতেই শ্রমিকেরই অধিকার, এই ধরনের বক্তব্য আওয়েন ১৮১৭ সালে প্রচার করেন। তাই হক ডারউইনের আবিষ্কারের মত একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হাতের কাছে পেয়ে সোশালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রবাদীদের খুবই সুবিধা হল।

দেখা যাচ্ছে, এক বিশাল আকারের বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা আবিষ্কারের দার্শনিক প্রভাবও হয় খুব বিরাট আকারের। এটিই আমরা এবার দেখতে পাব, যেমন ডারউইনের প্রভাব দেখলাম, আওয়েনের পরবর্তী যুগে সমাজ-বাদীদের উপর। অনুরূপ কি আরো বেশী ডারউইনের প্রভাবই পড়ে কার্লমার্কসের উপরে।

মার্কস, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির ট্রিয়ার নগরে, ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাস, দর্শন, আইন [illegible] অধ্যয়ন করেন। তাঁর বন্ধু এঙ্গেলসের সহযোগিতায় তিনি, ১৮৪৮ [illegible]

কম্যুনিস্ট লীগের নেতা হিসাবে, কম্যুনিস্ট লীগের জন্য "কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো" রচনা করেন। ১৮৪৯ সালে বৈপ্লবিক কার্যকলাপের জন্য মার্কসের ইউরোপের কোন দেশেই আর ঠাঁই মিলল না। সেইজন্য ১৮৪৯ সাল থেকে তিনি লণ্ডনে বাস করতে সুরু করেন। তাঁর বন্ধু এঙ্গেলসের সহায়তা ছাড়া মার্কস বোধ হয় অর্থাভাবে ও অনাহারে, স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে মারা যেতেন। কিন্তু এই নিদারুণ দারিদ্র্য সত্ত্বেও মার্কস লণ্ডনেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম রচনা "ক্যাপিট্যাল" বইখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। কম্যুনিজম, মার্কসবাদী অর্থনীতির মহাভারত বলে এ বইটি আজও সারা পৃথিবীতে আদৃত।

ইতিহাসে মার্কস দেখলেন যে শ্রমবিভাগের ফলে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ গড়ে উঠল। যাদের হাতে উৎপাদনের ব্যবস্থা ও বিষয়গুলি রইল, তারা হয়ে উঠতে থাকল ধনী, ক্ষমতাশালী। তার ফলে শোষণক্ষমতা ও অন্য সর্ববিধক্ষমতা, জমা থাকল মুষ্টিমেয় লোক, সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর হাতে। ক্ষমতা এদের হাতে থাকার ফলে, বিনা পরিশ্রমে, অপরের পরিশ্রমে পরভোজী হিসাবে দিন কাটতে লাগল। তাতে, এরা থাকল আরামে, স্বাচ্ছন্দে। আর যারা পরিশ্রম করে উৎপাদন করতে লাগল, তারাই হল সকল সম্পদ, এবং স্বাচ্ছন্দ্যহীন শোষিত, অত্যাচারিত শ্রেণী।

মার্কস এও দেখলেন, যে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়, যাতে উৎপাদিত বস্তুও আর উৎপাদকের কাছে শিল্প নয়, তা তৈরি করে কোন আনন্দ নেই তাতে উৎপাদক ক্রমে ক্রমে তার শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। আবার ধন ও উৎপাদন যন্ত্র যার হাতে, তার থেকেও শ্রেণী হিসাবে সে বিচ্ছিন্ন। যার হাতে উৎপাদন যন্ত্র, সে ধনীশ্রেণীব আর উৎপাদক দরিদ্রশ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করেই এটা বোঝান যায়, এ যেন, "শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।"

হেগেল প্রসঙ্গের আলোচনায় বলেছি, যে মার্কস হেগেলের মত ডাইলেকটিক বা দ্বন্দ্ববাদের প্রয়োগ করেন। পাঠকের মনে পড়বে, গ্রীকরা যে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন, এ কথাও বলেছি। আরো মনে পড়বে, বলেছি, থিসিস এ্যান্টিথিসিস, এই দুই বিপরীত মতের সংঘাত বা কন্ট্রাডিকশানের ফলে সিন্থিসিসের মাধ্যমে মূল সত্য উদঘাটিত হয়। ইতিহাসের বিচারে হেগেল ডাইলেকটিকসের প্রয়োগ করেন। হেগেলের বিশ্বাস ছিল যে ইতিহাসের

ডাইলেকটিকস কাজ করে চিন্তার ক্ষেত্রে। তিনি বলেছিলেন যে ইতিহাসে আইডিয়ার পারস্পরিক সংঘাতই ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। হেগেলের মতে ইতিহাসের এই ডাইলেকটিকস হল যুদ্ধ। তাই হেগেল এও বলেছেন যে এই জন্যই যুদ্ধটা প্রয়োজন।

পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে হেগেলের আলোচনায় বলেছি যে মার্কস এসে হেগেলের ডাইলেকটিকস দর্শনের, মাথা নিচে, পা উপরে করে দিলেন। যেমন হেগেল বলেছিলেন যে ডাইলেকটিকসের ক্ষেত্র মানসলোক, চিন্তা বা আইডিয়ার জগৎ; মার্কস তাকে উল্টো করে বললেন যে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জগতের বস্তুতান্ত্রিক ডাইলেকটিকসই মানুষের মনে আইডিয়া বা চিন্তার জন্ম দেয়। হেগেলের ডাইলেকটিকস ছিল, ভাববাদী। আর মার্কসের ডাইলেকটিকসকে বলে ডাইলেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম বা বস্তুতান্ত্রিক দ্বন্দ্ববাদ।

মার্কস এই ডাইলেকটিকস সমাজ বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখালেন যে সামন্ততন্ত্র বিবর্তিত হয়েছে ধনতন্ত্রে। এখানে আবার যেন সেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের ছবি। যে ধনতন্ত্রের কথা বললাম, তারও আবার ডাইলেকটিক-সেই রূপান্তর ঘটবে। তার এ্যান্টিথিসিসের দিক হল এই সর্বহারা দরিদ্র মানুষ। প্রগতিশীল সংগ্রামী শ্রেণী হল সমাজের থিসিসের দিক। আর অব্যর্থ ডায়লেকটিকসের পরিণতিতে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের উদ্ভব ঘটবে। ডাইলেকটিকসের পরিণতি হিসাবেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যাবে। কারণ রাষ্ট্রই হল শাসক সম্প্রদায়ের শোষণের হাতিয়ার। এইভাবে মার্কস শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, সব রকমের অত্যাচারহীন, বিজ্ঞানচিন্তায় প্রতিষ্ঠিত, মানবসমাজের কথা বলেছেন। কোন কোন লেখক, "স্বপ্ন দেখেছেন" এই কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের যে দেখা, তাতে কোন স্বপ্ন নেই। পরীক্ষা করে বিজ্ঞান, যে ফলগুলি পায়, গ্রাফ পেপারে সেগুলি যখন আঁকা হয়, তখন যে রেখাচিত্রের উদ্ভব হয় তা বাড়িয়ে নিলে বোঝা যায়, ভবিষ্যতে সেই রেখা কোন দিকে যাবে। বিজ্ঞানের জগতে একে বলে ইনটারপোলেশান। মার্কস যা দেখেছেন ও করেছেন, তা স্বপ্ন নয়। তা হল ভবিষ্যতের দিকে ইনটারপোলেশান।

ইউরোপীয় দর্শনের কয়েকটি ধারা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এছাড়া আরো কিছু কিছু মননশীল চিন্তা ইউরোপের দর্শনে আছে, যা নিয়ে আমরা আলোচনা করি নি। যেমন রাসেল বা ভিটগেনস্টাইনের আলোচনা, বা সার্ত্রের

শতকের আদর্শবাদীদের কথা বললাম না। তার কারণ, আমরা এ গ্রন্থে, পরীক্ষা করে দেখতে চাই, মানব সভ্যতা বিপন্ন হলে তার কারণ? উদ্ধারের পথ আছে কি? কি সে পথ! এই প্রশ্নগুলিকে মাথায় রেখে, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র সবই খুঁজতে হচ্ছে। কাজে কাজেই, যা আমাদের প্রশ্নের উপর আলোকপাত করে না, তা আমরা আলোচনা করছি না।

এতক্ষণ আমরা ইউরোপীয় দর্শন নিয়েই আলোচনা করেছি। ভারতীয় দর্শনেরও হয়ত কিছু দেবার, কি না দেবারও তো দিক থাকতে পারে? সেটাও তো আলোচনা করা দরকার। অনেকে অবশ্য বলেন, ভারতীয় দর্শন নেতিবাদী। সবই মিথ্যা, সবই মায়া, এমনি একটা কথাই ভারতীয় দর্শনের বক্তব্য। এই যদি বক্তব্য হয়, আর এ বক্তব্যে বর্ত্তমান মানব সভ্যতা ধ্বংস হতে পারে, সেটা আমাদের পরীক্ষা করা দরকার। আবার যদি, যত নেতিবাচকই হক, এই দর্শন যদি সভ্যতার অবক্ষয়কে ঠেকাতে পারে, তা হলে এই দর্শনই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মোটের উপর আমাদের পরীক্ষা হওয়া চাই পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত।

ভারতীয় দর্শনের যে তথাকথিত 'ত্রিধারা, কথা বলা হয়ে থাকে, তার মধ্যে প্রথম ধারাটি হল বেদ থেকে সুরু করে, কি করতে হবে আর কি না হবে, তার বিধি, বিধান, বিচার, ইত্যাদি হল প্রথম ধারা। এ গুলিকে বলা হত 'ব্রাহ্মণ'। এগুলি সূত্রাকারে রচিত। এই 'ব্রাহ্মণ' সূত্রগুলির উপর বহু দার্শনিক আলোচনা ও বিচার আছে। এই সূত্রগ্রন্থকে মীমাংসাসূত্র বা পূর্বমীমাংসা সূত্র। এই ধারা থেকেই স্মৃতিগ্রন্থগুলি, যেমন মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতি গ্রন্থ হয়েছে। বলাবাহুল্য এ গুলিতে দর্শন ছাড়া আরো অনেক কিছুই ঢুকে গিয়েছে। তাই বেশীর ভাগ লোকের কাছে, ভারতীয় দর্শন বলতে এ গ্রন্থগুলি বোঝায় না।

ভারতীয় দর্শনের যে মূল ধারা, উপনিষদগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা হল 'বেদান্তসূত্র'। দর্শনের সত্যকার আলোচনার যে পরিণতি, তা পাওয়া যাবে এখানে। এগুলি মূল, নতুন দর্শন কিছু নয়। এগুলি মূল বেদান্ত সূত্রেরই বহুবিধ ভাষ্য। কিন্তু ভাষ্যগুলিই পল্লবিত হয়ে নতুন চিন্তা হয়ে উঠেছে। শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, বল্লভ, এমনি অনেকের দার্শনিক চিন্তা, এই বেদান্তদর্শনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভারতীয় দর্শন বলতে লোকে এইটি বোঝে। এই মূল ধারা ছাড়া, কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ এদের প্রবর্ত্তিত চিন্তাধারাও আছে।

যদিও ধারা তিনটিই, কিন্তু ভারতীয় দর্শনকে ছটি মূল দর্শন, তথা কথিত ষড়দর্শন বলে অভিহিত করা হয়। এগুলির রচয়িতা আবার এক একজন ঋষি, বলে ধরা হয়। যেমন, মীমাংসাদর্শন—জৈমিনির ; বেদান্তদর্শন—ব্যাসের ; সাংখ্য কপিলের ; যোগদর্শন—পতঞ্জলির ; ন্যায়দর্শন—গৌতমের ; বৈশেষিকদর্শন—কণাদের।

বলা যায়, সব ভারতীয় দর্শনেই মোটামুটিভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হল, জীব, জগৎ ও পদার্থ। এদের আলোচনা করতে গেলে প্রমাণ ব্যবহার করতে হয়, সে জন্য এদের বলে প্রমেয়। আর বিচার করে, যা অন্য যে উপায়ে এ সব জানা যাচ্ছে তাকেই বলে প্রমাণ। আবার প্রমেয় ও প্রমাণ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ওঠে। এতেই দর্শন পুষ্ট হতে থাকে। তেমনি জগৎ, পরমাত্মা এ সব নিয়ে কত প্রশ্নই উঠতে পারে।

প্রমাণ সম্পর্কিত আলোচনায়, ভারতীয় দর্শনে বহু চিন্তা ভাবনা করা হয়েছে। তাই তার কথা কিছুটা বলে না নিলে, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে যে এক কথায় নেতিবাদী, মায়াবাদী, হতাশাবাদী ইত্যাদি কথা যে বলা হয়, তার অসারত্ব বোঝা যাবে না।

ভারতীয় দর্শন মনে করে, জ্ঞান লাভের উপায় দুটি, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা যা জানি, তাই হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যেমন মেঘের ডাক শুনলাম, চাঁদ ওঠা দেখলাম, গোলাপের গন্ধ ভাল লাগল, চিনির স্বাদ পেলাম, শিশুটির গায়ে হাত দিয়ে আদর করলাম, এই সব কিছুরই মাধ্যমে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয়। এগুলি হয় আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। আবার আমাদের দুঃখ, আনন্দ, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, এ গুলির বোধও আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ভারতীয় দর্শনের মত হল, এই সব প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে আমরা পাই যাকে বলে "ব্যাপ্তি জ্ঞান।" যেমন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যে দেখে আসছি, ছেলেবেলা থেকে যে যেখানেই ধোঁয়া সেখানেই আগুন থাকে। তা থেকে একটা ধারণাও করে নিয়েছে যে ধোঁয়া থাকলে আগুনও থাকবে। আগুন ছাড়া ধোঁয়া থাকতে পারে না। এই ধরনের যে জ্ঞান, তাকে বলে অনুমান।

এই অনুমান ও প্রমাণ নিয়ে ভারতে দার্শনিক বিতর্ক বহুকালের। এমনকি আস্তিক দর্শন ও নাস্তিক দর্শনে বিভেদের, এটাও একটা কারণ বলা যায়।

চার্বাকের মত ছিল যে যা দেখছি না অপ্রত্যক্ষ, তা নেই। এর উত্তরে আবার চার্বাকের বিরুদ্ধবাদীরা বললেন যে ঋষি চার্বাককে তো একটু ঘুরে গেলেই আর দেখা যাচ্ছে না, তা হলে কি তিনি তখন নেই? তখন কি তা হলে চার্বাক পত্নী বিধবা?

আবার অন্য নাস্তিক দার্শনিকরা, যেমন বৌদ্ধরা, অনুমান ও প্রমাণ স্বীকার করেছেন। নাস্তিক দার্শনিক বলতে তাদেরই বোঝায়, যারা বেদে বিশ্বাসী নন। যাই হক যে বৌদ্ধদের কথা বলছিলাম, তাঁরা অনুমান ও প্রমাণ স্বীকার করেও বললেন যে এই কি যথেষ্ট? কিছু কিছু জ্ঞান তো প্রত্যক্ষ বা অনুমানেও লাভ করা যায় না, তা হয়ত এতদিন আগের ব্যাপার, যে একমাত্র উপযুক্ত ইতিহাস লেখকের লেখা বা কথাই সেখানে জ্ঞানের একমাত্র পথ। একে বলা হয়েছে "শব্দ" প্রমাণ।

এ ছাড়াও অন্য প্রমাণ আছে। যেখানে ফলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি: যেমন হয়ত একজনকে খেতে দেখছি না, কিন্তু তার শরীর মোটাসোটা হচ্ছে, এটা দেখতে পাচ্ছি। এ থেকে বুঝতে পারি যে এ নিশ্চয়, আমরা যখন দেখছি না, তখন খাচ্ছে। এর নাম দেয়া হয়েছে "অর্থাপত্তি"। আবার আমি যদি কাঞ্চনজঙ্ঘা না দেখে থাকি, শুধুই শোনা বা ছবি দেখা, এ সব থেকে জ্ঞানও হয়, তা হবে অনুপলব্ধি। এইভাবে ভারতীয় দর্শনে প্রমাণ হল, ছ রকমের: প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, উপমান আর অনুপলব্ধি।

ভারতীয় দর্শনের লজিক বা যুক্তিবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতেই হল। কারণ বেদান্ত দর্শনের শঙ্করভাষ্য নিয়ে কথা বলতে গেলে, অনেকেই—শঙ্কর তো সব কিছুই মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছেন—এই রকম বলে শঙ্কর ও অদ্বৈত বেদান্ত, এক কথায় উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন। মায়াবাদের যাই হক, শঙ্করের যুক্তি শাস্ত্র ও দর্শনের কোন তুলনা, সারা বিশ্বে আছে কি না সন্দেহ। যখন শঙ্করের আলোচনা, তখন আরো অনেক কথা উঠবে। তবু শঙ্করের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, অল্প পরিসরে সম্ভব নয় বলেই পাঠককে সাবধানবাণী হিসাবে কথাগুলি বললাম।

প্রথমেই শঙ্করের অদ্বৈত দর্শনের কথা দিয়ে সুরু করি। অদ্বৈত দর্শনকেই মায়াবাদ বলে। শঙ্কর কেরল দেশে ব্রাহ্মণবংশে জন্মেছিলেন। অনেক বিতর্কের পর শঙ্করের জীবনকাল ৭৮৮ ও ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ এই বত্রিশ বছর বলে ধরা হয়। কিন্তু এই বত্রিশ বছরে তিনি চিন্তার জগতে যা দিয়ে গেছেন, তার তুলনা

সারা পৃথিবীতে খুব কম। যেমন অসাধারণ ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, তেমনিই বিচারশক্তি।

শঙ্করের জীবনের প্রধানতম কাজ, তাঁর বেদান্তসূত্রের ভাষ্য। তা ছাড়া গীতা ও আর কয়েকটি উপনিষদের ভাষ্যও তিনি রচনা করেছিলেন।

অদ্বৈত দর্শনে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মই অদ্বিতীয় ও একমাত্র সত্য। জগৎ, জীব সব মিথ্যা অধ্যাস,—যাকে ইংরাজীতে বলে illusion—মাত্র। আর এই, ধারণা মায়ার জন্য। দৃশ্যমান জগৎ, জীব পরমার্থিক সত্য নয়। তা স্বপ্নের মত মনোজগতেরই শুধু, তাই মিথ্যা। এর প্রমাণ হিসাবে শঙ্কর প্রয়োগ করছেন "শব্দ" প্রমাণ। তিনি ব্যবহার করছেন উপনিষদের বাক্য।

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপে প্রকাশ করবার জন্য, ব্রহ্মকে "একোমেবাদ্বিতীয়ম্‌," অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। আবার অন্য জায়গায় বলা হয়েছে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম," অর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্ম। যুক্তির ধাপে ধাপে শঙ্কর এগিয়েছেন। যেমন তিনি ব্যক্তি আর জাতির মধ্যে তফাৎ করে বলেছেন এক ব্যক্তির মৃত্যু হলেই মানব জাতির মৃত্যু হয় না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে যা সত্য, জাতির পক্ষে তা মিথ্যা। এমনি ক্ষুদ্র সত্য, বৃহৎ সত্যের কাছে মিথ্যা মাত্র। সুতরাং এমনি ভাবেই ক্ষুদ্রতর সত্তা, মিথ্যা হয়ে যায় বৃহৎ সত্তা, ব্রহ্মের কাছে। কাজে কাজেই সেই ব্রহ্মই সনাতন সত্য। আর সবই অনিত্য, কাল্পনিক, মায়াজাত। একন্য অসত্য। নদীগুলি সমুদ্রে গিয়ে তাদের নিজেদের নাম-রূপ হারিয়ে সমুদ্রই হয়ে যায়, তেমনি বিশ্ব চরাচর ব্রহ্মে নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলে। তাই ব্রহ্মকে জানলে পদার্থগুলির অস্তিত্ব যে মিথ্যা, তা বোঝা যায়।

তা হলে আমরা যে এই বাস্তব জগৎ, দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি এ সব সম্ভব হচ্ছে কি করে? অদ্বৈত বেদান্ত বলছে, এ সবই "মায়া"। যুক্তির দিক থেকে এই মায়াকে নিয়েও সমস্যা। কারণ মায়ার যদি একটা পৃথক সত্তা থাকে তা হলে তো ব্রহ্ম ছাড়া আরো একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়া হল। তা হলে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য একটি সত্যকে মানা হল। সে ক্ষেত্রে তো ব্রহ্ম আর অদ্বিতীয় থাকে না। আবার যদি মায়াই মিথ্যা হয়, তা হলে বলতে হবে, এই মিথ্যা বস্তু থেকেই জগৎ প্রতীতি হচ্ছে। তা হলে যা নেই, তাই থেকেই একটা কিছু ঘটছে। এর উত্তরও শঙ্করই দিয়েছেন। তিনি বলছেন, মায়া সৎও নয়,

অসৎও নয়, মায়া অনির্বচনীয়। তিনি আরো একটি শব্দ নির্বাচন করে প্রয়োগ করলেন, 'সদসদনির্বচনীয়'—যা ভাষার অতীত।

অনেকের হয়ত মনে হবে, যে এ রকম একটা চিন্তনের জন্য শঙ্করকে কেন এত বড় বলা হয়? আর এ থেকে কি সুবিধাই বা হল যুক্তির জগতে? এর উত্তর দিতে গেলে, গণিতের কিছু কিছু ধারণা বা কনসেপ্টের কথা বলতে হয়; যেমন শূন্য, বিয়োগাত্মক সংখ্যা, ইনফিনিটি বা অসীম। এগুলি নিছক চিন্তার জগতের ব্যাপার কিন্তু এই কনসেপ্টগুলি গণিত চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। মায়া থাক বা নাই থাক তার 'সদসদনির্বচনীয়'তা, চিন্তার জগতে এ এক নতুন পদক্ষেপ।

তার পরের প্রশ্ন ওঠে যে ব্রহ্মে সব কিছু তাদের স্বাতন্ত্র হারিয়ে বিলীন, তারই বা বিশেষত্ব কি? গুণই বা কি? শঙ্কর বলছেন, ব্রহ্মের কোন বিশেষত্ব নেই। ও তা নির্গুণ। গরু থেকে আমরা ঘোড়াকে আলাদা করতে পারি তার অশ্বত্ব বা অনুরূপ কিছু দিয়ে। কিন্তু ব্রহ্মের বেলায় তা করা হবে কি করে; যদি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্বই না থাকে। আর গুণের কথা: সব গুণেরই আধার যদি ব্রহ্মই, তা হলে কোন গুণেই বা তাকে পৃথক করা যাবে? বহুত্ব শুধু বা 'অল্প', তারই ধর্ম। ব্রহ্মের 'ভূমায়' কোন বহুত্ব, বিভিন্নতা ইত্যাদি নেই। তবে যতক্ষণ জ্ঞাতার জ্ঞান হয় নি, ততক্ষণ সে ভিন্ন। কিন্তু জ্ঞান হলে কোন তফাৎ থাকে না। তখনই বলা হয় 'তত্ত্বমসি—তুমিই সেই।

শঙ্করের মায়াবাদ ও বৌদ্ধদের শূন্যবাদের মধ্যে কিছুটা মিল আছে। শূন্যবাদে মনে করা হয় সবই শূন্য। যেমন মায়াবাদে ব্রহ্ম ছাড়া, আর সবই কিছুই কিছু নয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শঙ্করের যে দিক্‌বিজয়, তার প্রভাব আজও পর্যন্ত এত বেশী, যে আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবী মনে করে যে ভারতীয় চিন্তা বলতে মায়াবাদ। একথা আমরা এর আগেও বলেছি। তারপর এখন তো অদ্বৈতবাদের সামান্য আলোচনা করাও হল। এবার আমাদের বিষয়ের কেন্দ্রে ফিরে আসি। এই দর্শন কতটা নেতিবাদী? আর এই ধরনের দর্শনে কি সভ্যতা বিপন্ন হতে পারে?

সভ্যতা যখন গড়ে উঠছে, তখন যদি সারা দেশ জুড়ে অদ্বৈতবাদের মতবাদ ও শঙ্করের প্রভাব শুধু একমাত্র শক্তি হয়ে ওঠে, তা হলে কর্মপ্রেরণা হ্রাস পাবে, এ কথা বলাই বাহুল্য কিন্তু স্বয়ং শঙ্করের কালেও কি কুমারিল, রামানুজ

প্রভৃতি দার্শনিকদের মতবাদ ও বিতর্ক খুব বড় হয়ে ওঠে। রামানুজ একাদশ শতকের। ইনিও ছিলেন শঙ্করবিরোধী। এর দর্শনের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। শঙ্করের মতে, কেবল ব্রহ্মই সত্য আর সব মায়া। রামানুজের মত হল, ব্রহ্ম সত্য একথা ঠিকই; কিন্তু ব্রহ্ম মোটেই নির্গুণ নয়। ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণ গুণের আধার। ব্রহ্মের মধ্যে কোন অকল্যাণ, কোন ঈর্ষা, দ্বেষ, ইত্যাদি নেতিবাচক গুণ নেই। কিন্তু সব ইতিবাচক গুণেরই আধার ব্রহ্ম। এই গুণ দিয়েই তাকে বিশিষ্ট করা যায়। কিন্তু তবুও ব্রহ্ম অদ্বৈত। সেই জন্যই তা বিশিষ্টাদ্বৈত। জীব আর জগৎও সেই ব্রহ্মেরই গুণ। জীব, পৃথিবী, ইত্যাদিতেই তা থাকে। যেমন একটি বাঁশী থেকেই কত স্বর বার হয়। অথচ বাঁশী একটি। এ বিশ্বের সব বাঁশীরই মত, কিন্তু প্রত্যেকটি এক একটি রন্ধ্র। যেমন সূর্যের তাপ সূর্য নয়, আবার তা থেকে আলাদাও নয়, তা যেমন সূর্যের গুণ, তেমনি এই জগৎ। এই জীব, ব্রহ্মেরই বিশিষ্ট গুণ।

কি গভীর কল্যাণধর্মী ইতিবাদে শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে অভিসিক্ত করেছেন রামানুজ। এমনি ভারতের দর্শনের ইতিহাসে দেখা যাবে, যে শুধু নেতিবাদের নয়, তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ইতিবাদও মিলেমিশে থেকেছে। এইভাবে একটা দার্শনিক সমন্বয়, ভারতের মাটিতে চিরদিন হয়ে এসেছে। গীতা, ভারতের ধর্ম ও দর্শনের একটি অপূর্ব সমন্বয়সূচক গ্রন্থ। গীতা একদিকে কর্মযোগের প্রবক্তা, আবার অন্যদিকে বেদান্তের সারমর্মও গীতায় পাওয়া যাবে।

ভারতের অন্য দু একটি দর্শন সম্পর্কেও এই প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলে নিয়ে, তারপর একটা পূর্বাপর আলোচনা করব। দুঃখ আর দুঃখমোচনের চেষ্টা যেমন দেখি বৌদ্ধ দর্শনে, সেই দুঃখের স্বীকৃতি সাংখ্যের মূল বক্তব্য। তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখ মোচনের উপায়। সাংখ্য এই রকম পঁচিশটি তত্ত্বের সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছে। সাংখ্যের মতবাদ থেকেই আমরা পুরুষ ও প্রকৃতির কথা পাই। পুরুষ ভোক্তা, কিন্তু কর্তা নয়। সকল তত্ত্বের মূল প্রকৃতি। জগতের মূল উপাদানও প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ, এই তিন গুণের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি। এর কোন একটিরও ইতর বিশেষ ঘটলে প্রকৃতিতে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেই বিক্ষোভই জগৎ সৃষ্টির মূলে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেই পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত। মুক্তির পথ এই।

যদিও যোগ দর্শনকে ঠিক দর্শন বলা যায় কি না, এ প্রশ্ন অনেকে তুলেছেন,

তবু ভারতে যোগের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। আবার যোগ যে যোগ-শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্ত এ কথা সকলেই মেনে নিয়েছে। চিত্তের বৃত্তিগুলির পূর্ণ নিরুদ্ধ অবস্থাকেই বলে সমাধি। সমাধিলাভের উপায়, তপঃ, স্বাধ্যায় ও তার অঙ্গগুলির কথা, যেমন যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আটটি যোগের পর পর ধাপগুলি। ভারতে যোগ সাহিত্য খুব বিশাল। যোগের মাধ্যমে বিবিধ ঐশ্বর্য ও বিভূতি-লাভও ঘটা সম্ভব। যদিও যোগ ও যোগলব্ধ আত্মারতিকে ভারতে উঁচু আসন দেওয়া হয়েছে, তবু একথা ঠিকই যে যোগ দর্শন, দর্শন হিসেবে এমন একটা কিছু নয়, যা মানসলোককে আলোকিত করে। তবে একথাও আবার ঠিক, যে ভারতের সব দর্শনগুলিরই কিছু কিছু মিলেমিশে ভারতের মানস জগতকে প্রভাবিত করছে। তাই একজন ভারতীয় জন্মান্তরবাদ, কর্মফল, নির্বানমুখীনতা, ত্রিগুণচর্চা পুরুষ-প্রকৃতিবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন চিন্তার প্রভাবে প্রভাবিত। বিভিন্ন লোকের কাছে, এই পাঁচমিশালি ওষুধের এক আধটি মূল জিনিসের তারতম্য হয়ে আছে, কিন্তু ওষুধের ফর্মুলাটা এক।

ফর্মুলাটা একটা মিশ্র বা যৌগিক ফর্মুলা হওয়াতে আমাদের আলোচনার সুবিধা। একটি পরিণত সভ্যতাকে এই রকমের দার্শনিক চিন্তা কি করতে পারে? এর ইতিবাদী বা নেতিবাদী প্রভাব কতটা? আমরা আবার আমাদের পূর্বপ্রস্তাবিত, পদার্থ বিজ্ঞানসম্মত, থারমোডাইনামিক মডেলে পরীক্ষা করে দেখি। ভারতীয় দৃষ্টিতে মায়াবাদের প্রভাব খানিকটা থাকবেই। তাই কাজকর্ম খানিকটা ঢিমেতালেই চলবে। সে কাজ, খনি থেকে কয়লা তোলাই হক, আর স্টিল প্রকল্পই হক। ইউরোপীয় প্রভাব বাদ দিয়ে, একটা মারাত্মক বেশী গ্রোথরেট বজায় রেখে, চলবার চেষ্টা ভারতের দর্শনে নেই। তাই এনট্রপির ক্ষেত্রে কি হবে? ছুটোছুটি, ভাঙাভাঙি, কারনেস ইত্যাদিকে তিন শিফ্‌টে চালিয়ে, আনবিক বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে, এনট্রপি বেশী না করে, তারা হয়ত কমেই রাখবে। পাঠক দেখেছেন ঠিক এই সুপারিশই আজ ক্লাব অফ রোম থেকে সুরু করে, পৃথিবীর সব বিশেষজ্ঞরাই করেছেন। আমাদের উপনিষদের সেই "তেন ত্যক্তেন" আজ সবার মনে।

ভারতীয় দর্শনে শুধু কি এই মায়াবাদ? ভারতীয় চিন্তা অনেকখানিই তো মানবতাবাদ। পাঠকের মনে পড়বে, এই অধ্যায়েই আমরা রামানুজের

আলোচনায় তা দেখেছি। যেখানে পরমতম কল্যাণ হিসাবে ব্রহ্মের কল্পনা করা হয়েছে।

তা ছাড়া বৈষ্ণব দর্শন? সমগ্র বৈষ্ণব দর্শন তো মানব প্রেমেরই দর্শন, শ্রীচৈতন্য তো সেই প্রেমেরই প্রতীক। যে দর্শনে, যে চিন্তায় প্রেম, প্রীতি, প্রত্যয়, তাকে বোধ হয় নেতিবাদী বলা যাবে না। কারণ মানব সভ্যতাকে বাঁচতে হলেও প্রেম, প্রীতি, প্রত্যয়ের উপরেই ভিত্তি করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে, ব্যক্তিগতভাবে শোনা, নোবেল পুরস্কারে অভিষিক্ত, আনবিক বিজ্ঞানী, ডাঃ আর্থার হোলি কম্পটনের একটি কথা মনে পড়ছে। পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে যখন ভারতের বিবিধ প্রকল্প সুরু হতে যাচ্ছে তখন তিনি ভারতে এসেছিলেন। আমেরিকায় ফিরে একদিন এক ঘরোয়া সভায় তিনি বললেন, যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তাঁর বহুবারই দেখা হয়েছে। একবার কথা প্রসঙ্গে কম্পটন "God" কথাটি উচ্চারণ করা মাত্র, নেহেরু হেসে প্রশ্ন করলেন, "What is God?" কম্পটন বললেন, আমি তখন বললাম, "Suppose it is the Highest Good for Mankind". কম্পটন বললেন, ভগবানের এই সংজ্ঞায় নেহেরু খুশি হলেন। দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক পৃথিবীতে একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক, আর ভারতের এক প্রধানমন্ত্রী, ঈশ্বর ও মানব-কল্যাণকে একাত্ম করে দেখেছেন।

"তেন তক্তেন" এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছি এর আগের এক প্যারাগ্রাফে। পাঠক বুঝতেই পারছেন, ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে এ শব্দ দুটি আছে,

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম॥

একটু লক্ষ্য করে দেখা যাক, কেন এই শ্লোকটি? আর কি হতে পারে এর তাৎপর্য? ঈশা বলতে বোঝায়, যে সকল কিছুর উপরে। কি যার কাছে সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রন। বাস্য কথাটির অর্থ হল আচ্ছাদিত; যা থেকে আমাদের "বসন" কথাটি এসেছে। ইদং সর্বং কথা দুটির মানে হল, এই সমস্ত। কিন্তু এখানে "এই" কথাটিও খুব ব্যাপক অর্থে, যেমন ব্যাপক অর্থে "সমস্ত"। হয়ত "এই সমস্ত" কথা দুটি দিয়ে ব্যাপকতম অর্থে সব কিছুকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, যাতে সমস্ত মহাবিশ্ব বিধৃত হতে পারে। যৎ কিঞ্চ কথা দুটির অর্থে, যৎ কিঞ্চিত কি যা কিছু। এখানে যে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এ দুটি

শব্দ, আগের শব্দগুলির তুলনায় ক্ষুদ্র বস্তুবাচক শব্দ। কেন, এটা বোঝা যাবে জগৎ কথাটা লক্ষ্য করলে। জগৎ বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের এই চরাচর। এর অর্থ করতে গিয়ে অনেকে বলেছেন, যে যৎ কিঞ্চ দিয়ে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, অনিত্য বিশ্বজগৎকে। এর আগে আর একটি শব্দ রয়েছে জগত্যাং। জগত্যাং জগৎ বলতে হয়ত বলতে চাওয়া হয়েছে। মহাজগতের জগৎ; অর্থাৎ মহা-জগতের মধ্যে আমাদের জগৎটুকুকে। তেন কথাটি এবার; তেন ত্যক্তেন, কথাটার আক্ষরিক মানে করলে বোঝায়, তাঁর দ্বারা পরিত্যক্ত। হয়ত এই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে সেই নিয়ন্তা, সব কিছু আবৃত করেও, যা তাঁর দ্বারা ত্যক্ত, তাই ভুঞ্জীথা, অর্থাৎ পালন কর। কেউ বলবেন ভুঞ্জ কথাটির মানে তো ভোগ করা। কথাটির মানে কিন্তু পালন করা। তবে, আত্মাকে পালন করা, মানেই তো ভোগ করা। মা গৃধঃ এ শব্দ দুটির মধ্যে মা কথাটির অর্থ হল করো না। আর গৃধঃ শব্দটি গৃধ্র শব্দ, যার মানে হল শকুনি, সেই শব্দটি থেকেই উদ্ভব। এর মানে হল শকুনির মত হয়ো না; অর্থাৎ লোভী হয়ো না। কিসের সম্বন্ধে লোভী না হতে বলা হচ্ছে? এর পর আছে তিনটি মাত্র কথা; কস্য। স্বিৎ আর ধনম। কস্য মানে হল কারুর, অর্থাৎ অন্য কারুর। স্বিৎ শব্দটির অর্থ নিজের। তার মানে হল নিজের বা পরের ধন এর কিছুর উপর লোভ করো না।

তা হলে সম্পূর্ণ অর্থটা এই দাঁড়াল: যে বিশ্বনিয়ন্তা মহাবিশ্বের সব কিছু আচ্ছাদন করে আছেন, তা এ জগৎ ও তার বাইরের মহাজগৎ অবধিই আবৃত করেও যা তার দ্বারা ত্যক্ত, তাই দিয়ে আত্মাকে পালন কর। নিজের হক, আর অন্যেরই হক, সম্পদে লোভ করো না। সম্পদ আহরণে নির্লোভ মনোবৃত্তি অনুশীলন করতে উপনিষদের ঋষি কেন যে বলেছিলেন তা জানি না। ঋষিরা ত্রিকালদর্শী ছিলেন, তাই আমাদের সামনে আজ সভ্যতার সঙ্কট হয়ে, যে সব সমস্যা দেখা দেবে, সব তাঁরা ধ্যানদৃষ্টিতে দেখে, ওই রকম কথাবার্তা বলে বা লিখে গিয়েছেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বা বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। কিন্তু একটা কথা ঠিক। এই সব অসাধারণ বুদ্ধিমান মানুষদের বিমূর্ত বা এ্যাবষ্ট্রাক্ট চিন্তায় ছিল অসাধারণ গভীরতা। লুপ্ত হবার সব অবকাশ সত্ত্বেও তাই আজও সেগুলির অনেক কিছু বেঁচে আছে। যা সময় উত্তীর্ণ হয়ে ক্লাসিক হয়েছে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমরা তা দূর করে ফেলে দিতে পারি না। তার দিকে আমাদের তাকাতে হবে, আজকের পুরো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় ইতিবাদী ও নেতিবাদী দর্শনগুলির মধ্যে যেগুলি, আমাদের বিষয়বস্তুর পক্ষে প্রয়োজন শুধু সেইগুলির উপর কিছু আলোকপাত করলাম। ভারতীয় দর্শনের আলোচনায়, বিশেষ করে, ঈশোপনিষদের একটি শ্লোক তুলে দীর্ঘ আলোচনা করেছি বলে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, যে ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে লেখকের কোন দুর্বলতা আছে। বরং ঠিক উল্টো। কোন দর্শনই আজ আগেকার দৃষ্টিতে দেখা চলে না। দর্শনই হক, আর ইতিহাসই হক, আজ তার গঠন, পাঠন, চর্চা ইত্যাদি সবই হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। কোন কোন দেশে তা হতে সুরুও হয়েছে।

ভারতীয় ও ইউরোপীয় দর্শনের কথায়, আর একজনের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি। ইনি প্রয়াত কম্যুনিষ্ট নেতা ভবানী সেন। একদিন ছোট একটি সভায় মার্কসীয় দর্শন ও অন্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি বললেন, মার্কসীয় দর্শন ত্রুটিহীন বৈজ্ঞানিক মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞানের সাহায্যে, বিষয়বস্তুকে উদ্ঘাটন করেছে; এর সঙ্গে তুলনীয় যুক্তিবিজ্ঞান শুধুমাত্র শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তেই পাওয়া যায়। এই মানের যুক্তিবিজ্ঞান পৃথিবীতে দুর্লভ। মায়া, কি ব্রহ্ম, বক্তব্য তাদের যাই হক না কেন, দর্শনের এ্যাপ্রোচটাই বড় কথা।

এবার আমরা যে সব দর্শনের কথা বলেছি, তারই সামগ্রিক ফলাফল নিয়ে আলোচনা করি। সব সময়ই দেখা যায় কোন একটি দর্শন, একক ভাবে দেশের সামগ্রিক কর্মযজ্ঞকে নিয়ন্ত্রন করে না। যদি না সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তার অনুকূল হয়। নাৎসীবাদ এককালে ও মার্কসবাদ বর্তমানে বহু দেশে, এই অনুকূল পরিবেশের সুবিধা পেয়েছে। নিৎসের দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে সে যুগের জার্মানীর কথা বলেছি। এখন মার্কসবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। মার্কসবাদ সব দিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। দার্শনিকদের মধ্যে মার্কসই বোধ হয় প্রথম যিনি তাঁর "ইলেভন থিসিস অন ফুয়েরবাখ" বইখানির এক জায়গায় বললেন, "Philosophers have only interpreted the world in various ways, but the real task is to alter it." এ লেখাটি ১৮৪৫ সালে লেখা। আর আশ্চর্য এই যে আজ বিজ্ঞানও ঠিক তাই করতে চায়। বিপন্ন মানব সভ্যতাকে সম্পদ, শক্তি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কাছে সমস্যা হল সেই, কি করে একে বদলানো যায়।

কি করে বদলানো যায় এই কথা বলে মার্কস বসে থাকতে চান নি। তাই মার্কসবাদ একাধারে অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান; রাজনীতি, দর্শন সব। তাই রাজনীনিতে, কিভাবে হবে পার্টি সংগঠন, কোন পথে হবে আন্দোলন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিপ্লব, শাসন ক্ষমতা অধিকার এ সব আসে মার্কসের রাজনীতি থেকে।

তেমনি মার্কসের অর্থনীতি বলে, যে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা থাকবে সমাজের হাতে। সমাজ চাইবে নিতে সকলের কাছে থেকে, "যার যেটুকু প্রয়োজন।" যে অর্থে সামাজিক সম্পদ, এই অর্থনীতিতে অর্জিত হবে, তা ভোগ করবে সমান ভাবে, সমগ্র সমাজে।

মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞান; সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ভাবতে গিয়ে, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অবসর, আনন্দ, বিনোদন ইত্যাদি সব কিছুর ভারও মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞান নিজের হাতে নিয়েছে।

আর মার্কসীয় দর্শন গতিময় ডাইলেকটিকসের দৃষ্টিতে দেখতে শেখায় বিশ্বকে। বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বজগতের ঘাত-প্রতিঘাত বা ডাইলেকটিকস থেকে জন্মাচ্ছে মানুষের মনে চিন্তা, ভাবনা, ধ্যান, ধারণা। সেই ধ্যান ধারণা যাতে আমাদের প্রগতির পথে চালিত করে, সেই লক্ষ্যই মার্কসবাদীর লক্ষ্য।

মার্কস যেমন, অর্থনীতি, দর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অজস্র লিখে গেছেন তেমনি লিখেছেন অজস্র মার্কসবাদীরাও। যেমন লেনিন শুধু একজন সফল বিপ্লবের বিশ্ববরেণ্য নেতাই নন, তাঁকে বোধ হয় মার্কসীয় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক বলা যায়। মার্কসীয় দর্শনের সবচেয়ে বড় কথা হল যে, এই দর্শন এত বিচিত্র তাত্ত্বিক সাহিত্য সৃষ্টির সহায়তা করেছে, খুব কম দর্শনই এতটা করতে পেরেছে।

আমরা যে এনট্রপি বাড়া-কমার ছকে ফেলে, মানুষের কর্মও সেই কর্ম-প্রেরণার দর্শনগুলিকে পরীক্ষা করেছি, সেই ছকে ফেলে মার্কসবাদ ও মার্কসবাদী সমাজকে পরীক্ষা করলে কি রকম দাঁড়ায়, তা লক্ষ্য করা যাক। একটা বিশাল ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়েই সুরু করি। বিশ্বযুদ্ধে যখন হিটলার সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তখন হিটলারের ধারণা ছিল, যে সোভিয়েট ইউনিয়ান দখল করা মাত্র কয়েক হপ্তার ব্যাপার। এর কারণ হিসাবে হয়ত হিটলারের ধারণা হয়েছিল যে, মার্কসবাদী লেনিনবাদী রাশিয়া তো যুদ্ধবাজ নয়, তাদের দর্শনের লক্ষ্য যে হেতু শান্তি, তাই রুশ দেশের যুদ্ধ প্রস্তুতি বলে কিছুই নেই।

কথাটা অবশ্য কিছুটা সত্যিই ছিল। কিন্তু মার্কসবাদ, লেনিনবাদ তো অলসতার দর্শন নয়। এর সর্ব ব্যাপকতার মধ্যে যেমন কর্মবহুল শান্তিপ্রচেষ্টা আছে, তেমনি প্রয়োজন হবামাত্র যুদ্ধোত্তমকে তারা এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল, যে তার ফলে জার্মানি দীর্ঘকালের মত শিক্ষা পেয়ে গেল। হিটলারের মস্কো দখলের স্বপ্ন তার আত্মহত্যায়, ও সোভিয়েট ইউনিয়ান ও মিত্রশক্তির কাছে জার্মানির আত্মসমর্পনে পর্যবসিত হল। আমাদের এনট্রপির ফর্মুলায় ফেললে বলা যায়, যে যখন প্রয়োজন হল, তখন থার্মোডাইনামিক নীতি অনুসারেই, এনট্রপি প্রয়োজন মত বাড়াতে পারল। এই হল ডাইলেকটিকসের বিশেষত্ব। এতে, যে দুই বিপরীত দিক থিসিস ও এ্যান্টিথিসিস আছে, প্রয়োজনমত এই দুই বিপরীতকে কাজে লাগিয়ে, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের মত একটা বড় সিন্থিসিস অর্জন করতে পেরেছিল।

এটাতো গেল যুদ্ধের দিক। এখন আমাদের বর্তমানের বিশ্বজোড়া সভ্যতার সঙ্কটে, মার্কসবাদ ও মার্কসবাদীরা সাহায্য করতে পারে? এখানেও আবার ডাইলেকটিকসের সুবিধা। গ্রোথ রেট, সম্পদ আহরণ ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার, নতুন শক্তির সন্ধান, ইত্যাদি যে কোন দিকে যদি একটা বিশ্বস্বীকৃত সুপারিশ হয়; তা হলে ধনতান্ত্রিকতার আদর্শে অনুপ্রাণীত যারা, তাদের হয় সে সুপারিশ চালু করতে দেরী হতে পারে। কিন্তু মার্কসবাদীদের তা হবে না।

পাঠকের মনে পড়বে, হাইড্রোজেনের ফিউশানের একটি বিশেষ পদ্ধতিতে, সোভিয়েট ইউনিয়ান কাজ করছে। আমরা সেখানে দুটি পদ্ধতির কথা বলেছি। অথচ আনবিক বোমা ও সে সম্বন্ধে জ্ঞান, সোভিয়েট ইউনিয়ানের হাতে অনেক দেরীতে এসেছে। কিন্তু তারা এতটা এগিয়ে যেতে পেরেছে, তারও কারণ যে তারা শান্তিবাদী হিসাবে, গোড়া থেকেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে আণবিক শক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে।

সারা পৃথিবী যদি মার্কসবাদী হত, তা হলে বর্তমান সঙ্কট সমাধান অনেক সহজ হত। কিম্বা হয়ত তাও বলা যাবে না। কারণ দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর বৃহৎ দুটি মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট দেশ, রাশিয়া ও চীন পরস্পরের শত্রু। কিছুদিন আগেও, এটা যে সম্ভব হতে পারে তাই মনে হত না। তাই শুধু মার্কসবাদের মতন প্রগতিশীল মতবাদ বা দর্শনে প্রভাবিত শাষণ ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। আরো কিছু, কি অন্য কিছু চাই। তাই বিজ্ঞান সম্মত সুপারিশ করতে হলে, কি

ধরনের মনোভাব বা এ্যাটিচিউড দরকার, সেটা বরং বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন তার বেশী কিছু নয়। এ ধরনের এ্যাটিচিউড কতকটা পাওয়া যাবে বৈদান্তিক মায়াবাদজাত, "তেন ত্যক্তেন" মনোভাবের মধ্যে। অনেকটাই পাওয়া যাবে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের মধ্যে। আবার কিছুটা গান্ধীবাদী সমাজচিন্তায়, কুটির শিল্পের উপর নির্ভর করে।

মনে হবে আমরা বুঝি এ গুলির একটা ককটেল বানাতে চাইছি। কিন্তু আমরা কে? বিশ্বের বিশেষজ্ঞরা, যাঁদের কথা পূর্ব অধ্যায়ে অনেক উল্লেখ করেছি, তাঁদেরই অনেকটা এইরকম মত। তাও পূর্ণ ঐক্যমত্য নয়। কেউ বলছেন যে গান্ধীবাদী অর্থনীতি মডেল করতে তার ঝোঁকটা হবে, কৃষিভিত্তিক গ্রামীন অর্থনীতিতে। ভারী যন্ত্রপাতি ও শিল্প, অগাধ চাহিদায় স্ফীতকায় ভোগবাদকে নিয়ন্ত্রন করায়। এ থেকেই আসে কনসামশান কন্ট্রোলের প্রকল্প। আমাদের ঝোঁকটা যেন হচ্ছে, যে সব দেশকে আমেরিকার মডেলে ঢেলে সাজতে হবে। চাই প্রত্যেকের গাড়ী, টেলিভিসান ইত্যাদি। কিন্তু প্রাইভেট গাড়ীর বদলে, প্রত্যেকের সাইকেল, যথেষ্ট। (বসে যাবার মত) বাস, পাড়ায় আট-দশটি পরিবারের জন্য একটি লাইব্রেরি ও তার সংলগ্ন ক্লাবঘরে টেলিভিশান ইত্যাদি কেন থাকবে না; এ ধরনের সামাজিক চাহিদার বদলে, আমাদের চাহিদা বড় আত্মকেন্দ্রিক। কিন্তু বক্তব্য হচ্ছে, আমেরিকা কি নিজেই তার জীবনমান রক্ষা করতে হিমসিম হচ্ছে না?

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা উপরোক্ত মতের সমর্থক, তাঁরা এও বলছেন যে আজ উন্নতিশীল দেশগুলির চাই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি। এ বলতে তাঁরা বলছেন, যে গ্রামীন কুটীরশিল্পের জন্য, প্রয়োজন মত হালকা মেশিনারি দেওয়া হক (অম্বর চরকার ধরনে আর কি)। কিন্তু এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজিতে না হয় তৈরি হল তাঁতের কাপড়; মুচির হাতে তৈরি, আরামপ্রদ, টেকসই জুতো; নক্সা আঁকা শাখা; কিন্তু তাতে আজ গাঁয়ের লোকদেরও মন উঠছে কই, তাই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি শুধু নয়, আগে প্রয়োজন হল এ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইডিওলজির। কি মডেলের সভ্যতা হবে আগে সেটাই ঠিক হক। আর এ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোসাইটিটা? সেটা প্রতিষ্ঠিত না হলে, এ্যাপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি গ্রহণ করতে ওরা চাহিবে কি?

তাই বুঝি, ওই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেউ কেউ, একটা বৈদান্তিক মডেলের

চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হতে উপদেশ দিয়েছেন। এ মডেল কি ? না "renunciation of desires and Services to humanity." ভাল কথা হিসাবে, কথাটি শুনতে বেশ। কিন্তু সবই যেন, ওই কথাতেই শেষ। কথা থেকে কবে কাজ সুরু হবে তা জানি না।

এই আলোচনার সুরুতে বলেছি দুটি কম্যুনিষ্ট দেশ, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে বিরোধ। আমাদের বক্তব্য ঠিক সেইখান থেকেই সুরু করছি। আমেরিকান কবি, কার্ল স্যাণ্ডবার্গের, "The poeple yes" বইটির কয়েকটি লাইন তুলছি। তার আগে বইখানির নামকরণ নিয়ে দু চার কথা বলি। এ রকম অনবদ্য বইয়ের নাম, কমই দেখা যায়। নামটি দেখলেই বোঝা যায় বইটি মানবতাবাদী, দীর্ঘ একটি কবিতার বই। এক জায়গায় তিনি বলছেন :

There is only one man in the world
and his name is All Men.
There is only one woman in the world
and her name is All women.
There is only one child in the world
and the child's name is All children."

বিশ্বমানবকে তিনি এই বইয়ে বলেছেন, মানব পরিবার। এই বইয়ে এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

Ghost and rich man :
"What do you see out of the window ?"
"The people."
",And what do you see in the miror ?"
"Myself,"
"Yet the glass in the miror is the same
only it is silvered."

নিজেদেরই ঈর্ষা, ঘৃণা, দম্ভ, দিয়ে কাঁচের পিছনটাকে অস্বচ্ছ করলেই তা হয়ে দাঁড়ায় দর্পন। তখন শুধু নিজেকেই দেখা যায়। যেমন সেই রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মায়াদর্পন। সে দর্পনে সে যা দেখছে বলে ভাবছে, তা তার নিজেরই অহমিকা ও স্বার্থজাত।

আর এক জায়গায় স্তাগুবার্গ বলছেন :

"Said the scorpion of hate : The poor hate the rich the rich hate the poor. The south hates the north. The west hates the east, the workers hate their bosses. The bosses hate their workers. The country, hates the towns. The towns hate the country. We are a house divided against itself. We are millions of hands raised against each other. We are united in but one aim getting the dollar. And when we get the dollar we employ it to get more dollars."

বিশ্বে মানব সভ্যতা যদি আজ বিপন্ন হয়, তা হলে এই মনোবৃত্তি যা আজ বিশ্বব্যাপী, তা তো একে আরো বিপন্ন করে তুলবে।

বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের যেখানে একসঙ্গে চিন্তা করে এই সভ্যতার সঙ্কট নিরসনের চেষ্টা করা উচিত, সেখানে এই ছোট বইখানি লিখতে বসে, আমাদের পক্ষে কতটুকু আলোকপাত করা সম্ভব? এ যেন সূর্যাস্তের সময় মাটির প্রদীপ জ্বালানো। তবু একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবার আগে সেটুকুও তো জ্বালাতে হবে।

বিভিন্ন জাতির অভিমানের কথা বলছিলাম না? আর তাতে আজকের এই পরম প্রয়োজনীয় যে, বিশ্বসঙ্কট মোচনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, তা ও বিশেষ ভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি :

"এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে, হবে গো এইবার
আমার এই মলিন অহংকার ॥"

অহংকার মাত্রেই কুৎসিত, মলিন। ব্যক্তির পক্ষে তা যতটা; সম্প্রদায় বা দেশের ক্ষেত্রে তা আরো বহুগুণ জঘন্য।

এই অধ্যায়ে আমরা কিছু দার্শনিকের আলোচনা করেছি। কত চিন্তানায়ক ঋষি তো এলেন, মানবতার বাণী উচ্চারণ করলেন, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সুরে কই বলতে পারলাম :

"আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে
দুঃখ বিপদ তুচ্ছ করা কঠিন কাজে ॥"

কাজটা যে কঠিন কাজ; আর দুঃখ বিপদও তুচ্ছ করতে হবে : যেখানে

হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিণত করে হয়ত শক্তি উৎপন্ন করতে হবে, সূর্যালোককে বিশেষ জায়গায় বন্দী করে পেতে হবে খাদ্যের প্রোটিন, কাজের শক্তি। অপস্রিয়মান অক্সিজেনকে আবার বানাতে হবে সমুদ্রবক্ষের প্ল্যাঙ্কটনের সাহায্যে, কি অন্ত কোন পদ্ধতিতে। কিন্তু সেই কর্মযজ্ঞের মুক্তির দিকটুকু তো বিশ্বমানবের মনে : সকলের প্রেমে।

তাই আজ সব থেকে আগে, নিজেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা, ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, দম্ভ, নীচতা, এগুলি ব্যক্তিগত সম্প্রদায়গত, বা জাতিগত যে পর্যায়েরই হক, তা বিসর্জন বাইরে দাঁড়াতে হবে রবীন্দ্রনাথের কথারই অনুসরণে :

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া॥
ওই যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝে তে উঠুক নেচে
সকল পরাণ দিক না নাড়া॥"

আত্মকেন্দ্রিক মানুষ, যখন নিজেকে ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়, তখন তা প্রেমের উপর। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে—কেন, কী হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি আপনিই আপনার লক্ষ্য।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি দেবার কারণ শুধু একটি। মানব সভ্যতাকে বাঁচাবার ইচ্ছা, শুধু তাকে বাঁচানো কেন, তাকে সুন্দরতর করার ইচ্ছা আজ পৃথিবীতে কারই বা নেই? কিন্তু তাকে চরিতার্থতা, সার্থকতায় নিয়ে যেতে পারে শুধু প্রেম।

তাই আজ লিখতে বসে মনে হচ্ছে, যে আজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এ সবের খুব একটা ঘাটতি নেই। ঘাটতি শুধু এক জায়গায়, তা হল প্রেমে। শুধু এক কথাতেই এ বক্তব্য শেষ করে, একটি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীর "বরণীয় যাঁরা, স্মরণীয় যাঁরা" তাঁরা তো বার বার বললেন ভালবাসো। কিন্তু তবু ওই একটি কাজই আমরা করতে শিখলাম না। তাই এখানে যদি সেই বক্তব্যটাই দু চার পাতা দখল করে, পাঠকের আশা করি ধৈর্যচ্যুতি হবে না। এমনকি মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে এটা একটা ভাল পরীক্ষা। একথায় বিতৃষ্ণা যার আসবে, বুঝতে হবে যে তারই মনের দিকটা শুকনো ও তার চিকিৎসা আবশ্যক।

বর্ত্তমানের শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক এ্যাশলে মণ্টেগু বলেছেন যে আজকের সব চেয়ে বড় প্রয়োজন ভালবাসার, যাকে তিনি বলেছেন "Mother Love" ভালবাসা বস্তুটিই সেই মার মত।

একথা বলতে গিয়ে জীববিজ্ঞানের একটি পরীক্ষার কথা মনে পড়ছে। নবজাত শিম্পাঞ্জি নিয়ে এটি করা। এদের একদলকে রাখা হল যান্ত্রিক মার কাছে, যেখানে খাওয়া শোয়া ঘুম থেকে সুরু করে, মার লোমশ, তপ্ত বুকের মত স্তনযুক্ত জায়গায়, সবই দেয়া হল। তবু যখন সে জন্তুগুলি বড় হল, তারা হল মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ, নিউরোটিক। আজ সারা বিশ্বমানবকে আমরা করে তুলেছি নিউরোটিক। টন টন ঘুমের বড়ি খেয়ে, নিজেরাই তারা চিকিৎসার নাম করে, নিজেদের সর্বনাশ করছে। চিকিৎসাটা সহজই ছিল। ভালবাসা পাওয়া আর দেয়া।

আমাদের প্রেম বা ভালবাসা পেতে ও দিতে কষ্ট হচ্ছে তার কারণ আমরা হয়ে উঠেছি স্বার্থপর। তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে—এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না।" যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাগিদে ছিনিয়ে নেয়া হয় সে তো ত্যাগই নয়। আমরা প্রেমে যা দিই, কিছুই আর রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে ধরা দেয়। ত্যাগের ব্যাপারটা একটা সাধনার ব্যাপার। তার একটা ঐতিহ্য থাকে। ভারতে সে ঐতিহ্য ছিল। ইউরোপেও কৃশ্চানিটি সে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিল। তার ফলে, কি বিরাট সভ্যতা কত দীর্ঘ দিন কত কি যে দিয়ে গেল, তা ইতিহাস জানে।

সেই ইতিহাসই আমরা ভুলতে বসেছি অহংকার আর আত্মাভিমানে। আবার রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি. "নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্য ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য একেবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।"

উপনিষদে আছে, য একোহবর্ণো বহুশক্তিযোগাত্ত বর্ণানেকেনকান্নিহিতা-র্থোদধাতি।" এর মানে হল যে তিনি এক, তাঁর কোন বর্ণ নেই, তিনি জাতিহীন তবু তিনি বহু শক্তি নিয়ে অনেক জাতীর বহুধা কল্যাণ বিধান করছেন। মনে

হবে বর্ণহীন এক, তিনি আবার কি করে কল্যাণ বিধানের ব্যবস্থা করছেন? ভাষ্যকার এর উত্তরে বলছেন, যে এ সম্ভব হচ্ছে শুধু তাঁর প্রেমে। বর্ণহীন, জাতিহীন যিনি, তাঁর পক্ষে যদি বহুজাতির কল্যাণ সাধন করতে প্রেমের প্রয়োজন হয়; তা হলে বিভিন্ন জাতির যারা বিভিন্ন বর্ণ সমন্বিত মানুষ, তাঁদের হৃদয়ে যদি প্রেম না থাকে, তা হলে তাঁরা অনেক জাতির কল্যাণের ব্লু প্রিন্ট তৈরি করবেন কি করে?

অবশ্য বৈজ্ঞানিকদের যে আজো আইনষ্টাইনের ঐতিহ্যের অনুসরণে, কিছুটা মানব প্রেম আছে, তা আমরা দেখেছি, তাঁদের পত্রিকা, বুলেটিন অফ দি এ্যাটমিক সায়ান্টিষ্টের পাতায়। সেখানে তাঁরা আণবিক শক্তিকে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে, তার প্রকল্প তৈরি করেছেন। তা দেখে মনে হয়, এঁদের মানবপ্রেম রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটু সঞ্চারিত হলে ভাল হত। বিভিন্ন জাতি ও দেশের ভিতরে যে সহযোগিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে, তার মূলে থাকে প্রেম ভালোবাসা। এই প্রসঙ্গে আইনষ্টাইনের একটি লেখার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ লেখাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জাপানের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লেখা: "Ours is the first age in history to bring about friendly and understanding intercourse between people of different countries; in former times nations passed their lives in mutual ignorance and in fact hated and feared one another. May the spirit of brotherly understanding gain ground more and more among them. With this in mind I, an old man, greet you Japanese School children from afar and hope that your generation might someday put mine to shame." পঞ্চাশ বছর পরে, যাদের উদ্দেশ্য করে আইনষ্টাইন কথাগুলি বলেছিলেন, তারা আজ প্রৌঢ়। ভর ও শক্তির সম্পর্কিত সমীকরণ, যা আইনষ্টাইনের কাছে ছিল সমীকরণ আজ তা বাস্তব। কিন্তু আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া কতটুকু এগিয়েছে?

যদি প্রশ্ন করি কেন এগোয় নি? মন থেকে উত্তর পাই, প্রশ্নের আকারে, ভালবাসা কোথায়? এই প্রসঙ্গে আধুনিক কবি বুদ্ধদেব বসুর একটা কবিতা মনে পড়ে যায়:

"বর্তমানটা সমতল
ভবিষ্যৎকে যদি বলো চড়াই
অতীত তবে ঢালুতট,
ধূপের বাতাস স্মৃতির রঙে গাঢ় মদির
তাই ঢালুর দিকে তার টান।
সন্ধ্যায় ডানার খেলা চুকিয়ে
ভালবাসার পাখি
কোন অদৃশ্য খাঁচায় ঢুকেছে
জানি না, তাই ধূপ জ্বেলেছি
তাকে পাব বলে;

*   *   *

সব রয়েছে :
কিন্তু মহারাজারই দেখা নেই

*   *   *

সত্যিই কি প্রেম কোথাও হারিয়ে গেছে?"

অনেক পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগবে, আমাদের যা আছে, তার উপর কি শুধু মাত্র ভালবাসা, মানব প্রেম হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এও কি সম্ভব? কতটা সম্ভব, তা কে বলতে পারে? তবে অনেক কাজই যে এতে এগিয়ে যাবে, তা তো সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা যায়। কেন না, বিভিন্ন দেশের যা কিছু সম্পদ আছে, তা যদি আমরা সব বিভেদ ভুলে পাশাপাশি বসে, আলোচনা করে, যাদের নেই তাদের সঙ্গে ভাগ করে নি, তা করতে হলে দম্ভ, স্বার্থপরতা বাদ না দিয়ে সে মনোভাবই অর্জন করতে পারব না। এই মনোভাবটা এলে তখনই তো সকলে মিলে মিশে করার কাজ কি কি কাজ আছে, তা ঠিক করা যাবে। আন্তর্জাতিক কর্মযজ্ঞের প্রোগ্রাম একবার খাড়া করতে পারলে, তবেই তো কাজ সুরু করা যাবে। আমরা তো সেই প্রস্তুতির উপযুক্ত সহযোগিতার মনোভাব গঠন করার জন্য যে ভালবাসা লাগে তার কথাই বললাম।

যেমন একটি পরিবারের কথা যদি ধরি; যখন সম্পদের দিন তখন ভাই এসে ভাইয়ের পাশে না দাঁড়ালেও চলে, কিন্তু যেদিন পরিবারের বিপদ, সেদিন যদি ভাই এসে ভাইয়ের পাশে না দাঁড়ায়, তা হলে সে পরিবার বাঁচবে কি

করে ? মানব পরিবারের সামনে আজ যে বিপদ এসেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। তাই আজ মানব পরিবারের সকলকে পাশাপাশি, একেবারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। কাঁধে কাঁধ মেলাবার মন্ত্রই হল ভালবাসা।

ইতিহাসে সভ্যতার অবক্ষয়

মারাত্মক রোগে যখন কেউ বিপন্ন, বাড়িতে ডাক্তার এসেছে, তখন ডাক্তারবাবুকে রোগীর আত্মীয়রা অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা ডাক্তার বাবু, এ রকম রোগী সারে তো ?" ডাক্তার তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে উত্তর দেবেন, এ ধরণের প্রাণী বাঁচে কি না। অভিজ্ঞতা মানে হচ্ছে, তিনি এর আগে এ ধরণের রোগী যাদের দেখেছেন, তাদের ইতিহাস। আজকে যদি সারা পৃথিবীর সাধারণ মানুষরা বুঝতে পারতেন, সারা পৃথিবীব্যাপী এই সঙ্কট, তা হলে তাঁরাও রোগীর আত্মীয় যাঁরা, তাঁদের মতই পৃথিবীর সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রশ্ন করতেন, যে পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরণের সঙ্কট দেখা দিয়েছে কি না ? দিয়ে থাকলে তার ফলাফল কি হয়েছে ? সেই ফলাফলের উপরে ভরসা করে বর্তমান সমস্যা সম্পর্কে কিছু বলা যায় কি ?

কেউ কেউ বলেন, ইতিহাস ঘটতে থাকে, নিজেরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে। আবার কারো মতে, ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি কখনই হয় না। ইতিহাসের পথটা যেন উপরে ওঠবার ঘোরানো সিঁড়ি। নিচের তলার কোন একটা বিশেষ জায়গার, ঠিক মাথার উপরে, উপরের তলার যে জায়গাটা, সেখানে এসে মনে হয়, বুঝি আগের জায়গাতে ফিরে এসেছি। কিন্তু সেটা একই জায়গায় ফিরে আসা নয়। সেটা সেইখানের মতন দেখতে, অন্য সমতলে ফেরা। তাই আর একদল ঐতিহাসিক বলেন, ইতিহাস একই সমতলে পুনরাবৃত্তি করে না। যা নাকি পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়, তা অন্য আর এক সমতলে। ইতিহাসের গতি সম্পর্কে বিভিন্ন থিয়োরি আছে। থিয়োরি যাই হক, ইতিহাস যে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। আর তা না হলে ইতিহাসের মানেই যে থাকে না।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে যে সকট সভ্যতার অবক্ষয় ইত্যাদি ঘটেছে, সেগুলিই লক্ষ্য করব। ঐতিহাসিক আর্ণলড টয়েনবি কথাটা অনবদ্যভাবে বলেছেন, যে সভ্যতার ভেঙ্গে পড়াটা একটা সভ্যতা গড়ে ওঠার তুলনায় অনেক পরিষ্কার ভাবে নজরে পড়ে। এটা স্বাভাবিক। কারণ একটি বিরাট বনস্পতি, একটি একটি করে তার ডাল পাতা গজিয়ে, কখন যে তা একটি মহীরুহে পরিণত হল, তা দেখলেও কি তার প্রতিটি ধাপ আমাদের মনে থাকে? অথচ গাছটির অংশবিশেষ, বা পুরো গাছটি যদি ভেঙ্গে পড়ে, তা হলে সেটা নজর এড়ানো শক্ত!

টয়েনবি প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে পৃথিবীতে মানবজাতি পদার্পণ করার পর, এখনও পর্যন্ত যেটুকু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তাতে জানা যায় যে প্রায় ছাব্বিশটি বিভিন্ন ধরণের সভ্যতা, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর আলো দেখেছে। এর মধ্যে আবার কয়েকটি সভ্যতা তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। এ গুলির মধ্যে গুটি ষোল সভ্যতা, তাদের সব নিদর্শন সমেত হয় মাটির তলায় সমাহিত; আর তা না হলে লুপ্ত নিদর্শন। যে গুলির নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার সম্পর্কে আমরা অনেক কথা জেনেছি বা জানছি।

যে দশটি সভ্যতা, সেই পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার উপর দিয়ে এসে আজও টিঁকে আছে সেগুলি হল, পশ্চিমী সমাজ, মধ্যপ্রাচ্যের খৃষ্টান ধারা থেকে যার উদ্ভব; ইসলাম সমাজ; হিন্দু সমাজ; দূর প্রাচ্যের প্রাচীন চৈনিক সমাজ ও জাপানে তার অংশবিশেষ; পলিনেশিয়ার আটকে থাকা সভ্যতার তিনটি ধারা; এস্কিমো; ও অন্য যাযাবরদের সমাজ। বেঁচে আছে যে সব সভ্যতা, সেগুলিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি; তা হলে দেখতে পাই যে কয়েকটি সভ্যতা, যেমন এস্কিমো সমাজ একেবারে মৃত্যুসজ্জায়। যাযাবরদেরও সেই অবস্থা। যে সব সভ্যতাগুলি মুছে যেতে বসেছে সে গুলিকে মুছে ফেলছে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতা।

তবু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, যে ছ সাতটি সভ্যতা, অপেক্ষাকৃত বেশী জীবনীশক্তি নিয়ে বেঁচে আছে, সে গুলির সঙ্গে, যে সভ্যতা একেবারে মরণোন্মুখ, যেমন এস্কিমো সমাজের একটা মূল পার্থক্য আছে। যেমন এস্কিমো সমাজের সভ্যতা, গড়ে ওঠবার আগেই তা থেমে গেল। আবার হিন্দু সভ্যতা, মোগল সাম্রাজ্য ও পরবর্তিযুগের বৃটিশ রাজত্বের চাপ সহ্য করেও বেঁচে আছে। ঠিক

তেমনি অপেক্ষাকৃত কম আঘাত ইউরোপীয় সভ্যতার কাছ থেকে পেলেও, মাঞ্চু ও মোঙ্গলদের হাতে সব আঘাত সত্ত্বেও চৈনিক সভ্যতা ও জাপানী সভ্যতা ভাল ভাবেই বেঁচে আছে। যেমন বেঁচে আছে ইসলাম, এমন কি ইসলামের একটা সামগ্রিক সংহতি প্রচেষ্টাও এখনো অব্যাহত আছে।

অব্যাহত রয়েছে, এ রকম যে সব সভ্যতার কথা বললাম, সেগুলিও যে ভিতর থেকে চিড় খেয়ে গিয়েছে, এটা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। চিড় খেয়ে, ভিতর ভিতর ভেঙে পড়লেও, বাইরে থেকে এ সমাজ ও সভ্যতাকে ধরে রেখেছে ইউরোপীয় সভ্যতা। এই সভ্যতাগুলি ক্রমশ আরো বেশী করে ইউরোপীয় ভাবধারাকে আত্মস্থ করে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এই ভাবধারাকে অবলম্বন করে যে অন্য সভ্যতা বাঁচতে চেষ্টা করছে, তার অজস্র কারণ আছে। নানাবিধ আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, এগুলি দেবার ক্ষমতা ইউরোপীয় সভ্যতার রয়েছে। তা ছাড়া মানসিকতাকেও ইউরোপীয় শিক্ষা উচ্চগ্রামে বাঁধতে পারে সেটাও ইউরোপীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করার পিছনে আছে।

এককথায় বলা যায়, ইউরোপের সমুন্নত পদ্ধতির "টেকনোলজি", ইউরোপীয় সভ্যতাকে মধ্যপ্রাচ্যে, দূর প্রাচ্যে ও সুদূর প্রাচ্যে গ্রহণীয় করে তুলেছে। মনে হবে, ভাস্কোডাগামা কি কলম্বাসের আমলে বিজ্ঞানই ছিল না বলবার মত, তার আবার টেকনোলজি কি? অনেকে এ কথাও বলবেন যে সে যুগটাতো ছিল জলদস্যু, পাইরেটদের। তাদের আবার টেকনোলজি কি? ঠিক ওদের কথাই বলতে চাইছি। পালতোলা জাহাজ, অজস্র পণ্য বোঝাই করে সীমাহীন সমুদ্রে পাড়ী দিয়ে, ঠিক ঠিক জায়গায় পৌছনর টেকনোলজি এদের ছিল, সেই সঙ্গে বাঁচার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ-মশলা এসব ব্যবহারের টেকনোলজি। এইগুলি প্রথম যুগে অবাক করেছে অনুউরোপীয় জাতি ও সভ্যতাকে। পরে আবার বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় বুদ্ধিচর্চা, এদের অবাক করেছে। তা ছাড়া পূর্ব দেশগুলির গোপনতাপ্রিয়ত্ব এত বেশী, যে তাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হয়ে, নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভুলে বসে থাকাটা বড় বেশী সহজ। আর ধর্মকে প্রাচ্য যেন লোহার তৈরি স্ট্রেট জ্যাকেট করে তুলেছে।

বিজ্ঞানের উপর অগাধ বিশ্বাস, যে তা সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে, এটা চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল। জগৎ প্রসিদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানী

স্তার জেমস জিনস, তাঁর "Wider Aspects of Cosmogony" বইয়ে লিখছেন।
"Taking a very gloomy view of the future of hnman race let us Suppose that it can only expect to Survive for two thousand million years longer, a period about equal to the past age of the earth." পদার্থবিজ্ঞানী এখানের হিসাবে, শুধু বহির্বিশ্বের হিসাবটা ধরেছিলেন। কিন্তু স্পেসিপ পৃথিবী, তার ভিতরে কি কি হতে পারে, তা এই হিসাবে ধরাই হয়নি। এই হিসাবটা ধরেই তিনি বলছেন' "Humanity although it has been born in a house only seventy years old, is itself only three days old····· utterly inexperienced beings,··· ···" এই শেষ কথাটা অর্থাৎ মানুষের অভিজ্ঞতার অভাবের কথাটা, ঋষিতুল্য বৈজ্ঞানিক যা বলেছেন, দেখা যাচ্ছে তা কত সত্য।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, যে কোন পুরানো সভ্যতার ভিতর যদি নতুন রক্তের সঞ্চার করা হয়, তা হলে সভ্যতায় আবার নতুন জোয়ার আসে। এর সমর্থনে অনেকে ইতালির ইতিহাসের কথা বলেন। খৃষ্টজন্মের তিন চারশো বছর আগে থেকে, কিছুদিন পর পর্যন্ত ইতালিয় জীবনের এক বিরাট সৃষ্টিশীলতার অধ্যায়। এই সৃজনশীলতা যেন মিলিয়ে গিয়ে, অন্ধকার যুগ এলো। তারপর আবার যেন ফুল ফুটে উঠল রেনেসাঁর নবজাগরণে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে গথ ও লম্বার্ডদের আক্রমণই, নতুন রক্ত সঞ্চার করল ইতালির মানসলোকে।

এই থিয়োরি অনুসারে সভ্যতার স্রোত নিজেকে হারিয়ে হয়ে ওঠে বদ্ধ জলা। আক্রমণেই হক, আর অন্য রকমের পদসঞ্চারেই হক, মুমূর্ষু সভ্যতা আবার বেঁচে উঠতে পারে। প্রাচ্যের বিভিন্ন ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা, ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও হয়ত এ জিনিসটাই ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। সেই যে সরষে পোড়া দিয়ে ভূত ছাড়ানোর কথা আছে ; এ ও অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সরষে, অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতাই যদি বিপন্ন হয়, তখন ? সে আলোচনা এখন নয়, পরে।

খৃষ্ট জন্মাবার দুশো বছর পর্যন্ত যে সময়, তাতে ইতালির সৃজন প্রতিভা যা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যেতে লাগল কেন, এর জন্য অনেকেই উৎকট ইতালিয় যুদ্ধপ্রিয়তাকে দায়ী করেছেন। এর সূচনা সেই হানিবলের যুদ্ধে। হানিবলকে

একজন সর্বকালের বুদ্ধ বিশারদ বলে অভিনন্দিত করা হয়, অথচ হওয়া উচিত এর ঠিক উল্টোটাই। পরের যুগে যে নব জাগরণ, তার সূচনার জন্ত কিন্তু স্মরণ করতে হয় সেন্ট বেনিডিক্ট ও পোপ গ্রেগরিকে। মধ্যযুগের ইতালিকে যে শুধু নবজীবনে অভিসিক্ত করলেন তাই নয়, তথাকথিত পশ্চিমী সভ্যতারও স্রষ্টা বলা যায় তাঁদের। আবার লম্বার্ডদের আক্রমণের কথা একটু আগে বলা হয়েছে, তারা তো ভেনিসের ধারে কাছেও আসে নি। তবু রেনেসাঁতে ভেনিসের দান যে কত, তা সবাই জানে। তাই টয়েনবির মতে, লম্বার্ডদের রক্তসঞ্চারে যদি কিছু ঘটে থাকে, তা ছিটেফোঁটাই ; বড় কিছু নয়।

সভ্যতা ক্ষয়ের জন্ত যে কারণগুলি দেখান হয়, যেমন জীবন্ত মানুষের মত সভ্যতারও একটা আয়ু আছে ; কি দিনের সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যার মত, সভ্যতার বৃত্ত ঘুরছে, এ গুলি সবই উপমা দিয়ে বোঝার চেষ্টা ; তাও আবার ঠিক ঠিক উপমা হল না। এ আর যাই হক বিজ্ঞান নয়। তবে এ কথাও ঠিক, যে যতক্ষণ কোন বিশেষ সমাজ বা সভ্যতা সৃষ্টিশীলতাটুকু না হারায়, ততক্ষণ তার বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা নেই। ইউরোপীয় সভ্যতাপ্রধান বর্ত্তমান সভ্যতায়, এইটা এখনো বজায় আছে, এটা একটা ভরসার কথা। অবশ্য আজ এই সভ্যতায় হুট হুট করে সেক্সপীয়ার কি রবীন্দ্রনাথ, নিউটন কি আইনষ্টাইন, আসছে না, তবু হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক সৃজনশীল হবার তাগিদ অনুভব করছে।

সৃজনশীল হবার কথাটা এই কারণে বললাম, যে সমস্ত সভ্যতার ভেঙে পড়ার ইতিহাসটা একটু তলিয়ে দেখলে একটা জিনিস দেখা যায় আবশ্যিক ভাবে যা থাকতে হবে ; সেটা হল সামাজিক পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারানো। এ পরিবেশ, মানব সমাজও হতে পারে, আবার সম্পূর্ণভাবে তার বাইরে যে বিশ্বপরিবেশ হতে পারে, যার মধ্যে জল, হাওয়া, কয়লা, লোহা, গাছ, পশু, পাখি, এ সবই বোঝায়। তবে আবার কোন কোন ঐতিহাসিক এ কথাও বলেছেন যে যদি দেখা যায়, একটি বিশেষ সভ্যতার মানুষ, হয়ত লোহার ব্যবহার জানে না বলেই তাদের সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে পারছে না ; তা হলে বুঝতে হবে, লোহার ব্যবহার না জানাটা কারণ নয় ; ওটা লক্ষণ মাত্র। অনেক লক্ষণের মধ্যে ওটাও একটা লক্ষণ। কথাটা পরিষ্কার হবে, যদি মানব পরিবেশের কথা তুলি।

ধরা যাক, একটি বিশেষ সভ্যতায় (?) সেই সমাজের লোকেরা এত পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ে উঠল, যে নিজেদের মধ্যেই মারপিট করে, পুরো সমাজটা উৎসন্নে দিতে বসল। এই মনোবৃত্তিটাকে কারণ বলা কি উচিৎ হবে? বরং এই মনোভাব যা থেকে উৎপন্ন হল, সেইটাই খুঁজে দেখতে হবে। এ তো একাধিক কারণে হতে পারে, বণ্টন ব্যবস্থায় সাম্যের অভাবে; কি শোষিত শোষক শ্রেণীর মারাত্মক ও কোন হারজিৎ হচ্ছে না, এমন শ্রেণীবিরোধে, নেতৃত্ব ভেঙে পড়তে পারার ফলে; সেই সমাজ ও সভ্যতা ভেঙে যেতে পারে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। রোমক সভ্যতার গৌরবের দিনে, রোমের বিরাট বিরাট রাস্তাগুলি কত রকম কাজে যে তার ব্যবহার ছিল, তা বলার প্রয়োজন হয় না। তারপর রোমক সভ্যতার পতনের সময় দেখা গেল যে, এ রাস্তাগুলোর যেন ব্যবহারই হয় না। তার মানে এ নয়, যে রাস্তা ব্যবহার করল না বলেই সভ্যতার পতন হল। রাস্তার দুর্গতি সভ্যতা পতনের লক্ষণ মাত্র। যেমন একজন রোগী হয়ত অচৈতন্য। বললাম, রোগীর "কোমা" হয়েছে। তথাকথিত কোমা তো লক্ষণ মাত্র। কোন রোগের কারণ নয়। আবার, সেই প্রাচীন সভ্যতায়, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিশ নদীর যে খালগুলি তৈরি করা হয়েছিল, আর সেকালে যা সাফল্যের সঙ্গে কৃষিকে সাহায্য করেছে; তাই পরে বন্যার কারণ হয়ে উঠল। এখানেও সেই কারণ আর লক্ষণ দুটোকে আলাদা করে দেখতে হবে। রোমান রাস্তার আর ব্যবহার না হওয়া, ও ইরাকে এই কানেলগুলোর ধ্বংসাবশের মধ্যে মিল অবশ্যই আছে। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিককে এ মিলেরও একটু গভীরে যেতে হবে।

সিংহলে বৃহত্তর ভারতীয় সভ্যতার বহু ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে দেখা যায়। একটা সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে, এ দেখলেই বোঝা যায়। এ জায়গাগুলোতে প্রায় বলতে গেলে পাকাপাকি খরা। আবার তেমনি ম্যালেরিয়াও। খরা আর ম্যালেরিয়া, এ দুটোতেই আবার একটা সমাজের যেটুকু বাকি আছে ধ্বংস হতে, সে কাজটুকুকে শেষ করে দিতে পারে। কয়েকটি প্রশ্ন তুলছি। খরা আর ম্যালেরিয়ার সহ অবস্থান সম্ভব হল কি করে? কেন না ম্যালেরিয়ার জন্ম চাই, মশাদের ডিম পাড়তে বদ্ধ জলা। খরা জায়গায় এটা সম্ভব হচ্ছে কি করে? এর উত্তর এ্যানোফিলিস জাতের মশা, একটু পরিষ্কার জল, অল্পক্ষণের জন্য জমলেও তাতে ডিম পাড়তে পারে। অনাবৃষ্টির জায়গা বলে, জল জমাটা

এইরকম, যা এ্যানোফিলিসেরই সুবিধাজনক। যখন এখানে সভ্য উপনিবেশ ছিল, তখন যে ক্যানেল ইত্যাদির মাধ্যমে জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থা ছিল, তা নষ্ট হয়ে মশার উপযোগী কিছু খানাখন্দই রইল মাত্র। যতদিন এই সব জলসেচনের ক্যানেলগুলিতে জল বয়ে যেত, স্রোত ছিল, ততদিন এখানে মাছ ছিল : আর মাছ থাকার জন্য মশা ডিম পাড়লে তা মাছে খেয়ে ফেলত। তাই তখন ম্যালেরিয়ার উপদ্রবও ছিল না। তারপর একটা দুর্বিপাকের সঙ্গে অন্য দুর্বিপাকও হাজির হল সব জড়িয়ে, একটা সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেল।

অনেক ছোটখাটো সভ্যতা কিন্তু সঠিক জায়গায় গড়ে না ওঠার জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে। আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ জন্ এ্যাডামস আরমারের "Waterless Mountain" বলে একটি বই আছে। আমেরিকার মেসা ভার্ডা পাহাড়ে এক আমেরিকান ইণ্ডিয়ান সমাজ সভ্যতা ও উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। হয়ত কারো কারো মতে তাদের আক্রমণ করতে যাতে শত্রুদের অসুবিধা হয়, তাই তারা পাহাড়ের উপর বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু এই পাহাড়ের উপর ছিল ভয়ানক জলাভাব। এই জলাভাবেই একদিন যে তাদের সমাজ, সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল। এমনিভাবে ছোটখাট ব্যাপারে, বা একটামাত্র কারণে সমাজ বা সভ্যতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। অবশ্য মনে রাখতে হবে, সত্যকার অবক্ষয়ের কারণটা যখন আসে, তখন তার সঙ্গে আণবিক চেন রিএকশান হিসাবে যেন তার সঙ্গে আরো বহু কারণের সমাবেশ ঘটে। যেমন, একটু আগে যে সিংহলের সেচ ব্যবস্থা নষ্ট হবার কথা বললাম, তারও কারণ, ঘন ঘন যুদ্ধ।

ডব্লু, এইচ, এস জোনসের লেখা একখানি মূল্যবান বই আছে, "Malaria and greek History"তে তিনি দেখাচ্ছেন যে গ্রীস ও ইতালির অবক্ষয়ের ইতিহাসে, ম্যালেরিয়ার একটা বড় ভূমিকা অবশ্যই আছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া জোর পেয়েছে তখনই, যখন দেশের দুর্দশা যেমন গ্রীসে পেলোপনেশিয় যুদ্ধের পরে, আর ইতালিতে হ্যানিবলের আক্রমণের পরে। হ্যানিবলের যুদ্ধের পরে পারস্পরিক আত্মকলহ, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, ভোগবাদ, দাসকে মানুষের মর্যাদা না দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি, রোমক সমাজের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। একেই গীতায় বলা হয়েছে "ধর্মস্য গ্লানি।" গীতার লেখক যিনিই হন না কেন, তাঁর যে ইতিহাসের অনুভূতি ছিল, এটা বোঝা যায়। কারণ কোন বস্তুতান্ত্রিক ত্রুটির কথা না বলে, মন থেকে ধর্মের বিচ্যুতির কথা বলা হল।

চরিত্রের নিম্নগামীতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দারিদ্র্য, ভয়, ইত্যাদি। এই সময় মানুষের মনে হয় যে পালিয়ে যদি বাঁচা যায়। যেখানে ম্যালেরিয়া সভ্যতা নষ্ট হবার জন্য দায়ী, সেখানে মানুষ যেমন পিছু হটতে থাকে, তেমনি এগিয়ে আসতে থাকে মশারা।

যুদ্ধশাস্ত্রে একটা কথা আছে, যে যদি যুদ্ধের সময়ে, খুব দূরে আক্রমণ চালাতে গিয়ে সাপ্লাই লাইন লম্বা হয়ে যায়, তাতে পরাজয়ের সম্ভাবনা পর্যন্ত বেড়ে যায়। ঠিক এই জিনিসটিই ঘটে শান্তির সময়ে, সমাজ ও সভ্যতা রক্ষার ব্যাপারেও। একটি বিশেষ সভ্যতা, বা সামাজিক বন্ধনে বাঁধা, বিরাট একদল লোক, যদি বিশাল ভৌগলিক এলাকায় ছড়িয়ে থাকে, তা হলে সেই সমাজ ও সভ্যতাকে ধরে রাখা কষ্টকর হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম হিসাবে মনে হবে, যে ইংরাজ, ফরাসী, পর্তুগীজরা, প্রাচ্যে ও দূর প্রাচ্যে, তাদের কলোনি দীর্ঘকাল রেখেছিল। কিন্তু ওই সভ্যতা, কলোনিগুলি পুরোপুরি কখনোই কলোনিরা নেয় নি। ইসলাম সম্পর্কেও এ কথা তোলা হয়, বিশেষত প্যানইসলামের একটা ধূয়া আছে বলে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ইসলামে মিলটা একটা এ্যাবষ্ট্রাকশান। আসলে এখানে অনেক সভ্যতা, অনেক সমাজ।

রোমক সভ্যতার, উপরোক্ত ব্যাপারটা অবশ্যই একটা সমস্যা ছিল। কিন্তু অধ্যাপক টয়েনবি, এ কথা বলতে গিয়ে বলছেন, যে গিবন যদি আবার আজ রোমক সভ্যতার পতনের ইতিহাস লিখতেন, তা হলে দেখতেন, এ ছিল হেলেনিক সভ্যতারই পতন। কিন্তু এ পতনের সূচনা, আত্মঘাতে। এ আত্মঘাত জাতিযুদ্ধে; শুধু রাজ্যে রাজ্যে নয়। শ্রেণীতে শ্রেণীতে।

সভ্যতা ভাঙার যেমন কতকগুলো দিক আছে তেমনি ধরে রাখারও কয়েকটা দিক আছে; যেমন একেশ্বরবাদ, এক অক্ষর, কি আটলান্টিকের মত এক মহা সমুদ্র আবিষ্কার। ইসলাম, হিন্দুরা, কি রোমক সভ্যতাও এমনি বড় জিনিসের জোরে মরতে মরতেও বেঁচে গেছে। টয়েনবির এ কথাটি চিত্তাকর্ষক কিন্তু আত্মঘাতী হলে কে আর বাঁচাবে?

সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দায়ী সংখ্যালঘু সৃষ্টিশীল মানুষেরা। এদের সৃষ্টিশীলতা যতদিন থাকে, সভ্যতাও ততদিন বর্দ্ধমান অবস্থায় থাকে। তবে এই সৃজনশীল মানুষেরা যদি অজস্র সাধারণ মানুষের নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে

চালিয়ে নিতে না পারে, তা হলে সভ্যতা টিকতে পারবে না। অবশ্য সাধারণ মানুষকে সংখ্যালঘু কিছু সৃজনশীল মানুষই নেতৃত্ব দেয়। তবে এই নেতৃত্বের মধ্যে তাদের চরিত্রের পরিচ্ছন্নতাটা বড় কথা। এটি না থাকলে নেতা ব্যর্থ হন। অনেক সময় এটা সত্য বলে মনে না হলেও কিন্তু এটা যে কতবড় সত্য তা বোঝা যায় পৃথিবীর বড় নেতাদের দিকে তাকালে। বুদ্ধ কি যিশু, লেনিন কি গান্ধী কেউই এর ব্যতিক্রম নয়। তাই আইনষ্টাইনের মতন একজন বিজ্ঞানীকেও বলতে শুনি, "Can anyone imagine Moses, Jesus or Gandhi armed with the money bags of Carnegie ?" কার্ণেগির ব্যাগটা লোভ, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি বহুবিধ দোষের প্রতীক।

নেতার অসাফল্য ঘটতে পারে বিভিন্ন ভাবে। এর মধ্যে একটা, যখন নেতা তার লোকজনকে যদি হিপনোটাইজ বা অভিভূত করে ফেলে। এ অভিভাবের ফলে জন সাধারণ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে, নিজেদের চিন্তা করার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। এ ধরণের নেতা ছিল হিটলার। চার্লি চ্যাপলিন তাঁর "Great Dictator" এই ধরণের নেতৃত্বকেই বিদ্রূপ করে, তাঁর শেষ বক্তৃতায় বলছেন, We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each others hapiness—not by each others misery. We don't want to hate and despise one another·········

"The way of life can be free and beautiful but we have lost the way·········We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinary that gives abuudance has left us in want·········

"Dictators free themselves but they enslave the people. Now let us fight to tree the world—do away with national barriers—do awy with greed' with hate and intolerance·········

Soul of man has been given wings and at last he is begining to fly." নেতৃত্বে কি হওয়া উচিত আর মানুষের ভবিষ্যতের আশা জাগিয়ে চার্লি চ্যাপলিন তাঁর "Great Dictator" ছবিখানি শেষ করেছেন।

আর একরকম নেতৃত্ব আছে, যা চমক সৃষ্টি করে না। একক যৌথ নেতৃত্বের

উন্নযোগী গণতন্ত্রে এ ধরনের নেতা দেখা যায়। এ ধরণের নেতৃত্ব, তখনই চলতে পারে, যখন সেই সভ্যতা ও সমাজ একটা তুলনামূলক উচ্চমান ও ও স্থায়ীত্বে পৌঁছে গেছে। আবার এও বলতে পারি যে সভ্যতায় গণতন্ত্র চলছে সে সভ্যতার ভিৎ শক্ত হয়ে গেছে। আজকে তথাকথিত পশ্চিম ইউ-রোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে টয়েনবির যে মন্তব্য, তা করা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে সারা ইউরোপেও আজ বহু গণতন্ত্রই কাজ করে যাচ্ছে।

গণতন্ত্রের কথাটা উঠল বলে, সভ্যতার ইতিহাসের আরো দু একটি কথা এখানে আলোচনা করা যায়। তিনটি শব্দকে কেন্দ্র করে এই আলোচনা। কথা তিনটি হল, দাসপ্রথা, যন্ত্রশিল্প, গণতন্ত্র,। দাসপ্রথার কথা উঠলেই আমাদের মনে হয়, যে এই অসভ্য প্রথা দূর হয়ে আমরা অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়েছি। আবার দাসপ্রথার কথা মনে হলেই আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা মনে হয়। আরো মনে যদি পড়ে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কথা। আজকের দিনে যদি কেউ আমেরিকায় যায়, যেটি সবচেয়ে আগে নজরে পড়বে, তা হলে, যন্ত্র। যন্ত্র মানুষের বহু অনাবশ্যক, কঠোর পরিশ্রমের ও বিরক্তিকর কাজ করে দিচ্ছে। দেখেই মনে হয় কি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। কিন্তু দেশটির ঐ উন্নতির আসল সূচনাটা কিন্তু করে গিয়েছিলেন অব্রাহাম লিঙ্কন। কি করে?

তখন শিল্প বিপ্লবের যুগ। ষ্টিম এঞ্জিন যে ঘোড়ার চেয়ে শক্তিশালী ও দ্রুতগামী এ বিশ্বাসই হয়ত অনেকের ছিল না। তবু যাদের দূরদৃষ্টি ছিল, তারা বুঝল' একটা বিপ্লব হচ্ছে। ঠিক এই যুগে, প্রধানত মানব দরদী প্রেরণায় লিঙ্কন দাসপ্রথা তুলে দিলেন। কিন্তু এরই এক সুদূরপ্রসারী ফল হোতে লাগল। দাস না থাকতে বিভিন্ন কাজ কর্মে, প্রয়োজনের খাতিরেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার হতে লাগল আবিষ্কার হতে লাগল নতুন নতুন যন্ত্রের। মানবতাবাদী নেতৃত্ব, এক শিল্পোন্নত মহাজাতির জন্ম দিল। এর নেতা লিঙ্কন। যন্ত্রের জন্য নতুন নতুন, নানা যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠতে লাগল। এই সব যন্ত্রশিল্পের মালিকদের মধ্যে অনেকে আবার, কাঁচা মালের যোগান দিতেই দাস প্রথা বজায় রাখতে চাইল। যেমন আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে তুলোর চাষ হত। তারা চাইল, দাসরা তুলো উৎপাদন করে কাঁচা মালের যোগান দিক। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধে এ ধরণের চিন্তায় ছিল বৈকি। দক্ষিণীদের কিন্তু মাথায় এলো না, যে কাঁচামালও যন্ত্রই উৎপাদন করতে পারবে।

দাস প্রথা আঁকড়ে থাকার মনোভাব দক্ষিণের ছিল, আজও দেখা যায়, দক্ষিণ অনুন্নত, দরিদ্র, শিল্পসমৃদ্ধ নয়, তারা প্রাচীন পন্থী, রক্ষণশীল। সেই জায়গায় উত্তরাঞ্চল সমৃদ্ধ, সচ্ছল, শিক্ষিত, প্রগতিবাদী। মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণীত লিঙ্কনের নেতৃত্ব উত্তরাঞ্চল নিয়েছিল বলে, সভ্যতার ইতিহাসে তারা জিতে গেল সব দিকে। অবক্ষয়ের হতে থেকে ইতিহাসকে বাঁচাতে গেলে, মানবতাবোধের প্রয়োজন।

এবার গণতন্ত্রের কথায় আসি। মানুষ মাত্রেই সমান, এই অনুভূতির উপর ভিত্তি করেই গণতন্ত্র। এক জনের মতের দাম, আর কারো মতেরই সমান দামের, এই হল গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য। কাজেই গণতন্ত্র যেখানে চালু, সেখানে দাসপ্রথা চালু থাকবার কথা নয়। তবু মানুষের মনের বিশ্বাসগুলোও হয় একটু বিচিত্র ধরণের। যে কালের কথা বলছি, সেই কালে, শ্বেতকায় পুরুষের ধারণা ছিল, যে মানুষের মধ্যে শ্বেতকায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ। নারী, কৃষ্ণকায় মানুষ, এরা নিচু স্তরের প্রাণী। এদের আত্মা নেই, যেমন জীবজন্তুরও আত্মা নেই। তাই গণতন্ত্র বলতে বোঝাবে শ্বেতাঙ্গ পুরুষতন্ত্র। তবু এই শ্বেতাঙ্গ পুরুষতন্ত্রে এমন মানুষ থাকবে, যাদের বুদ্ধি থাকে। তাদেরই মধ্যে কেউ হয়ত বলবে, "A house divided against itself can not stand. You can not have a society half free and half slave."

ঐতিহাসিক দিক থেকে, গণতন্ত্র আরো কয়েকটি জিনিসও করলে। ছোট ছোট স্থানীয় কর্তৃত্বের যে সীমানা, সেগুলি ভেঙে পড়তে লাগল গণতন্ত্রের ধাক্কায়। তার মানে, আসন্ন গণতন্ত্রের আগমনে, ছোট ছোট রাষ্ট্র ভেঙে বৃহত্তর রাষ্ট্র গড়ে উঠতে লাগল। শিল্পোন্নতি অবশ্যই একে সাহায্য করলে। কারণ শিল্পের কাঁচামাল ও বাজার তো আর ছোট এতটুকু জায়গায় গড়ে ওঠে না। গণতন্ত্রের যুগে যেমন জাতিগুলো ভেঙে ভেঙে ছোট থেকে বড় হতে লাগল, তেমনি আবার যুদ্ধগুলোও হয়ে উঠতে লাগল বিরাটতর আকারের। তবে আবার এই গণতন্ত্রেই, যুদ্ধকে চিরতরে শেষ করার কথাও মানুষ "লিগ অব নেশানস "ও "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের" মারফৎ সকলে মিলে যৌথভাবে ভাবতে শিখল।

গণতন্ত্রের যুগ থেকে আর দুটি কথা শোনা গেল: "Laisser faire! Laisser passer" এমনকি তথাকথিত "ডেমোক্রেসি" বলতে যেন এ দুটি

কথাই। এ দুটি কথার মানে হল "তৈরি করবার স্বাধীনতা, বিনিময় করবার স্বাধীনতা।" অর্থাৎ, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাধীনতা একেবারে উদ্দাম হক। কিন্তু এই তথাকথিত তৈরি ও বিনিময়ের স্বাধীনতা, যে একদিন উদ্দাম ভোগবাদ ও ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থায় এসে দাঁড়াবে, এ তখন কারুর জানা ছিল না বোতল খুলে আলাদিনের জিনকে ছেড়ে দিতে, আজ তার মাথা ঠেকেছে আকাশে। তার মুঠোর মধ্যেই আমরা। আজ প্রয়োজন অনুভব করছি আবার তাকে বোতলে পোরার। কিন্তু কোন উপায়ে যে তা পারা যাবে, তা কেউ জানে কি?

ফ্রি ট্রেডের, প্রবক্তা হল ব্রিটেন। আর ইউরোপের মধ্যে বৃটেনেই প্রথম শিল্পবিপ্লব দেখা দিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় ব্যাপার ঘটল আমেরিকায় ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে, যখন আমেরিকার রাজ্যগুলির মধ্যে, ব্যবসায়ের বাধা তুলে নেয়া হল ফিলাডেলফিয়া কনভেনশানের মাধ্যমে। এর ফলে পৃথিবীর বৃহত্তম শিল্পসমৃদ্ধ দেশ, বর্ত্তমান আমেরিকার জন্ম হল। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের ভিতরকার শুল্কপ্রাচীর উঠিয়ে দেওয়া হল। তার ফলে শিল্প প্রধান ব্যবসায়ী দেশ হিসাবে ফ্রান্সও মাথা তুললে। জার্মানীর রাজনৈতিক একীভবনের আগেই তার অর্থনৈতিক একীভবন প্রতিষ্ঠিত হল। বলা যায় এরই জন্য রাজনৈতিক দিক থেকেও এক জার্মান রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব হল।

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ইতিহাসে বিভিন্ন যুগের সভ্যতার অবক্ষয়ের কথা আলোচনা করতে বসেছি। আর তার উদ্দেশ্য হল এইটা দেখা, যে বিভিন্ন যুগে সভ্যতা বিপন্ন হয়েছেই বা কি কারণে, আবার যদি বেঁচে গিয়ে থাকে, তা হলে বাঁচলই বা কি করে? কারণ, এ দেখলে, তবেই তো তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারব বর্ত্তমান সমস্যাজীর্ণ, বিপন্ন সভ্যতাকে বাঁচাবার। আর সেইটি করতে গিয়ে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনার কথা তুলেছি। এর মধ্যে পাঠক দেখতে পাচ্ছেন, কিছু ঘটনায় যেন ভাঙ্গন ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে, দেখা যাচ্ছে। আবার কোন ঘটনা যেন একটা দিককে গড়ে তুলছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে অবক্ষয়ের ও একটা ডাইলেকটিকস আছে। তার ভিতরে শুধু ভাঙ্গন থাকে না গঠনও থাকে। যেমন তথাকথিত, সে দিনের প্রগতিশীল লেসে ফেয়ার, আজ আলাদিনের দৈত্য, এ কথা আগেই বলেছি। ঠিক এমনি ভাবেই আমাদের দেখে যেতে হবে।

একটা জিনিস, দেখা যাচ্ছে কিন্তু বারে বারে: যেখানেই মানবতাবোধ, সেখানে সভ্যতা আসন্ন অবক্ষয়ের হাত থেকেও বেঁচে গেছে। এটা আমরা দেখলাম লিঙ্কনের দাস প্রথা উচ্ছেদে। সেদিন ইতিহাসের ওই পদক্ষেপটি না ঘটলে, এক পশুসুলভ অস্তিত্বের মধ্যেই আমাদের সভ্যতা হয়ত বিলুপ্ত হত কি না; কে বলতে পারে? কয়েক ডজন সভ্যতা তো ওমনি ভাবেই খতম হয়ে গেছে। সভ্যতা মানুষের। তাই মানুষের উপর দরদ থাকলে তবেই তো সভ্যতা বাঁচবে। এটিই আমরা দেখতে পাব, আলোচনা যতই অগ্রসর হবে। আমাদের তথ্য পরিবেশন শেষ হলে, এ ধরনের জেনরেলাইজেশান করতেই হবে, ইতিহাস থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি, তা বুঝবার জন্য। কিন্তু মাঝপথে একবার থেমে, কিছু এ ধরণের কথা বললাম, তার কারণ, পাঠক ও লেখকে একটা ডায়ালগ সৃষ্টি হক।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে আমরা আজ যা বুঝি, তা জন্মাল তখনই, যখন অর্থনীতির একক হয়ে উঠল, একটি পরিবার। বণ্টনের—বণ্টন বলতে সামাজিক বণ্টনের কথাই বোঝাতে চাইছি—সুবিধাটাও এই ধরনের সমাজেই বেশী। কেননা, এখানে ছোট পরিবার বলে বণ্টন ব্যবস্থাটা আর সে ব্যবস্থার পরিচালনা সহজ। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে অর্থনীতির স্বাভাবিক একক কিন্তু এত ছোট নয়। সে একক হল সমগ্র মানব সমাজ। শিল্প জাতীয় জীবনে দেখা দেবার পর থেকে, ছোট পরিবারকেই একক হিসাবে ধরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিরই পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে। তবু পুরানো প্রথা, যেখানে সম্পত্তি সামাজিক; নিদেনপক্ষে যৌথ পরিবারের, তাও টিঁকে থাকবার চেষ্টা করেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি যাদের বেশী শিল্প তাদের দিয়েছে বেশী সামাজিক অধিকার, অথচ কমিয়েছে সামাজিক দায় দায়িত্ব। তাই এ ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যাপারটা, যদিও একদিন ছিল প্রগতিশীল, আজ তা এক সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে দেখা যাচ্ছে, এ ব্যাধি মুক্তির যে ওষুধ, তা বিপ্লবাত্মক। আর তা হল' যে কোন ধরনের সাম্যবাদ। তবু যে কোন রকমের সাম্যবাদের কথা বললে যেন শিল্পযুগ ও তার পূর্ববর্ত্তি যুগের সমস্ত ঐতিহ্য ভেঙে পড়বে এ রকম মনে হয় কারো কারো।

গণতন্ত্রের সব চে বড় কৃতিত্ব হল, শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তার। সার্বজনীনতা সম্ভব হয়েছে, কারণ গণতন্ত্রে শিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। মোটামুটি

ভাবে প্রগতিপন্থী ব্যক্তি মাত্রেই এই আবশ্যিক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন।. কিন্তু কেউ কেউ এর মধ্যেও এমন আছেন, যাঁদের মত হল, শিক্ষাকে সার্বজনীন করলে, শিক্ষার মান নিচু হয়ে যাবে। আর নিচু হয়ে যাবে শিক্ষিত মানুষের মান, যাদের মধ্যে থেকে অতীতে জন্মগ্রহণ করেছেন বিরাট বিরাট পুরুষ। তার মানে এদের ধারনাটা হল, যে আবশ্যিক সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আর সেক্সপীয়ার, গ্যালিলিও, নিউটন জন্মাবে না। ভবিষ্যৎ-বাণী করে বলা শক্ত, কে জন্মাবে আর কে জন্মাবে না। কিন্তু যদি তজন তজন মহাপুরুষ নাও জন্মায়, তাতে মানব সভ্যতার কোন ক্ষতিই হবে না, সেই মৌন মিলিয়নের মান যদি সত্যিকার মানুষের পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়। আমরা মানবতাবাদীতার কথা, যা একটু আগেই আলোচনা করেছি ; পাঠক একমত হবেন যে আবশ্যিক সার্বজনীন শিক্ষা একটি মানবতা-বাদী পদক্ষেপ।

সভ্যতার অগ্রগতিতে শ্রমবিভাগের একটা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু শ্রমবিভাগ বাড়তে বাড়তে এমন একটা স্তরে পৌঁছল, যখন তা শ্রেণীবিশেষকে একেবারে অটোমেটনে পরিণত করলে। অটোমেটন হিসাবে তার আর কোন বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তির প্রয়োজনই রইল না। সমাজে এ রকম একটা অবহেলিত শ্রেণী তৈরী হয়ে গেলে, তার ফলে একটা মারাত্মক সামাজিক ও সংস্কৃতিগত বিরোধ গড়ে উঠে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সংখ্যালঘু পরজীবী শ্রেণী শিক্ষা, দীক্ষা, আরাম, আয়েষে ভালভাবে বেঁচে আছে। কিন্তু এরা বুঝতে না পারলেও

> "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
> পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
> অজ্ঞানের অন্ধকারে
> আড়ালে ঢাকিছ যারে
> তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
> অপমানে হতে হবে, তাহাদের সবার সমান।"—রবীন্দ্রনাথ

পিছনে রাখা মানুষ সামনের যারা তাদের পিছনে টানছে। সেই লিঙ্কন যেমন বলেছিলেন। "A house divided against itself can not stand." অথচ এই তাসের ঘরে আমরা বাস করছি পরম আনন্দে।

অনুকরণ মানব সমাজের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। প্রাণী হিসাবে মানুষ অন্ত

যে কোন প্রাণীর চেয়ে বেশী অনুকরণ প্রিয়। এরই ফলে আবার তার সভ্যতা গড়ে উঠে। প্রাচীন সমাজের মানুষ, অনুকরণ করে সমাজের বর্ষিয়ানদের। পরবর্ত্তি যুগে অনুকরণ করে সমাজের অগ্রগামীদের। অনেক সমাজতাত্ত্বিকের মতে, বর্ষিয়ানদের বদলে অগ্রণীদের অনুকরণেই সভ্যতার সূচনা হয়। সংখ্যালঘু অগ্রণীদের অনুকরণ সংখ্যাগুরু সাধারণ মানুষরা অবশ্যই করে থাকে। তবু এটা একটা সীমার বাইরে গেলে, তা হয়ে উঠতে পারে সভ্যতার অবক্ষয়ের বাহন। এর উদাহরণ পাওয়া যায় হিটলার-ইজমেই। এর দীর্ঘতর আলোচনা বাহুল্য মাত্র।

হিটলারের কথাই যদি উঠল, তা হলে, এই প্রসঙ্গে মিলিটারি মনোভাব ও তার সঙ্গে সভ্যতার অবক্ষয়ের সম্পর্ক নিয়ে একটা আলোচনা করা দরকার। এর উদাহরণ হিসাবে প্রথমে তৈমুর লেনের কথা তুলছি। ইরাণ, ইরাক ও ভারতের উপর তৈমুরের আক্রমণ আজও একটা দুঃস্বপ্নের মত। তার বিভৎসতার মধ্যে নাটকের বিভৎস রস এত ছিল, যে কোন কোন নাট্যকার নাটকে এটি ব্যবহারও করেছেন। মনোবিদরা তৈমুরের খঞ্জত্ব, ও তার জন্য প্রতিহিংসা পরায়ণ হীণমন্যতার কথা নিয়েও বহু আলোচনাই করেছেন। কাজেই সে আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, তৈমুরের উৎকট সামরিক মনোভাবের কি ফলাফল হল তাই দেখা যাক। টয়েনবির মতে, "তৈমুরের উৎকট সামরিক মনোভাব নিজেকেই বোকা বানিয়েছিল।" তিনি বলছেন যে তৈমুরের তথাকথিত সাম্রাজ্য শুধু যে বাঁচল না, এতো বটেই; এমনকি তা কোন প্রভাবই রেখে যেতে পারল না। এর যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তার সবটাই নেতিবাচক। এর ফলে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়াতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হল। এই ধরনের ঘটনা সভ্যতাকে নষ্ট হতে যে কতটা সাহায্য করে, তা বলার দরকার হয় না।

এ ধরণের উদাহরণ, ইতিহাসে আরো আছে। কিন্তু আমরা এবার সভ্যতার অবক্ষয়ের আর একটি কারণে আসছি। এটি হল আত্মাভিমান, সাফল্যের অহংকার। এ ধরণের সাফল্যজাত অভিমান ও দম্ভ আসে, বেশীরভাগই যুদ্ধ জয় থেকে। প্রাচীন গ্রীস, রোম, পোপের আমলের রোম থেকে সুরু করে, জাপানের সামুরাই ঐতিহ্যেও অনুরূপ দম্ভকেই বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। জাপানী ফিল্ম ডিরেকটার কুরসুয়া, তাঁর তোলা বেশ কয়েকটি ফিল্মে, সামুরাই সুলভ অন্তঃসারশূণ্য দম্ভকে বিদ্রুপ করেছেন। একখানি ছবিতে

আছে, দুজন সামুরাই পুরুষ, হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে বীরত্বের আস্ফালন, অথচ পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে, তলোয়ারশুদ্ধ দু জনেরই হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। বিশ্বখ্যাত, প্রয়াত জাপানী সাহিত্যিক, আকুতাগাওয়া রাইনোসুকে, তাঁর বহু গল্পে সামুরাই সুলভ যুদ্ধজয়ের দম্ভকে বিদ্রূপ করেছেন।

প্রাচীন যুগের উদাহরণ ছেড়ে এ যুগেও ছোট ছোট আক্রমণে জেতার পর, হিটলারেরও অনুরূপ দম্ভোক্তির কথা, অনেকেরই মনে পড়বে। দম্ভ মাত্রেই মানবতাবিরোধী, তার উপর আবার যুদ্ধ ও যুদ্ধের মত একটা মানবতাবিরোধী কাজের দম্ভ তো-আরো জঘন্য। এ দম্ভ যে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতীক, তার ছবি দেখিয়েছেন কুরসুয়া; যে মুখে যত আস্ফালনই হক, এদিকে হাত থেকে কেঁপে তলোয়ার পড়ে যাবার উপক্রম। যুদ্ধকে বড় করে তুলে, তারই আস্ফালনে যারা মেতে ছিল, সেই সব সমাজ টিঁকে থাকে নি। বিশেষ সভ্যতার যেটুকু অংশে তা ছিল, পচনধরা অঙ্গবিশেষের মত, তা আপনিই খসে পড়ে গিয়েছে।

অনেক সময়ে দেখা যায়, একটা পুরো সভ্যতা হয়ত অবক্ষয়ী না হয়ে, তার অংশবিশেষ হতে পারে। অবশ্য সমাজের একটা অংশ অবক্ষয়ী হলে, তার ছোঁয়াচ বহুদূর অবধি পৌঁছে, সেই সমাজ বা সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। পশ্চিম ইউরোপের যে সভ্যতা আজ পৃথিবীতে, আর সব সভ্যতাকে প্রভাবান্বিত করে, এক মিশ্র সভ্যতা হিসাবে বেঁচে থাকছে, তাও হয়ত অর্দ্ধ শতাব্দি আগে, হিটলারিজমের প্রভাবে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারত।

অত্যাচারিত মানুষদের উপর চাপ সৃষ্টি হবার ফলে, সভ্যতা শুধু ভেঙ্গেই যায় না, তা পচন ধরে একেবারে নষ্ট হতে পারে। এরই সম্ভাবনা ছিল যেমন হিটলারিজমের মধ্যে, তাই হতে দেখা গিয়েছে ইজিপ্টের সভ্যতার পতনে। এর আগে আমরা লক্ষ করেছি, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষ, তার পীড়ককেও নীচে টানতে থাকে। একদিকে ভারী হয়ে যাওয়া সমাজ, এই মাধ্যাকর্ষণের ফলে ধ্বসে যেতে থাকে। এক কথায় বলা যায়, হুজুরে—মজুরে তফাৎটা যত বেশী হবে, অবক্ষয়টাও তত গভীর হবে। দ্রুত না বলে গভীর বললাম, এই কারণে, যে পতনের দ্রুততা নির্ভর করে, সমাজের গতির উপরে। আমাদের বর্তমান সমাজের মত গতিশীল সমাজে ভাঙন এলেও তা তড়িঘড়ি ভেঙ্গে ফেলতে পারে। অথচ ইজিপ্টের মত জড় সমাজে সেই ভাঙন আসে ধীরগতিতে; তাইতেই হয়ত কয়েকশো বছর চলে যায়। কিন্তু সে ভাঙন

গভীর ও সমগ্র হতে হলে তা, কি রোগে সমাজ ভাঙছে, তারই উপর নির্ভর করে। রোগটা মারাত্মক হলে ভাঙনও মারাত্মক হয়। শ্রেণী বিদ্বেষ ও শ্রেণী-শোষণ মারাত্মক রোগ। সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলতে এর জুড়ি নেই।

গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংস হবার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মেকলে বলেছেন যে গ্রীকরা ছিল পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রশংসায় মগ্ন। আর রোমানরা আত্মপ্রশংসা ছাড়া, করতে জানত শুধু গ্রীকদের প্রশংসা। এর ফলে এদের চিন্তাটা শুধু ঘুরে ফিরে এক খাতেই প্রবাহিত হত। যার জন্য প্রাচীন স্বর্ণযুগের পরে আর এদের চিন্তায় কোন নতুনত্ব রইল না। এর উপর পরবর্ত্তি সিজারদের ধারাবাহিক অত্যাচারেও যেন কোন নতুনত্ব নেই, শুধুই একঘেয়েমির দাগা বুলানো। দাগা বুলাতে বুলাতে, সাম্রাজ্যের বাইরের দিককার সীমানা মুছে আসতে লাগল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মুছে যেতে লাগল, সভ্যতার সাক্ষর ; ধ্বসে যেতে লাগল সভ্যতার ভিৎ। যা এদের ছিল, তা যেন এরা কৃপনের ধনের মতন মাটিতে পুঁতে রেখে দিয়েছিল। এতে তো আর ধন বৃদ্ধি হয় না। যে ধন ছিল তার কথাও সবাই একদিন ভুলে যেতে থাকে।

ইতিহাসের অবক্ষয়ের আলোচনায় একটি বিতর্কিত বিষয় তুলছি। অনেকে বলেন, যে পরিবেশের উপর কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতা কমে গেলেই, তখন ভাঙনের সূত্রপাত হয়। আবার ঠিক এর উল্টো কথা, আর এক দলের। তাদের মত হল, পরিবেশের উপরে অতিরিক্ত কর্ত্তৃত্বই সভ্যতার অবক্ষয়ের জন্য দায়ী। সাধারণ বুদ্ধিতে শেষের মতটা গ্রহণ করতে ইচ্ছা হয় না, তাই এই মতেরই আলোচনা করছি। ধরা যাক রোমক সিজারদের সময়কার পরিবেশ। অত্যাচারী সেই সব সিজারদের, নিজেদের লোক, লস্কর, সৈন্য সামন্ত থেকে সুরু করে, অধিকার করা রাজ্য পাট, পরাজিত—যাদের দাস করে আনা হয়েছে—ঐ সবের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা তো ছিল এরাই। এককথায় বলা যায়, সমগ্র পরিবেশ ছিল হাতের মুঠোয় ; আর সেই সঙ্গে ছিল আকাশ ছোঁয়া দম্ভ ; তবু কি বা হল ?

এতো গেল রোমান ও পূর্ব্ববর্ত্তি হেলেনিয় সভ্যতার কথা। বর্ত্তমান যুগে হিটলারকে ধরা যাক। জার্মান বিজ্ঞান ও টেকনোলজি ছিল হিটলারের হাতে। আর তার মানও ছিল ইউরোপে উচ্চতম। তার উপর তার প্রাথমিক সাফল্যের

পর, ইউরোপের সব, পদানত দেশগুলিও হিটলারের কব্জায় এসে গিয়েছিল। কিন্তু তবু কি হল ? আর অন্তরকম কিছু হলেও কি, ইউরোপীয় সভ্যতা টি'কত ? কাজেই দেখা যাচ্ছে, পরিবেশ, সম্পদ, লোকজন শুধু হাতের মুঠায় থাকলেই সভ্যতার ক্ষয় নিবারণ হবে না।

শুধু যদি পরিবেশের উপর কর্তৃত্বই শেষ কথা হত, তা হলে এই ১৯৮০ সালে বিজ্ঞান, টেকনোলজি ইত্যাদির উপরে সেই কর্তৃত্ব আমাদের হাতে যে ভাবে আজ এসেছে, ইতিহাসে এর আগে কোনদিন তা হয় নি। কিন্তু তবু আমাদেরই সমস্তা আজ সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তাই পরিবেশের উপর প্রভুত্ব থেকেই হয়ত আসে সমস্তা। তাই প্রভুত্ব নয়, চাই সখ্যতা। বন্ধুর মতন পরিবেশকে কাজে লাগাতে হবে, তার সাহায্য পেতে হবে শুধু আজ নয়, চিরদিন।

গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস বলেছেন যে "যুদ্ধই হল সকল কিছুর পিতা।" তাঁর মত একজন দার্শনিক কোন সামাজিক ঘটনাচক্রে এ কথাটি বলেছিলেন, আর্ণল্ড টয়েনবি তা বিশ্লেষণ করেছেন। টয়েনবির বিশ্লেষণটিই লক্ষ্য করা যাক। তিনি বলছেন, "Since the vulgar estimates of human prosperity are recorded in terms of power and wealth, it thus often happens that the opening chapters of a societie's tragic decline are popularly held as the culminating chapters of a magnificent growth. Sooner or later however disillusionment is bound to follow; for a society that has incurably divided against itself is almost certain to put back into the business of war, the greater part of those additional resources, human and material, which the same business has accidentally brought in to its hands." এর উদাহরণ দিতে গিয়ে টয়েনবি বলছেন, যে আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের ফলে, প্রচুর লোকবল ও অর্থবল, তাঁর সেনাপতিদের হাতে এসে গেল। তার ব্যবহারটা ঘটল পারস্পরিক গৃহযুদ্ধে। আবার রোমের গৃহযুদ্ধ, যা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ঘটল, তার মূলেও ওই একই ব্যাপার। টয়েনবি বলছেন যে পরস্পর বিরোধ আর খাওয়াখায়ীতে সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও সচল ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ে। এই হল অবক্ষয়ের সুরু। এরই সঠিক চেহারাটা বুঝতে না পেরেই কোন কোন দার্শনিক যুদ্ধের জয়গান করেছেন। তাঁরা

হিরেক্লিটাসই হন, আর নিৎশে কি হেগেলই হন, টয়েনবির মত কেউ তলিয়ে দেখেন নি।

টয়েনবির কথা মত আরো একটি কথা না বলে পারছি না। টয়েনবি সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য অনেকেই করে থাকেন। কিন্তু যত বিরূপতাই থাক, তাঁর "A Study of History" বইটির কোন তুলনা হয় না। বইখানির সৌন্দর্য হল এর প্রচুর জেনারেলাইজেশানের মধ্যে। পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতীর ইতিহাস নিয়ে এই স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষমতা পৃথিবীর আর কোন ঐতিহাসিকের আছে বলে জানি না।

ইতিহাসে সমাজ ও সভ্যতার ভাঙনের কথা বলতে গিয়ে টয়েনবি দু রকম ভাঙনের কথা বলেছেন। এর একটি হল উপর থেকে নিচে, (vertical) আর অন্যটি পাশাপাশিভাবে (horizontal)। এর মধ্যে প্রথমটি ঘটে যুদ্ধ বিগ্রহ, বিশেষ করে গৃহযুদ্ধে। টয়েনবির মতে এতে সভ্যতা কি সমাজ একেবারে ধ্বংস নাও হতে পারে। অন্য ধরনের ভাঙনের অর্থাৎ পাশাপাশি ভাঙনের মূলে আছে শ্রেণী সংঘাত। টয়েনবির মতে, এই ভাঙন দেখা যায় যখন সভ্যতা ভেঙে পড়ছে, তখনই। এই ভাঙনেই বোঝা যাবে সমাজের অবক্ষয়ের আসল রূপটি। অথচ এই অবক্ষয়ী শ্রেণীবিন্যাস সভ্যতা যখন গড়ে উঠছে, তখন থাকলেও এত পরিষ্কার হয়ে ওঠে না।

কি ভাবে শ্রেণী তৈরি হয়, এটাও টয়েনবি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, ইতিহাসে সমাজের সংখ্যালঘু যে চালক সম্প্রদায়, সৃষ্টিশীলতার জন্যই তাদের চালিকাশক্তি। সৃষ্টিশীলতার প্রভাবেই তারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করে রাখতে পারে। যদি সৃজনশীলতাটুকু হারিয়ে ফেলে, তখন আর তাদের, মুগ্ধ করার মত কোন গুণই থাকে না। তখন সংখ্যাগুরুদের উপর ক্ষমতা বজায় রাখতে হয়, শুধু মাত্র গায়ের জোরে। এই অবস্থায় নিজে মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সংঘাতে, অনেকেই আর গদি বজায় রাখতে পারে না ; ক্ষমতার সৌধ থেকে তাদের পতন হয়। টয়েনবি বলেছেন যে এরাই হয়ে ওঠে, "ইন্টারন্যাল প্রলেটারিয়েট।" আর "এক্সটারন্যাল প্রলেটারিয়েট" হল, যারা গোড়া থেকেই বাইরে। যারা দাস, যারা ক্ষমতার অধিকারী কোনদিনই হতে পারে নি, এই ভাবে সেই শ্রেণী জন্মায়। পাশাপাশি (horizontal) ভাঙনের সূচনার সময় সব শ্রেণীবিন্যাসই প্রকট হয়ে ওঠে। আর শ্রেণীতে শ্রেণীতে তফাৎটা সব জায়গায় একই।

তা ছাড়া এই ভাঙ্গনের সময়ে, টয়েনবি বলছেন যে সেই সমাজ বা সভ্যতার আত্মাও যেন ভেঙে যেতে থাকে। "আত্মা" শব্দটি দিয়ে তিনি ঠিক কি বলতে চাইছেন, তার অর্থ হয়ত এক একজনের কাছে এক এক রকম হবে। তবু কোন সমাজ, সভ্যতা বা কালচারের ভিতর যেন জীবন্ত একটা প্রাণশক্তি থাকে। টয়েনবির আত্মা কথাটা শুনে যেন সেইটির কথাই মনে হয়। ইতিহাস পদার্থবিজ্ঞান বা গণিতের মত নয়। তাই সেখানে অনুভূতি রাজ্যের কথা কিছু কিছু এসে যাবে। সম্মিলিত মানবজাতীর আশা, আকাঙ্খা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা এই সব নিয়েই তো ইতিহাস। তাই হৃদয় রাজ্যের খবরও ইতিহাসকে একটু আধটু রাখতে হবে বৈ কি।

পতনের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ হয়ত একেবারে পুরোপুরি সাজানই রয়েছে, তবু কখনো কখনো কোন সভ্যতা, আরো কয়েকশো বছর টি'কে থাকে। যেমন খৃস্টপূর্ব ৯৩৭ সালে সলোমনের মৃত্যুর পরই, সিরিয়ার সভ্যতার পতন হল। এর সম্পর্কে এই কথাই বলা যায়, যে ধনে, সম্পদে, সব কিছুতে, রাজা সলোমন, হয়ত এমন একজন যুগপুরুষ ছিলেন, যে তিনি চলে যাবার পর, সিরিয়ার সভ্যতা আপনি ভেঙ্গে পড়তে লাগল। অবশ্য এ কথা ঠিক যে ইতিহাসে ব্যক্তিকে যতটা প্রাধান্য আমরা দিয়ে থাকি, ব্যক্তি তত বড় নয়। কিন্তু ব্যক্তির চিন্তা, তার প্রেরণা ইত্যাদি, জনচেতনার অংশের উপরে প্রভাব সৃষ্টি করে। তারপর উত্থান, পতন, যা কিছুই হয়, জনগণই তার নায়ক।

মার্কসের কথা তাঁর বইয়ে আলোচনা করতে বসে, টয়েনবি বলছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ভেঙ্গে, প্রোলেটারিয়েটদের ডিক্টেটারীর মাধ্যমে শ্রেণীহীন সমাজে পরিণত হবে; শ্রেণীহীন সমাজ একদিন আবার ডিক্টেটারসিপকে, এমনকি রাষ্ট্রকেও বাতিল করে, মানুষকে দেবে প্রকৃত সাম্য আর স্বাধীনতা: এই কথা বলেছেন মার্কস। মার্কস তাঁর সামনে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার ভেঙ্গে পড়াটা সঠিক দেখতে পেয়েছিলেন। টয়েনবি বলছেন, "The interest of marxist eshatology for our present inquiry lies in the surprising fact that this lingering political shadow of a vanished religious belief does accuratelly plot out the actual course which the class war or horizontal schism in a broken down society is apt to follow as a matter of historical fact."

মার্কস পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার যে ভাঙনের উপর ভিত্তি করে, সাম্যবাদের আগমনের কথা বলেছেন, তার আলোচনা করতে গিয়ে টয়েনবি বলছেন: যে এই ভাঙনের যে দুটি বিপরীত শক্তি, সেই দুটি শক্তিই নেতিবাচক, ঈর্ষা বা অনুরূপ অনুভূতি জাত। এর একদিকে ক্ষমতাসীন সংখ্যালঘু, গায়ের জোরে তাদের ক্ষমতা ধরে রাখতে চায়, যা করতে চাইবার কোন যোগ্যতাই তাদের আর নেই। আবার অন্যদিকে সর্বহারারা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রোষ, ভয়ের বদলে ঘৃণা, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসা দিয়েই এর মোকাবিলা করে। তবু সবটা জড়িয়ে একটা সৃষ্টিশীল ইতিবাচক দিক, রূপ পরিগ্রহ করে। এ থেকে জন্মায় বিশ্বরাষ্ট্র, বিশ্বধর্ম ও ইণ্টারন্যাল প্রলেটারিয়েট। টয়েনবির সঙ্গে, প্রতিটি শব্দ চয়নে হয়ত অনেকেই একমত হবেন না। কিন্তু এ হৃদি বাহ্য। টয়েনবি বলছেন যে এই ভাঙন, একসঙ্গে ভাঙা, গড়া দুই।

টয়েনবির তথাকথিত ইণ্টারন্যাল প্রলেটারিয়েট ও এক্সটারন্যাল প্রলেটারিয়েট, কথাদুটি ও এদের উদ্ভব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা উচিত। টয়েনবি বলছেন যে এদের উদ্ভব গ্রীক ও রোম্যান আমল থেকে। "প্রোলস" শব্দটির অর্থ হল সন্তান। তা হলে প্রোলেটারিয়েট কারা? না যাদের থাকার মধ্যে, শুধু আছে সন্তান। অর্থাৎ এদের ধন, সম্পদ, এমনকি মানসিক সম্পদও নেই। সন্তানই হচ্ছে এদের একমাত্র সম্পদ। সন্তান কাজ করে কিছু বিত্ত উপার্জন করে, তা ছাড়া, সংখ্যাধিক্য হয়েই অত্যাচারী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু পাঠকের মনে আছে, যে এর আগে বলেছি, যে ইণ্টারন্যাল প্রোলেটারিয়েটরা একদিন শাসকশ্রেণীভুক্ত ছিল। নিজেদের সব গুণ হারিয়ে তারা শাসক হবার সব যোগ্যতাই হারিয়ে ফেললে। থাকার মধ্যে তাদের রইল, শাসকের মেজাজটা। সমাজের পরিবর্তন, বিবর্তন, ভাঙা, গড়ায়, এরা নিজেদের ভোল বদলে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। এরাই কখনো সুবিধামত বেতনভুক সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছে। যে টাকাটা হয়ত পরদেশ অধিকার করার সময়ে হাতে এসেছে, তাই খরচা করা হয়েছে বেতনভুক সৈন্য পুষতে। হঠাৎ অনেক টাকা এসে, টাকার মোট আয়তন বেড়ে যায় বলে, জিনিসপত্রের দাম হয়ে যায় আকাশছোঁয়া। যারা চাষ করে ও হাতে করে জিনিস বানায়, তারাই অল্পবিত্ত বলে সব চেয়ে দুস্থ হয়ে যায়।

ইউরোপে এ ধরনের আঘাত বার বার এসেছে। হানিবলের যুদ্ধের পর,

ইতালীর চাষীরা জমি থেকে উৎখাত হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র শিল্প ও চাষের কাজ ছেড়ে তখন এদের বাধ্য হয়ে হতে হয়েছে বেতনভুক সৈনিক। তাই টয়েনবি বলছেন, যে প্রোলিটারিয়েট শুধু তার দারিদ্র্যের হিসাবেই হয় না। এটা একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা। এতে সেই ব্যক্তির মনে হতে থাকে যে, সমাজে তার যে জায়গা, তা থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে। এই হল যথার্থ প্রোলেটারিয়ান অনুভূতি। গ্রীক ও রোমান যুগেও এমনি ভাবে বহু লোক, কিছু তাদের অভিজাত, কিছু কৃষক, ক্ষুদ্রশিল্পী আত্মার দারিদ্র্যে প্রোলেটারিয়েট হয়ে গেছে। এদের মধ্যে ছিল, নিজেদের সমাজের ছিন্নমূল লোক ; অন্য সমাজ থেকে ছিঁড়ে আনা লোক ; বার বার যারা ছিন্নমূল হচ্ছে, এ রকম বেতন ভুক সৈনিক। যারা তাদের উপর তলার, তাদের ঠাণ্ডা মাথায় করা অত্যাচারের বিনিময়ে, এ লোকগুলি আরো অসভ্য ও বর্বর হয়ে উঠতে থাকে। দুদিক থেকে মানবতার এ অপমান যে সমাজ ও সভ্যতাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, এ তো স্বাভাবিক। এই মানুষের কেউ কেউ শাসক শ্রেণীর উপর আঘাতও হানতে চেয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, স্পার্টাকাসের বিদ্রোহ।

খৃষ্টান ধর্ম এসে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে রোমক সভ্যতার গুরু পরিবর্তন দেখা দিল। রোম্যান ধর্মে ছিল, সর্বব্যাপী রোমক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সীজারকেই পূজা করা। কিন্তু খৃষ্টানরা এ কাজ করতে অস্বীকার করলে। ফলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সুরু হল। কিন্তু রোমানরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখল যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরা হিংসার পথ গ্রহণ না করে, অহিংসভাবে প্রাণ দিতে লাগল। রোমানরা অবাক হয়ে গেল খৃষ্টানদের এই শক্তির কাছে। আত্মার এই অদম্য শক্তির কাছে, রোম সম্রাটের গভর্ণমেন্টই যেন আত্মসমর্পণ করলে।

এর একটা অন্য কারণও ছিল। প্রতিটি খৃষ্টানের যে বিশ্বাস, তা এত গভীর, যে তার জন্য প্রাণ দেয়াটাও বেশী নয়। কিন্তু সেই জায়গায় রোমানদের রোমক সম্রাটের উপর ভক্তিটা ভাসা-ভাসা। নেহাৎই লোক দেখান ব্যাপার। তা ছাড়া জীবপ্রেম, স্বার্থশূন্যতা ইত্যাদি বহু মানবতার-উদ্দীপক মনোভাব, রোমকদের মধ্যে প্রায় অজানাই ছিল। খৃষ্টানদের এই জয়, পাশবিকতার বিরুদ্ধে মানবতারই জয়। ইতিহাসের বিবর্তনে দেখা যায় পাশবিকতার তুলনায় মানবতাই বেঁচে থাকে।

ঠিক যে ছবি ইউরোপে দেখা গেল টয়েনবির ইন্টারন্যাল প্রলেটারিয়েট

সম্পর্কে, ভারতবর্ষে কিন্তু ঠিক ওই ছবি দেখা যায় নি। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখনই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ভারতে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। এই দুটি ধর্ম, ভারতের আত্মার আশ্রয় হয়ে উঠল। খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত সম্রাট অশোকের রাজত্বে বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতকে ছেয়ে ফেললে। ভারতের ক্লীষ্ট আত্মা এর মধ্যে পেল বিরাট আশ্রয়। ইউরোপে আগত খৃষ্ট ধর্মের সঙ্গে তুলনা করলে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসটা একটু ভিন্ন। বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রাচীন। হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মও ভারতের মাটিতেই যেন মিশে ছিল। তাই এর ইতিহাস, এক রোমে খৃষ্টান ধর্মের ইতিহাস এক হবে না। আর এই জন্যই, তথাকথিত ইন্টারন্যাল প্রোলিটারিয়েটের উপর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবের ছবি ভারতে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া ভারতের গ্রাম্য অর্থনীতিও এই সব বিদেশী আক্রমণ সত্ত্বেও ইউরোপের মতন এ দেশের মাটিতে তথাকথিত ইন্টারন্যাল প্রোলেটারিয়েট তৈরি করতে পেরে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গেই টয়েনবি আরো একটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত যে শ্রেণী, তাদের মধ্যে প্রোলেটারিয়েট মনোভাব কিছু কিছু আছে। কারণ যে শ্রেণী থেকে এদের উদ্ভব, সেই লোকজনদের থেকেই যেন এরা বিচ্ছিন্ন। এরা অনুভব করে, এরা যেন বর্ণসঙ্কর। যেখানে এদের জন্ম ও যে শিক্ষা এদের, তা নিয়ে কারো কাছেই যেন এদের ঠাঁই নেই। রাজত্ব রক্ষার খাতিরে যে হিন্দু বুদ্ধিজীবী বাবু সম্প্রদায়কে বৃটিশ রাজই তৈরি করেছিল আবার এই বাবুরাই তাদের কাছে ছিল বিদ্রূপের বস্তু। এরা তাই ছিল প্রোলেটারিয়েট, "by being 'in' not 'of' the two societies." তা ছাড়া শাসকদের কাছে মানুষও একটি পণ্যবস্তু। তাই দেখা যায়, চাহিদার অনুপাতে বুদ্ধিজীবীদেরও 'ওভারপ্রোডাকশান' হয়ে গেলে বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

একবার এই বুদ্ধিজীবী তৈরির কারখানা গড়ে তুললে, আর ইচ্ছামত তা বন্ধ করা যায় না। আর তাদের 'উৎপাদনও' হতে থাকে, যত কাজ আছে, তার তুলনায় অনেক বেশী। একদিন হয়ত 'বি-এ ফেল' কোন বাবু 'ডেপুটি গিরির' উপযুক্ত বলেই বিবেচিত হত। ক্রমে ক্রমে ডক্টরেটও বেকার হয়ে বসে থাকে। রুশ দেশেও পিটার দি গ্রেটের আমলে যে বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব, তারা তাদের সমাজের উপর তাদের পুঞ্জীভূত ক্রোধের সমাধান খুঁজে পেল ১৯১৭ সালের বিপ্লবের মাধ্যমে। ভারতেও আমরা দেখি পশ্চিমবাংলায়, যেখানে

প্রথম এই বুদ্ধিজীবী, ইণ্টারন্যাল প্রলিটারিয়েটদের তৈরি করেছিল বৃটিশরাজ, সেখানেই দেখি এই শ্রেণীর মানুষরাই দেশ স্বাধীন হবার পরও তাদের বিপ্লবী মনোভাব বজায় রেখেছে। এতটা বিপ্লবী মনোভাব ভারতের কোনো জায়গায় দেখা যায় না। তাই আজ অবধি ভারতে যদি অন্য কোন রাজ্যে কোন আন্দোলন হয়, তার প্রগতিশীল বিপ্লবী চরিত্রটা পশ্চিমবাংলার মত নয়।

বাংলার বুদ্ধিজীবী বাবুদের ধরনের নিম্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষরাই আর কোন সুযোগ সুবিধা না পেয়ে, ইতালিতে ফাসিস্ট পার্টির ও জার্মানীতে নাৎসী পার্টির সমর্থক হয়ে উঠেছিল। সুসংবদ্ধ ধনতন্ত্র ও সুসংবদ্ধ শ্রমজীবীদের, দুদিককার চাপে, এই বুদ্ধিজীবী সর্বহারা, প্রোলেটারিয়েটরা ছিল নিষ্পেষিত। তাই তারা হিটলার ও মুসোলিনীর অভ্যুদয়ে নিজেদের আশার আলো দেখতে পেয়েছিল। ইতিহাস প্রমাণ করলে যে সে আলো আলেয়ার আলো।

ইতিহাসের শিক্ষা বলতে বোঝায় কোনটা আলো আর কোনটা আলেয়া তাই সঠিকভাবে বোঝা। বর্তমান অধ্যায়ে যেটুকু ইতিহাস চর্চা আমরা করেছি তা এই কথাটি মনে রেখেই। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে সভ্যতার যে সঙ্কট এসেছে তার কারণগুলো বোঝার উদ্দেশেই এই ইতিহাস চর্চার অধ্যায়টি। এখানে আমাদের বুঝতে হবে কোনটা আলো আর কোনটা আলেয়া। সে যুগের মানুষরা এইটি না বুঝতে পেরে কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা না করতে পারায় হয়ত তাদের সভ্যতাই নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা যদি আমাদের সভ্যতাকে বাঁচাতে চাই, তা হলে সঠিক ব্যবস্থাই নিতে পারা চাই।

যন্ত্রশিল্প যখন শিল্প বিপ্লবের সূচনা করল, তখন যারা যন্ত্রের ভক্ত ও শিল্প বিপ্লবের প্রবক্তা, তাঁরা ভাবলেন যে বুঝি এই শিল্প বিপ্লবই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু অল্প মজুরি, কাজের দীর্ঘ সময়, শিশু ও নারীশ্রমিক সমস্যা, শ্রমিকদের দারিদ্র্য, আবর্জনাময় ক্ষুদ্র বাসস্থান, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, ধোঁয়া-ধূলা-আবর্জনাময় দূষিত পরিবেশ, অপুষ্টি ও রোগের প্রাধান্য, নিরানন্দ-ময়তা ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছুই এসে হাজির হল শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের নিন্দা করলেন সংবেদনশীল বহু মানুষ। কিন্তু যন্ত্র শিল্পের প্রবক্তারা বললেন, এ সবই স্বল্পস্থায়ী। ক্রমে ক্রমে এ সব দূর হয়ে নবযুগ আসছে। কিন্তু

এক আধ দিন নয়, দেড়শো বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এর মধ্যে কতটুকু হয়েছে ?

শিশু ও নারী শ্রমিকদের সুবিধাজনক কিছু আইন করা হয়েছে, শ্রমের ঘণ্টা বেঁধে দেয়া হয়েছে, বাসস্থান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর কথার সুপারিশ হয়েছে, শ্রমিকদের কিছু শিক্ষা ও আনন্দদানের ব্যবস্থা হয়েছে, মূল্য মানের পিছু পিছু দৌড়তে গিয়ে কিছু কিছু মজুরি বৃদ্ধিও হচ্ছে, কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থা যে কে সেই। তারা শুধু নাগরিক প্রলেটারিয়েট, যারা টয়েনবির কথায়, "he is 'in' a society but not 'of' it." কিন্তু এটা তো হল বরফের শুধু যতটুকু উপরে ভেসে থাকে ততখানি। সমস্যাটা তলায়, যতখানি তার কিছু কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে অতীতের সমস্যাগুলি দেখবার চেষ্টা করছি। অতীতে এমন সব সমস্যা ছিল, যাতে এক একটি সমাজ বা সভ্যতা হয়ত ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তবু একটা কথা নিশ্চিত যে বর্তমান যুগে সামগ্রিকভাবে যে সমস্যা, তার সঙ্গে অতীতের সমস্যাগুলির তুলনা হয় না।

মার্কসের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক টয়েনবি আবার এক জায়গায় বলছেন যে মার্কস "ঐতিহাসিক প্রয়োজন"কেই করে তুলেছিলেন ভগবান। "ঈশ্বরের নির্বাচিত লোকের" স্থান দিয়েছিলেন, প্রোলেটারিয়েট বা সর্বহারাদের আর "প্রোলেটারিয়েট শাসনকে" দিয়েছিলেন স্বর্গরাজ্যের স্থান। মার্কসের মনে এই চিন্তা ছিল কিনা জানি না। তবে টয়েনবি এখানে মার্কসের চিন্তাকে বাইবেলের মডেলে ঢেলে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। যেমন অনেক মুসলমান আবার বলেন, সাম্যবাদ তো কোরাণের বিধান। এ রকম মডেল তো আর পৃথিবীতে একটা নয়। তবে, একটা জিনিস, ইতিহাসের আলোচনাটা যতই এগুচ্ছে, ততই বেশী করে যা দেখা যাচ্ছে, তা হল, মানুষের বাঁচার জন্য, সভ্যতার বাঁচার জন্য, কোন না কোন রকমের মানবতাবোধ অত্যাবশ্যক।

মার্কসবাদ প্রভাবিত মানবতাবাদ, কিন্তু সারা বিশ্বের চিন্তাকে আজ এমন ভাবেই প্রভাবিত করেছে যে টয়েনবি বলেছেন, "Capitalism and Communism like intervention and non-intervention according to Sardonic dictum of Talleyrand are becomming different names for very much the same thing." কথাটা শুনে পাঠকের হয়ত একটু খটকা লাগবে, যে এ আবার কি রকম কথা, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একই মানে

দুয়ের ? কিন্তু আজ ধনতন্ত্রকেও কিছু দিয়ে, কিছু ত্যাগ স্বীকার করে, খানিকটা এগুতে হচ্ছে সাম্যবাদের দিকে। নির্বাচনের সময় পার্টিগতভাবে দেখা যায় আজকাল, সাম্যবাদী পার্টি বা তাদের বিরোধী পার্টি হক, সকলেই যে জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম, নির্বাচকদের সামনে হাজির করে, তা মার্কসবাদেরই অনুকূল। তারপর সে প্রোগ্রাম কতটা কাগজ কলমে থাকে আর কতটা করা হয়, সে কথা স্বতন্ত্র।

মানবতা ও সভ্যতা পরস্পরের খুবই কাছের জিনিস। তাই সব সভ্যতাতেই মানবতার গুণগুলি, যেমন, অন্যের প্রতি ভালবাসা, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি কিছু না কিছু পরিমাণে থাকেই। এগুলি আবার সংক্রামক বটে, ঠিক যে রকম চাষ-বাস ইত্যাদি জিনিসগুলিও সংক্রামক। যেমন, নিউগিনির পাপুয়াতে দেখা গেছে, এখানে কোন সভ্যতার ছায়াপাত, কোনদিন ঘটেছিল বলে জানা নেই। তবু এদের চাষবাস সম্পর্কে যে ধারনা ও সুব্যবস্থা প্রচলিত, তা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয়ত আমাদের জানা না থাকলেও, কোন সভ্যতার সংস্পর্শে এরা কোনদিন এসেছিল। অথচ এসব সভ্যতার কথা আমাদের জানাই নেই। তেমনি আবার অধ্যাপিকা মার্গারেট মিডের "Growing up in Samoa" বইটি পড়লে, সামোয়া দ্বীপের মানুষদের যে মনুষ্যত্বের গুণাবলী দেখা যায়, তা আমাদের গুণের চেয়ে মহত্তর। কোথা থেকে তা এসেছে, আমরা জানি না। কিন্তু অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ মিড যা বলেছেন, তা বিশেষ অনুধাবন যোগ্য।

ডাঃ মার্গারেট মিডের মতে পশ্চিম দুনিয়ায় আজ পারস্পরিক অবিশ্বাস, দুশ্চিন্তা, মিথ্যাচার ইত্যাদিতে যে পরিমাণে বিপর্যস্ত তাতেই এই মানুষগুলির জীবনের মূল্য-মান গ্রহণ করতে পারলে, সভ্য দুনিয়া হয়ত একটা মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারত। হয়ত অনেকে বলবেন, ওদের কালচার কোথায় ? আর কালচার না হলে কি আর সভ্যতা হয় ? কিন্তু অধ্যাপিকা শ্রীমতী মিডের মতে, আমাদের হিসাবে হয়ত ওদের কালচারের দাম নেই। আবার এমনিও হতে পারে যে ওদের কাছেও হয়ত আমাদের কালচারের দাম নগন্য। ব্যাপারটা খুবই আপেক্ষিক।

তবে এ কথাও আবার ঠিক, যে সভ্যতা হতে হলে, তার একটা কালচার থাকতে হবে। সভ্যতার দীপ্তি তিনটি বিশিষ্ট দিকে বিচ্ছুরিত হয়। এর একটি

হল অর্থনীতি, একটি রাজনীতি, আর একটি হল সংস্কৃতি বা কালচার। সভ্যতার যতদিন শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এই তিনটিই চলতে থাকে সমানভাবে। কিন্তু সভ্যতার অবক্ষয় সুরু হলেই, প্রথম হয় সবচে আগে সংস্কৃতি। অবক্ষয়ী সভ্যতাকে তখন, অবক্ষয়েরই পথে চালিয়ে নিয়ে চলে ধনদেবতা ম্যামন, আর যুদ্ধদেবতা মারস। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সফলতাই একটি সভ্যতার শ্রীর পরিমাপক নয়; কিন্তু সংস্কৃতি অবশ্যই।

গ্রীক সভ্যতা, ও গ্রীক দেব দেবীদের পরিচ্ছন্ন ছবি পাই হোমারে। তাই যখন হোমারের মহাকাব্য লেখা হচ্ছিল, তখনই হয়ত ছিল গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণ যুগ। ঠিক অনুরূপ ভাবেই হয়ত আমরা বলতে পারি, মহাভারত যখন লেখা হচ্ছিল, সেটাই ছিল সভ্যতার উঠতির সময়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবশ্যই একটা বিরাট যুদ্ধ ছিল, কিন্তু তার ফলে যদি সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে যেত, তা হলে আর হয়ত মহাভারতের মত কাব্য সৃষ্টি সম্ভব হত না। ইউরোপেও যে রেনেশাঁ বা নবজাগরণের সূচনা যখন হল, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান কোন দিকেই বা সে জাগরণ ফুল ফোটায় নি? সভ্যতার সূর্য যখন মধ্যগগনে থাকে তখনই এ সব ফুল ফোটে।

সভ্যতার অবক্ষয়ের কথা বলতে গিয়ে উইলিয়াম ইঞ্জ, তাঁর "Idea of Progress" বইয়ে একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলছেন, "Ancient civilisations were destroyed by imported barbarians, we breed our own." টয়েনবি সমাজে ইণ্টারন্যাল ও এক্সটারন্যাল প্রোলেটারিয়েটদের কথা বলেছেন। ইণ্টারন্যাল প্রোলেটারিয়েট নিয়ে আলোচনা করেছি। এক্সটারন্যাল প্রোলেটারিয়েটদের কথায় তিনি বলেছেন যে, শাসক সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে এদের উদ্ভব। শাসক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন নিজেদের সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে ও তাদের মধ্যে একদলকে কোন ঠাসা করে দেয়া হয়, তখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে এরা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন এরা নিজেদের তথাকথিত "War band"এ পরিণত করে। এদেরই টয়েনবি বলেছেন "এক্সটারন্যাল প্রোলেটারিয়েট"। এক্সটারন্যাল বলছেন কারণ তারা কোনদিনই বৃহত্তর সংখ্যাগুরুদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে নি।

আমাদেরই জীবনকালে যারা মুসোলিনির মন্ত্রশিষ্য, ব্ল্যাক সার্টে পরিণত হল, তাদের কি শেখানো হয় নি, যে সমাজ তাদের বিধাতা?

তাই লড়াই করে তাদের বাঁচার জায়গা করে নিতে হবে। কাল চামড়ার লোকেদের সভ্য করার কথা যত বড় গলা করেই মুসোলিনি উচ্চারণ করে থাক, ইথিওপিয়ার যুদ্ধে কাল চামড়া নয়, কালো সার্টরাই ছিল প্রকৃত বর্বর। মুসোলিনি নাকি একবার বলেছিলেন যে বিরাট বিরাট ইংরাজ ও ফরাসী ব্যক্তিত্ব, বৃটিশ ও ফ্রেঞ্চ কলোনির জন্ম যা করেছিলেন, তিনিও ঠিক তাই করছেন। টয়েনবি বলছেন মুসোলিনির নব-বর্বরতায় সত্যিই সেই বহু প্রশংসিত ইংরাজ মন্ডেল, ক্লাইভ, ড্রেক ইত্যাদির রূপটাই প্রতিফলিত দেখি।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে আধুনিক ইতিহাস পর্যন্ত সর্বত্রই দেখি যে রাজনীতি যুদ্ধোদ্যম, আর্থিক স্বচ্ছলতা, এ সবই ভালভাবে টিঁকে থাকতে পারে, যখন সংস্কৃতি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আর সংস্কৃতিই তো সভ্যতা।

ইতিহাস, শুধু মানুষের বাইরের দিকটার খবর রেখেই শেষ হয়ে যায় না। ইতিহাস, মানুষের হৃদয়ের মানুষের আত্মারও ইতিহাস। মানুষের ইতিহাস। এ গুলি যখন মলিন হয়, অথবা এগুলির মধ্যে যখন ফাটল ধরে, তখনই সভ্যতা বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে। এখানের ফাটলও আবার উপর থেকে নিচে পর্যন্ত হতে পারে, আর তা না হলে, বিপন্ন শ্রেণীর মধ্যে হতে পারে। প্রথমটিই বেশী গভীর ও বিপদসঙ্কুল।

কালচার শব্দটাকে কৃষ্টি বললে, শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ নাকি অসন্তুষ্ট হতেন। তার কারণ তিনি বলতেন, কথাটার মধ্যে একটা চাষাড়ে গন্ধ রয়েছে। তবু আবার এ কথাও ঠিক, মানুষ যদি কৃষিকাজের ধাপ অবধি বিবর্ত্তনের পথে না এগুতে পারত, না হলে সংস্কৃতি বলে কোন জিনিসই তৈরি হত না। ঘটনাটা শারীরবৃত্তিক ও সামাজিক দিক থেকে কি ভাবে ঘটল, তাই বলি।

কৃষিকাজের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে শিখতে হল, কি ভাবে হাত, পা ও সারা শরীরের ছোট ছোট মাংসপেশীগুলিকে চালনা করে ছোট ছোট প্রয়োজনীয় অল্প কাজগুলি করা যায়। মস্তিষ্কে এই সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পেশীগুলি চালনা করতে করতে, তারও সমুখভাগের অনেক উন্নতি হল। মস্তিষ্কের সমুখ ভাগটাই চিন্তন, মনন এ সব করে থাকে। তাই এই সব ছোট, ছোট, সুন্দর কাজগুলিই মানুষের সমগ্র চিন্তাশক্তি বাড়িয়ে দিল। এই ভাবেই মানুষের মনটা সংস্কৃতির সৃজন, ধারণ ও বাহনের উপযুক্ত হল। এটাতো হল শুধু একটা দিক।

অপর দিকে, কৃষিকাজ জানার আগে, শিকারী ও খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষকে

সারা সময় শুধু খাদ্যের সন্ধানেই ছুটতে হত। তাই তার আর একটুও অবসর থাকত না। সেই জায়গায় কৃষি আসার পরে মানুষের পক্ষে খাদ্য বাঁচিয়ে সঞ্চয় করা সম্ভব হল। এর ফলে মানুষের জীবনে অবসর এলো। উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি আর অবসর, এই দুটি একসঙ্গে থাকায়, সংস্কৃতির সৃজন সম্ভব হল।

কৃষির কথাটা উঠল বলে আর একটা কথা বলে নি। কৃষি, যার সঙ্গে পশুপালন একাত্ম, তার মূলে একটি জিনিস। সেটি হল উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রজনন সম্পর্কে জ্ঞান, ও সেই জ্ঞানকে কাজে লাগান। জীবের প্রজনন সম্পর্কে আজও কিন্তু আমাদের সব জ্ঞানটা নেই। তা হচ্ছে ধাপে ধাপে। যেমন গোবরে বীজাণুর প্রজনন ও বৃদ্ধি কাজে লাগিয়ে হয়েছে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে পাঠকের মনে আছে, আমরা পুনরাবর্তন, পুনর্নবীকরণ, বা রিসাইক্লিংএর কথা বলেছি। যেখানে যেখানে আমরা রিসাইক্লিং করতে পারছি বা পারব, তা হবে বিপন্ন মানব সভ্যতার পক্ষে বাঁচোয়া। এটা যত বেশী করতে পারি ততই ভাল।

এবার আবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসি। বাইবেলের লুক ১৭ : ২০-১ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "The kingdom of God cometh not with observation ; neither shall they say, Lo here! or lo there! for, behold, the kingdom of God is within you." স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে যে বক্তব্য, তার বাচনভঙ্গী ও বক্তব্যের ভিতরকার মানসিকতাটি লক্ষ্য করতে হবে। বৈজ্ঞানিক মানুষের কাছে স্বর্গরাজ্য কাল্পনিক অবাস্তব ব্যাপার। কিন্তু একটা ব্যাপার তবু পরিষ্কার হয়ে ওঠে, যে বাইবেলের স্বর্গরাজ্য, আর কাজার জিউসের নাগরিক স্বর্গ, এ দুয়ের মধ্যে তফাৎটা আকাশ পাতাল। বাইবেলের স্বর্গটা যেন ইতিবাচক; তা হলেও হতে পারে এইরকম একটা বাস্তবের—অন্ততঃ একটা মনোজগতের বাস্তবের কাছাকাছি। কিন্তু সেই জায়গায় জিউসের স্বর্গভূমি নেতিবাচক ; একেবারে রূপকথার রাজ্য।

অথচ গ্রীকরা সভ্য। তাদের দর্শন, বিজ্ঞান, সবই ছিল অতি উন্নত পর্যায়ের। কিন্তু তবু তাদের দেব দেবী, তাদের স্বর্গরাজ্য ছিল এমন, যা প্রাণের বস্তু নয়। সেই জায়গায় খৃষ্টান ও তাদের পূর্বসূরি ইহুদিরা ছিল দরিদ্র, যাযাবর মানুষ। কিন্তু তবু তাদের মনের যে বিশ্বাস, তার কাছে যেন কল্পনাই হয়ে উঠেছিল বাস্তব। এই মানসিকতাই কালজয়ী হয়। ভগবান, স্বর্গরাজ্য, এ সব কিছুই

থাকার প্রয়োজন নেই ; যদি আত্মার এই ভাস্বরতা থাকে। মনে হবে, মনে সুস্থ, দেহে সুস্থ, সেই বিরাট গ্রীক জাতি, এদের মনে যে প্রসাদগুণ ছিল না, তা কি করে পেল নিম্নমান সভ্যতার ওই যাযাবররা ? একটু ভাবলেই এটা সহজে বোঝা যায়, যে এই বিশ্বাসী যাযাবরদের মন, ছিল শিশুর মনের মত, যার প্রসাদগুণ ছিল অন্তহীন। আর সেই জায়গায়, পরিণত সভ্যতার "পরম পাকা" মন যে গ্রীকদের, তাদের দেবদেবীরা ছিল রূপকথার গল্পের চরিত্র যেন।

প্রশ্ন উঠবে, সক্রেটিশ, প্লেটো, ইউক্লিড আর পিথাগোরাস কি চিন্তার ধারাটা প্রয়োজন মত বদলে দিতে পারতেন না ? পারার ক্ষমতা তাঁদের অবশ্যই ছিল, কিন্তু তাঁদের চিন্তা কি আপামর জনসাধারণের সঙ্গে "ঐকতানে" বাঁধা ছিল ? রবীন্দ্রনাথের কথায় তাঁরা কি বলতে পারতের, তাঁদের চিন্তা "সর্বত্রগামিনী" ? সেই জায়গায়, খৃষ্টানদের স্বর্গরাজ্যের আত্মিক প্রয়োজন ও সেই বাণী তো সকলের। সকলের মুখের সহজ কথায়, যখন বলা হল, যে স্বর্গরাজ্য তোমাদের মধ্যে, তখন তা হয়ে উঠল, পরম ইতিবাচক ; সকলের জন্য সহজ সত্য। এ কথাটি এখানে আলোচনা করলাম তার কারণ ধর্মের মত একটি আবশ্যকীয় সত্য যদি এক বিরাট সভ্যতার, সব কিছুর সাহায্য নিয়েও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে, তা হলে বুঝতে হবে, কোন না কোন জায়গায় অবক্ষয়ের লক্ষণই এটা।

পূর্বে, তথা কথিত "লেসে ফেয়ার" ও তার প্রভাব সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। লেসে ফেয়ারের উপাসনা যেন হয়ে উঠল প্রয়োজনেরই উপাসনা। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে প্রয়োজন আর ভাগ্য, একই জিনিসকে দু রকম ভাবে দেখা। যেমন প্লেটো যে রকম দেখেছেন যে ভগবানের হাত যদি না থাকে, তা হলে সংসার যেন হাল নেই, এমন নৌকার মত হয়ে যায়, অর্থাৎ ভাগ্যের হাতের খেলনা মাত্র। হাল ছাড়া নৌকাখানাও একজন গণিতজ্ঞের কাছে কিন্তু, ভাগ্যের হাতে খেলনা মাত্র নয়। তার কাছে জলের তরঙ্গ, বাতাস, ইত্যাদি গণনার মাধ্যমে লব্ধ একটি প্রত্যক্ষ ফল। প্রয়োজন অনুসারে সে গণনাকে কাজে লাগান যায়। এমনি করে এক এক সময়, এক একটি কথা যেন, সেই সময়কার কালচারকে, হয়ত বলা যায়, সেই সময়কার সভ্যতাকেও পেয়ে বসে। "লেসে ফেয়ার" "প্রয়োজন", এ দুটি কথাও এক সময়ে সভ্যতাকে পেয়ে বসেছিল। অবশ্য মার্কসবাদীরা লেসে ফেয়ারকে

হটিয়ে প্রয়োজনকে সেই জায়গা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের একটি উক্তি মনে পড়ে, "Freedom is the recognition of necessity."

অদৃষ্টবাদ, তাও আবার বিভিন্ন ছাঁদের অদৃষ্টবাদ, আমাদের কালচার, আমাদের সভ্যতাকে দীর্ঘদিন ধরে প্রভাবিত করেছে। আমাদের জন্মের আগের অতীত ও মৃত্যুর পরের ভবিষ্যতকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা। যার জন্ম এর প্রভাব ব্যক্তির উপরেই শুধু নয়, তা সমষ্টির উপরেও। বাইবেলের সেই "অরিজিন্যাল সিন বা আদিম পাপ" তো ছিল আদি মানব আদমের পাপ। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিশ্বাসী খৃষ্টান মাত্রেই যেন, সেই পাপের বোঝা ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে চলেছে। আবার হিন্দুধর্মের কর্মফল, যার উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্মের জন্মান্তরবাদ, এও অনেকটা আদিম পাপেরই মত ব্যাপার। একটা অদৃশ্য কার্য কারণ সম্পর্ক যেন চলেছে, এক পার্থিব জীবন থেকে, পরবর্তী জীবনে। খৃস্টান হিন্দু, বৌদ্ধ, সব ধর্মমতেই যে মানুষ বর্তমানে বেঁচে রয়েছে, তার জীবনকে প্রভাবিত করছে এমন কর্ম, যা তার বর্তমান জীবনে করা নয়; আর খ্রীষ্টানদের পক্ষেও তা আদমের আদিম পাপ। এইখানে ভারতীয় ও খৃস্টান মতে মিল। এ ছাড়া অবশ্য মিল বেশী কিছু নেই।

খৃষ্টান মত হল, মানব পিতা আদম যদি স্বর্গচ্যুত না হত, তা হলে তার সন্তানদের দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, কোন পার্থিব অশান্তিই থাকত না। অথচ প্রতিটি মানুষের আত্মা, যে হেতু স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী, তাই শেষ সে দিনে যে স্বর্গ ফিরে পাবার অধিকারও তার থাকছে।

ভারতীয় "কর্ম" কিন্তু অন্য রকমের। এখানে বলা হয়েছে, যে একজন মানুষের জীবনে যা কিছু ঘটছে তার কারণ হল, তার পূর্বজন্মের কর্ম। আবার বর্তমান জীবনের কর্ম দিয়েই, মন্দকে কাটান দিয়ে, তার পরের জন্মে ভাল ফল লাভ করতে পারে। কর্মফলের অঙ্কটাও সহজ। শুধু যোগ বিয়োগ। গুণ, ভাগ, বা কোন জটিল গণিত নেই। আর এইভাবেই জন্ম জন্মান্তর পথে মানুষের পরিক্রমা। বৌদ্ধ মতেও আত্মার পরিক্রমা ঘটে জন্ম জন্মান্তর পথে। যত দিন তৃষ্ণা আর সংস্কার দূর না হয়, ততদিনই এই পরিক্রমা। তৃষ্ণা আর সংস্কার দূর হলে, তখন নির্বান।

টয়েনবির মতে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আর এক ধরনের অদৃষ্টবাদের মানসিকতা চালু হল। এ হল একজন সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ একেশ্বরের তত্ত্বাবধানে

চালু অদৃষ্টবাদ। এর উদাহরণ হল ইসলাম। এখানেও ব্যক্তিমানব তথাকথিত "কিসমেতের" অধীন। সেই ওমর খৈয়ামের কথায়।

"But helpless pieces in the game He plays
Upon the chequer board of nights and days.
Hither and thither moves and cheks and slays."
And one by one back in the closet lays.

E. Fitzgerald : Rubaiyat of Omar Khayyam.

প্রয়োজন, ভাগ্য, ইত্যাদি এক একটি কথা, সংস্কৃতির দিক থেকে, এক একটি সমাজ ও সভ্যতাকে দীর্ঘদিন ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যেমন "আদিম পাপ," "কর্ম," "ভাগ্য," "প্রয়োজন" এমনি এক একটি কথাকে কেন্দ্র করে, যেন একটি বিশেষ চিন্তা, ভাবনা, দর্শন, ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। আমরা ইতিবাদী ও নেতিবাদী দর্শনের আলোচনার সময় দেখছি, যে যদি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা হলে সভ্যতার ভাঙ্গা গড়ায়, সেই সব দর্শনের প্রভূত ক্ষমতা আছে। এখন লক্ষ করা যাক, যে কয়েকটি যেন "ওয়াচ ওয়ার্ডের" মত শব্দ যা বিশেষ কালচারে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, তা অবক্ষয়ের কি অন্য কিছুর লক্ষণ কি না?

ধরা যাক "আদিম পাপ" কথাটা। প্রায় দু হাজার বছরের কাছাকাছি, এ কথাটি মানুষের মনে পাপবোধ জাগিয়ে রেখেছে। তবু এই দীর্ঘ সময়ে খৃস্টান ধর্ম প্রভাবিত ইউরোপের সভ্যতা, বহুদূর অবধি এগিয়েছে। অবশ্য সভ্যতার এগিয়ে চলার পথ, সর্বদাই "পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর।" পাপবোধ, হয়ত ওই সভ্যতার ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে গিয়েছে সাইকো এ্যানালিষ্টের কৌচে, পাপজনিত আত্মগ্লানিতে বিপর্যস্ত অবস্থায়। কিন্তু সাধারণ ভাবে অপরাজিত ইউরোপীয় মানুষ সারা বিশ্বে নতুন দিগন্ত বিস্তার করেনি কি?

আবার ধরা যাক "কর্মফলের" শৃঙ্খলে বাঁধা ভারতের কথা। মুসলমানদের পদানত ও বৃটিশ পদানত হয়ে থেকেছে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত, তবু ভারত ইসলামিক ও ইউরোপীয় কালচারের কাছ থেকে, যা নেবার তা নিয়ে, নিজের ঐতিহ্যে বেঁচে আছে। ঠিক এই ধরনের কথাই যারা "কিসমেত" বিশ্বাসী, তাদের সম্পর্কেও বলা যায়।

তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কি? এই বাক্য সঞ্জাত অনুভূতি থেকে

সভ্যতার অবক্ষয় সূচিত হচ্ছে কি না? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে, আবার সেই থারমোডাইনামিকসের সূত্র এনট্রপি, অর্থাৎ আনবিক বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধির কথাতেই আসতে হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ওই শব্দগুলির, যে গুলি নিয়ে আলোচনা করছি, তাদের প্রভাব, মানুষের উপর যতই হক না কেন, আমাদের থিয়োরি অনুযায়ী, এনট্রপি বৃদ্ধি করে, মানব সভ্যতার কোন মারাত্মক ক্ষতি শব্দগুলি করতে পারে নি। তা হলে কি করেছে? সভ্যতার গতিকে মন্থর করে দেবার মত কিছু, হয়ত শব্দগুলির ছিল। ভারত সেই মন্থরতায় গা ঢেলে দিল। কিন্তু ইউরোপে হল তার উল্টোটাই। আর তাই বা কেন? আবহাওয়া থেকে শুরু করে, অতীত ইতিহাস, স্থানীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রভাব এমনি বহু জিনিস দিয়েই বোঝার ও বোঝানর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কোনটিই এর মধ্যে সঠিক কিনা, তার হদিশ কে দেবে? এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর "আমরা ও তোমরা" রম্য রচনাটি বিশেষ করে মনে পড়ে।

তিনি বলছেন, "আমরা পূর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানব সভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানব সভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

"আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম।······সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real······তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।"

পৃথিবীর ছাব্বিশ-আটাশটি সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে, আমরা যে তিন চারটি শব্দ, যা "ওয়াচওয়ার্ড" হয়ে উঠেছিল, তার উদাহরণ দিলাম। শব্দগুলির মধ্যে এমন কিছু যেন রয়েছে যা থেকে মনে হয় এ ধরনের শব্দ যদি "ওয়াচ ওয়ার্ড" হয়ে হয়ে ওঠে, তবে হয়ত সে সভ্যতা ভেঙে পড়ার মুখে, এটা মনে করা যেতে পারে। কিন্তু দেখলাম তা ও নয়। কথা বা শব্দ নিয়ে কথাটা উঠেছে বলে, কথা সম্বন্ধে প্যাভলভের মতামতের আলোচনা একটু করে নেয়া উচিত। কথা প্রাণীদের মধ্যে, একমাত্র মানুষই ব্যবহার করতে পারে। যেমন পরাবর্তগুলিকে সিগন্যাল বলা হলে, কথাকে বলা যায়, সিগন্যাল অফ সিগন্যালস। অর্থাৎ বিভিন্ন সর্তাধীন পরাবর্ত (Conditioned Reflex) যে সিগন্যাল বা নির্দেশ

দিল, সেই নির্দেশ আবার আমাদের বাচন কেন্দ্রকে (Speech centre) দিয়ে কথা বলাচ্ছে। যন্ত্ররাজ্যের সঙ্গে তুলনা দিলে বলা যায়, যে এ যেন একটি যন্ত্রকে আমরা নির্দেশ দিলাম, সেই যন্ত্রটি চালু হল। আবার সেই যন্ত্রটি যেন নির্দেশ দিয়ে আর একটি যন্ত্রকে চালু করল। কথা ঠিক এইরকম।

এখন যদি এই বিশেষ শব্দগুলি লক্ষ্য করি, তা হলে হয়ত বলা যায়, এ শব্দগুলি আবার থার্ড সিগন্যাল, বা তৃতীয় সঙ্কেত হিসাবে কাজ করছে। এই তৃতীয় সঙ্কেতটি যেন শুধু ব্যক্তি মানবের উপরে শুধু নয়। তা সমষ্টি মানবকে প্রভাবিত করছে। আলোচনা দীর্ঘতর না করে, শুধু একটি কথা বলেই শেষ করছি। কোন নেতিবাচক দর্শন ও কালচার জাত শব্দ কিন্তু সভ্যতাকে অবক্ষয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিতে পারে। যেমন হিটলারের জার্মানীর, "এক ফুরার, এক রাইখ" কথাটি কি তাই দেয় নি ?

এই মাত্র ভাষা সম্পর্কে প্যাভলভের সিগন্যাল অফ সিগন্যালস বা সঙ্কেতের সঙ্কেত, থিয়োরি নিয়ে আলোচনা করলাম। আশা করি তা বোঝাবার মত সহজ করে বলতে পেরেছি। ভাব আদান প্রদানের জন্যই ভাষা। তাই ভাষা হল অজস্র মানুষের মিলনের সূত্র। কিন্তু তবু মানুষের ইতিহাসে দেখা যায়, যে ভাষাই আবার মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এ সম্পর্কে বাইবেলের সেই "ব্যাবিলনিস জারগন" গল্পটি এই প্রসঙ্গে মনে করতে হয়। বাংলা বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিলাম :

"সমস্ত পৃথিবীতে এক ভাষা ও একরূপ কথা ছিল। পরে লোকেরা পূর্বদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে শিনিয়র দেশের এক সমস্থলী পাইয়া সে স্থানে বসতি করিল। আর পরস্পর কহিল, আইস আমরা ইষ্টক নির্মাণ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করি ; তাহাতে ইষ্টক ও মেটিয়া তৈল চুণ হইল। পরে তাহারা কহিল আইস' আমরা আপনাদের নিমিত্তে এক নগর ও গগনস্পর্শী এক উচ্চ গৃহ নির্মাণ করিয়া আপনাদের নাম বিখ্যাত করি, পাছে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্ন ভিন্ন হই। পরে মনুষ্য সন্তানেরা যে নগর ও উচ্চগৃহ নির্মাণ করিতেছিল, তাহা দেখিতে সদাপ্রভু নামিয়া আসিলেন। আর সদাপ্রভু কহিলেন, দেখ, তাহারা সকলে একজাতী ও এক ভাষাবাদী ; এখন এই কর্মে প্রবৃত্ত হইল ; ইহার পরে যে কিছু করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহা হইতে নিবারিত হইবে না। আইস আমরা গিয়া তাহাদের ভাষার ভেদ জন্মাই, যেন তাহারা একজন অন্যের ভাষা বুঝিতে

না পারে। আর সদাপ্রভু তথা হইতে সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, এবং তাহারা নগর- পত্তন হইতে নিবৃত্ত হইল। এই জন্ত সেই নগরের নাম বাবিল (ভেদ) থাকিল ; কেননা সেই স্থানে সদাপ্রভু পৃথিবীর ভাষার ভেদ জন্মাইয়াছিলেন, এবং তথা হইতে সদাপ্রভু তাহাদিগকে সমস্ত ভূমণ্ডলে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন।" আদি : ১০ : ১১ : ১-৯ :

বাইবেলের মতে, "নানা ভাষা নানা জাতি, নানা পরিধান" সেই থেকেই সুরু হল। কিন্তু বিবিধের মাঝে মহান মিলন, আজও যেন সুদূর পরাহত। আজ এ কথা আমাদের কাছে পরিষ্কার যে সামাজিক অবক্ষয় যখন মাথা চাড়া দেয়, তখনই ভাষাগত, কি ধর্মসম্প্রদায়গত বিরোধ দেখা দেয়। এ দেখবার পক্ষে, ভারতবর্ষের চে দর্শনীয় জায়গা আর পৃথিবীতে নেই। বৃটিশ শাসন বা তাদের কালচারের আর নতুন করে কিছুই তখন দেবার নেই। তার উপরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনও কুড়ি দশকের ছাঁদে তিরিশ দশককে, আবার মোটামুটি সেই ছাঁদেই চল্লিশ দশককে ঢেলে সাজার কথাই যখন নেতাদের মাথায়, তখন জনসাধারণের আর আশা করার মত কিছুই ছিল না। তা ছাড়া দেশের বাইরে নেতাজি যে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন, তার কতটুকুই বা বিদেশী রেডিও মারফৎ 'দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছচ্ছিল? তার ফলে ছিল দেশের সর্বত্র একটা অবক্ষয়। তারই মধ্যে থেকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ, একটা গৃহযুদ্ধের আকার নিল। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়ে গেল। এ ইতিহাস আমাদের জানা।

তারপরই বা কি? ভাষাভিত্তিক রাজ্য, বাংলাভাষী-অহমভাষী, বাংলা উড়িয়া, হিন্দী-অহিন্দী, বিদেশী অনুপ্রবেশ, এই সব নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে তো চলছে। ভাষাগত বিচ্ছিন্নতাবাদ নিছক অবক্ষয়েরই লক্ষণ। অথচ একজন সুইস শিশু পর্যন্ত দেখেছি, তার মার সঙ্গে জার্মান ভাষায় কথা বলছে, তার খেলার সাথীকে বলছে ইতালিয় আর প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়ে বলছে ফরাসী। তবু কোন সমস্তা নেই।

বাইবেলের ব্যবিলনের ভাষা বিরোধের আলোচনা করতে গিয়ে টয়েনবি বলছেন সেই যুগের কথা, যখন সুমারদের সার্বভৌম রাষ্ট্র ভেঙে যাচ্ছে। সুমারদের সভ্যতার পতনের শেষ অধ্যায়ে দেখি, যে সুমার ভাষা একদিন তাদের সংস্কৃতির প্রধান বাহক ছিল, সেই ভাষাই হয়ে গেল মৃত ভাষা।

সামাজিক সমস্যা যখন ঘনীভূত হয়ে ওঠে তখন দেখা যায়, একই ভাষাতে কথা বলেও তখন যেন একজন নেতা, অন্য নেতাকে বোঝাতে পারেন না। তখনই তো আমরা দেখি, বিভিন্ন নেতা বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে বলতে থাকেন যে তাঁর পূর্ববর্ত্তি' বিবৃতি ভুল ভাবে ছাপা হয়েছে না হলে বলেন তার ভুল অর্থ করা করা হয়েছে।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। একটি ভূখণ্ডে হয়ত বহু ভাষা প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি ভাষা হয়ত তথাকথিত লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা, বা সার্বজনীন ভাষা হয়ে ওঠে। এটা হয় কি করে? সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি? টয়েনবির মতে, একটি ভাষা সার্বজনীন হয়ে ওঠে সামাজিক অবক্ষয়েরই সময়ে; তখন অপেক্ষাকৃত সুবিধা পাচ্ছে যে সম্প্রদায় তাদের ভাষাই ওঠে সার্বজনীন ভাষা। তবে সার্বজনীন ভাষা হতে গিয়ে, একটি ভাষাকে মূল্যও দিতে হয়। এ হতে গিয়ে হয়ত একটি ভাষার সূক্ষ্মতা ও প্রসাদগুণ কিছুটা ব্যাহত হয়। ফরাসী ভাষা, এক সময়ে ইউরোপের সার্বজনীন ভাষা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার জন্য কি ফরাসী ভাষার বিত্ত একটুও কমেছে? এর উত্তরে হয়ত বলা যায়, প্রথম যখন ফরাসী ভাষা সার্বজনীনতার স্তরে পৌছল তখন ফরাসী ভাষাকে এ মূল্য দিতে হয়েছিল। তারপর আবার বহু মানুষের স্পর্শের সম্পদে ফরাসী ভাষা সম্পন্ন হয়েছে। সেই রূপই আমরা দেখেছি আজ।

অবক্ষয়ের যুগেই যে ভাষা সার্বজনীনতা লাভ করে, তা না হলে এ্যাটিকা ও ল্যাটিয়ামের মত দুটি ছোট ছোট জেলার ভাষা, যথাক্রমে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা হয়ে খৃস্টান যুগ পর্যন্ত চালিয়ে গেল কি করে? ম্যাসিডনের ফিলিপ, এ্যাটিক ভাষা গ্রহণ করায় ও রোমানদের যুদ্ধ সাফল্যই এই দুটি ভাষার সার্বজনীনতার জন্য দায়ী। বলে দিতে হবে না, এ দুটি যুগ অবক্ষয় সুরু হবার পূর্ব মূহুর্তের। ইতিহাসের শিক্ষায় শিক্ষিত যদি হয়ে থাকি, তা হলে যেন আজ আমরা বুঝি যে, ভারতেও আজ হিন্দী সার্বজনীন ভাষা হলেই যে অবক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতা দূর হবে, তা নয়। যেমন ফরাসী লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা সম্পর্কে টয়েনবির মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলছেন, "The French Lingua Franca is a movement of the decline and fall of a medieval Subsociety within the Western body social."

ভাষার ব্যাপারটা যেমন দেখলাম, ঠিক অনুরূপ ভাবে ধর্মের ব্যাপারটাও

দেখতে হবে। বিশেষ উপাসনাভঙ্গী, বা ধর্মের একাধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে, একটা কোয়ালিশন সদৃশ মিল-মিশ ও সামাজিক অবক্ষয়েরই লক্ষণ হতে পারে। বিচিত্র ধরণের কোয়্যালিশন মন্ত্রীসভা রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অবক্ষয়েরই চিহ্ন হতে পারে। যেমন প্রাচীন ভারতে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে ও তাদের উপাসনার মধ্যেও সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। এ বিভেদ মিটিয়ে নেবারও আন্দোলন হয়েছে। অনেক পণ্ডিতের মতে কৃষ্ণ ছিলেন লৌকিক দেবতা। পরবর্ত্তিকালে আদিত্য বিষ্ণুর সঙ্গে কৃষ্ণকে অভিন্ন কল্পনা করে ভাগবতের প্রাণ পুরুষ বাসুদেবের রূপ নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণু ও কৃষ্ণ এক হবার পরেও কিন্তু সব ভিন্নমত্য যে শেষ হয়ে গেল, এ কথা বলা যায় না। কৃষ্ণের একাধিক রূপকে কেন্দ্র করে সাধনারও রূপ পরিবর্তন ঘটেছে। এমন কি তা আজ পর্যন্ত ঘটতে দেখা যাচ্ছে। আজ কৃষ্ণ সচেতনতার আন্তর্জাতীক সংস্থা (ISCON) ইউরোপ, আমেরিকার বহু জায়গা থেকে সুরু করে ভারতে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, কলকাতা থেকে বহু সহরেই শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের কার্যকলাপ তো আমাদের চোখের সামনেই। তা দেখে কি মনে হয় না, যে সমাজের ভিতরে এক গভীর অবক্ষয় চলেছে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে ইসকনে যারা যোগ দিয়েছে তাদের দেখলে মনে হয়, প্রাণের ভিতরটা একেবারে ফাঁকা বলেই ওরা, মনটাকে যদি ভরান যায়, তাই ছুটছে অন্ধ একটা কিছুর পিছনে। কি পাবে তা কেউ জানে না। এ প্রসঙ্গটি বিতর্কিত হতে পারে। তাই তার মধ্যে যাচ্ছি না। টয়েনবির যে মূল বক্তব্য, যে ধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটা সুবিধাজনক কোয়্যালিশন শুধু অবক্ষয়েরই প্রতীক হতে পারে সেটাই এ থেকে দেখা যাচ্ছে।

ইতিহাসে ভাঙ্গা আর গড়া একই সঙ্গে চলতে থাকে। যেমন হেলেনিয় সভ্যতা ও সমাজ যখন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তখনই গ্রীস ও ইতালিতে খৃষ্ট ধর্মের পদসঞ্চার। যে খৃষ্টভক্তরা ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন তাঁদের কাছে রইল খৃষ্টের সেই বাণী, "Go ye out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled."

আধুনিক মানুষ ভাবে, যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের উদ্গাতা বুঝি সেই। কিন্তু আলেকজাণ্ডারই বলেছিলেন, "ঈশ্বর একাধারে সমস্ত মানুষের পিতা। ভাল মানুষ যারা, তারা যেন আবার বেশী করে তাঁর আপনজন।" এই কথা থেকেই

বোঝা যায় যে আলেকজাণ্ডার মানবজাতী যে এক, এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। তবে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে মানুষের যে একত্ব এটা উপলব্ধি করার কিন্তু আর একটা দিক আছে। এ চিন্তায় মানুষের ভ্রাতৃত্ব ততক্ষণই যতক্ষণ ঈশ্বরকে আমরা মনে রাখছি। এক অতিমানবিক ঈশ্বর যেন সব মানুষকে ধরে রেখেছেন। এই ধরণের একত্ব, যে বিশাল একত্বের কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করতে পারে, আত্মসমর্পণ করে অনুভব করে যে, তারা সকলে সমান; সেই প্রেরণা ভারতের দর্শনে যে ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চীনের কথা বলতে গিয়ে আর্থার ওয়েলি বলেছেন যে, চীনের এক পরম দুরবস্থার কালে তথাকথিত "টাও" আধ্যাত্মবাদের "এক", "একত্ব" ইত্যাদি কথাগুলি সমগ্র চীনের পক্ষে যেন জীবনবেদ হয়ে উঠেছিল। এর কারণও সহজেই বোঝা যায়। ভেঙে টুকরো টুকরো হবার পথে তখন যে চীন, তাকে বাঁচাবার জন্য তখন দেশ চাইছিল রাজনৈতিক একতা। "টাও" আধ্যাত্মবাদ থেকে সেই একত্বের মন্ত্র পেল তারা।

ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন সমাজের মানুষ যখন সংহতির জন্য উদগ্রীব, তখন হয়ত সে সমাজে এক নিদারুণ অবক্ষয় চলেছে। কোন কোন সময়ে সংহতির প্রেরণা, সভ্যতার অবক্ষয়কে হয়ত দূর করে আবার সেই সমাজকে বাঁচাতে পারে। আজকের ভারতবর্ষে যে সর্বস্তরের বিচ্ছিন্নতাবাদ, তা যে এক পরম অবক্ষয়ের লক্ষণ, এ বলার দরকার করে না। তবে সেই সঙ্গে রয়েছে সমগ্র জাতির প্রাণে সংহতির প্রেরণা। বলা যায় না, এ সংহতি বোধই হয়ত আবার ভারতের সভ্যতা ও সমাজকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। ভাঙা আর গড়া, এই দুটি বিপরীত প্রবণতা হল, ইতিহাসের ডাইলেকটিকস। থিসিস আর এ্যান্টিথিসিসের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে সিন্থিসিস। এ সিন্থিসিস কখনো সভ্যতা ও সমাজকে নিয়ে যায় সম্পূর্ণ ভেঙে যাবার দিকে। এ রকম হলে, একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় সভ্যতা। এ রকমও তো কত সভ্যতাই গিয়েছে। আবার নতুন করে গড়ে উঠল সভ্যতা, অনুরূপ সিন্থিসিসে, এর উদাহরণও বড় কম দেখি না এখানেও সেই মার্কসের কথা—বোঝাটাই শেষ নয়। কি ভাবে সমাজ সভ্যতার পরিবর্তন করা যায়। সেটাই বড় কথা।

বর্তমান অধ্যায়ে ইতিহাসে সভ্যতায় যে উত্থান-পতন, ভাঙা-গড়া, তার কারণটাই বোঝবার চেষ্টা করা হচ্ছে। কেন না, আমাদের আজকের সভ্যতা

যদি বিপন্ন হয়, অতীতে অনুরূপ ঘটনা যদি ঘটে থাকে, তার কারণটা জানলে, তবেই তো আমরা বর্তমানের এ সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাব। ইতিহাসের কথায়, গল্পের মত একটি কাহিনীর উল্লেখ না করে পারছি না। এ কাহিনীটি বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ আর্থার হোলি কম্পটনের কাছে শোনা। তিনি এটি বলেছিলেন ১৯৫২ সালে। ডঃ কম্পটন তখন আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। ১৯৫২ সালের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের বক্তৃতায় ডঃ কম্পটন এ কাহিনীটি বলেছিলেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বললেন,—"মাত্র কিছুদিন আগে আবার রাজধানী, ওয়াশিংটন ডি-সি যেতে হয়েছিল। হোটেলে যাবার জন্য ট্যাক্সি নিলাম। আমার শ্রোতাদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে, যে ওয়াশিংটনের ট্যাক্সি ড্রাইভারদের। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, যে আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, না রেডিও শুনতে শুনতে যেতে চাই। আমি বললাম যে গল্প করতে করতে যাওয়াই বরং আমার পছন্দ। ট্যাক্সি ড্রাইভারটি তখন বললে, যে আমি যদি প্রথম ওয়াশিংটনে এসে থাকি, তা হলে সে পথে যা যা দ্রষ্টব্য পড়বে, সে গুলোও দেখাতে দেখাতে নিয়ে যেতে পারে। মৃদু হেসে বললাম, যে তা হলে তো খুবই ভাল হয়। একটু এগোতেই আমরা এসে গেলাম ন্যাশান্যাল আরকাইভস বিল্ডিংয়ের কাছে।

"যাঁরা ওয়াশিংটন ডি-সি কে জানেন তাঁদের অবশ্যই মনে পড়বে, ন্যাশান্যাল আরকাইভসের সামনের সেই অনবদ্য ষ্ট্যাচুটি, যার নিচে লেখা, "What is post is prologue—অতীত শুধু ভূমিকা মাত্র।" আমার ট্যাক্সি ড্রাইভার, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, যে ওই লেখাটুকুর কি মানে, তা আমি জানি কি?

"বললাম, না তো। সে যদি বুঝিয়ে বলে, তা হলে বড় ভাল হয়।

"তখন ট্যাক্সি ড্রাইভার বললে—যে এর মানে হল, আমাদের চোখের সামনে যেটুকু দেখছি, তাই দেখে যদি ভাবি, সব দেখা হয়ে গেছে, তা হলে আমরা মূর্খ।"

একটু থেমে, উদাত্ত গলায় আবার ডঃ কম্পটন বললেন, "কতবড় একটা মূল্যবান কথা, আমি ভাবি, সেই ট্যাক্সি ড্রাইভারটি বলেছিল।"

ডঃ আর্থার হোলি কম্পটন: চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কোয়াস খেলার যে ঘেরা কোর্টে পরমতম গোপনীয়তা রক্ষা করে, পৃথিবীর প্রথম আনবিক বোমা

তৈরির প্রজেক্টটি তৈরি হয়েছিল, তার নাম দেয়া হয়েছিল "ম্যানহাটন প্রজেক্ট" ডঃ কম্পটন ছিলেন এই ম্যানহাটন প্রজেক্টের চেয়ারম্যান। নোবেল প্রাইজপ্রাপ্ত পদার্থবিজ্ঞানী, আনবিক শক্তি আবাহনের অন্যতম হোতা, ডঃ কম্পটন, আবার বলতে সুরু করলেন,—

"সত্যি সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার ঠিক কথাটিই বলেছিল। আজ আমরা যে যুগের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব সে যুগ, আনবিক যুগ। সে যুগ কি দিতে পারে, তা কল্পনা করাও যায় না। কিন্তু মানব সন্তানদের সর্বতোভাবে তারই জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

সমাবর্তন উৎসবের অজস্র লোক ডঃ কম্পটনের বক্তৃতা শেষ হতে চেয়ে রইল বিমুগ্ধ বিস্ময়ে; মনে তাদের একটিই প্রশ্ন, আমরা কি প্রস্তুত?

ডঃ কম্পটনের সেই সমাবর্তন ভাষণের পর, প্রায় তিরিশ বছর কেটে গেছে। এই তিরিশ বছরের মধ্যে সমস্যা আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমাধানের পথে আমরা কতটুকুই বা এগিয়েছি? আর প্রস্তুতি? আমরা কি একটুও প্রস্তুত? বোধ করি প্রস্তুত নই বলেই বর্তমান গ্রন্থখানি। প্রস্তুত নই বলেই এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সমস্যাগুলিকে সঠিক ভাবে বোঝার চেষ্টা করে, বর্তমান অধ্যায়ে খুঁজে দেখছি ইতিহাস। ইতিহাসে অনুরূপ সমস্যা কি এসেছে? এসে থাকলে অতীতের মানুষ কি ভাবে তার মোকাবিলা করেছে? আর ইতিহাস? সে তো শুধু ভবিষ্যতের ভূমিকা, সেই বিশ্বাসই ছিল প্রয়াত বিজ্ঞানী ডঃ আর্থার হোলি কম্পটনের মনে।

এই অধ্যায়টিতে কি কি কারণে, সভ্যতার ভাঙন বা ধ্বংসের সূচনা হয়েছে ও কি কি কারণে তা বেঁচে গেছে, তা আমরা দেখলাম। সমাজ ও সভ্যতাকে সঙ্কট থেকে বাঁচাতে যে যে কারণগুলি সাহায্য করেছে, তার যদি একটি তালিকা করি তা হলে পাই বারোটি মূল কারণ। সেই তালিকাটি দেয়া যাক: ১। নতুন রক্ত সঞ্চার ২। সামাজিক মানুষদের উপর উপযুক্ত প্রভাব ৩। যুদ্ধ পরিহার ৪। যুদ্ধোদ্যম পরিহার ৫। পরিচ্ছন্ন নেতৃত্ব ৬। মানবতাবাদ ৭। পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ৮। সদাচার ৯। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ না রাখা ১০। বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ ১১। একটি বিশ্বজনীন ভাষা ১২। আদর্শ গত একত্ব। পাঠক যদি বর্তমান অধ্যায়টি ভাল করে পড়ে থাকেন, তা হলে বুঝতে পারবেন যে এই তালিকাটির প্রতিটি বিষয় এ অধ্যায়ে আছে। এখানে এ

তালিকাটি করার উদ্দেশ্য আমাদের সভ্যতা সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে, এই তালিকার কোনটি কতটা কাজে লাগান যায়, তাই দেখা, ও নতুন যদি কোন সমাধান, যা এখানে নেই তার হদিশ করা সম্ভব হয়।

নতুন রক্ত সঞ্চারের ফলে, ক্ষীয়মান সভ্যতার প্রাণশক্তি পাবার কথা যেখানে বলেছি, পাঠকের মনে পড়বে, যে এটা ঘটেছে তখনই, যখন এক সম্প্রদায়ের মানুষের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ঘটেছে। প্রাচীন যুগে এ ধরণের ঘটনা কিছু কিছু ঘটলেও, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক দিক থেকে অনুরূপ মিলনের বাধা যথেষ্টই ছিল। বরং বলা যায়, এখনকারই ধারনা সারা পৃথিবীব্যাপী বর্তমান মানুষের কাছে, যে মানুষ মাত্রেই এক মানবজাতির অংশ বিশেষ। তাই পৃথিবীর যে কোন জায়গার একজন পুরুষকে, অন্য ভৌগোলিক জায়গার যে কোন নারীর বিবাহ করার বাধা আজ ক্রমশঃ দূর হয়ে যাচ্ছে। হয়ত ভবিষ্যতে মানুষ জাতি এক মানবজাতি হয়ে উঠবে। এর ফলটা যে কতটা ভাল, তা আমরা আজও বুঝে উঠতে পারছি না।

মানুষের উপর মানুষের অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থেকেই জন্ম নেয় ডিক্টেটর-সিপ। আমরা যখন হিটলারের কথা আলোচনা করেছি, নেতিবাদী দর্শনের কথা বলেছি, এনট্রপি বৃদ্ধির হিসাব করেছি, তখন ডিক্টেটারসিপে অবুঝ ব্যক্তি বিশেষের ডিক্টেটারি হলে, তার ফলে মানব সভ্যতা যে সামগ্রিকভাবে বিপন্ন হতে পারে তা দেখেছি। কাজেই সে আলোচনার পুনরাবৃত্তি এখানে করব না। শুধু একটা কথা বলব, মানুষের উপর মানুষের যদি কোন নিয়ন্ত্রণ থাকতে হয়, তবে সে নিয়ন্ত্রণ হবে শুধু ভালবাসারই। এই নিয়ন্ত্রণ মানুষের ক্ষতি না করে, মানুষকে নিয়ে যাবে অন্য এক সুন্দরতর জীবনের পথে, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতে।

কোন সভ্যতা যদি ভৌগোলিক দিক থেকে অতি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে অতীতে দেখা গেছে যে, সেই সভ্যতার তথাকথিত সাপ্লাই লাইন যেন বেশী দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার জন্য, কেন্দ্র ও প্রান্তদেশের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়। এর ফলে কোন কোন প্রাচীন সভ্যতায় ফাট ধরতে দেখা গেছে। কিন্তু প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে যা সত্য ছিল, তা আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে বলা যাবে না। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানও টেকনোলজির যুগে, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, আমাদের কথা, ছবি ইত্যাদি আলোকের গতিবেগে

এক সেকেণ্ডের অনেক কম সময়ে, ছড়িয়ে পড়ছে। আর আমাদের নিজেদের যাতায়াতের গতিও আজ প্রায় এই পর্যায়ে পৌছতে চলেছে। তা ছাড়া, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশান, সিনেমা ইত্যাদি মাসমিডিয়া আমাদের হাতে। এর ফলে আজকের সভ্যতাকে না চাইলেও ছড়িয়ে পড়তে হবে। আর ছড়িয়ে যাবার জন্য, কোন ক্ষতি তো নেই বরং লাভ।

বিভিন্ন লাভের মধ্যে একটা লাভ হল যে সভ্যতার বিবিধ অংশগুলি মিলেমিশে, আজ এক মানব সভ্যতায় পরিণত হতে চলেছে। তার সংগঠন, পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ আজ গতির দ্রুততায় ও বিশ্বজোড়া মাসমিডিয়া আছে বলে খুবই সহজ হয়ে উঠেছে। অবশ্য এর একটি সমস্যাও আছে। সেটি হল এই যে বিশ্বব্যাপী এই মাসমিডিয়াগুলি, অভিসন্ধিপ্রণোদিত মানুষের হাতে পড়লে তার দ্বারা মানবজাতীর প্রভূত ক্ষতিও করতে পারে। সেটা না হতে দেয়াটা কিন্তু আমাদেরই হাতে।

বলে দেবার কোন দরকার করে না, যে কোন ধরনের আত্মঘাত, গৃহবিবাদ, যুদ্ধ ইত্যাদি সভ্যতাকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট। এগুলি যত বড় হবে, সভ্যতার উপর আঘাতটা হবে তত বেশী। কিন্তু ছোট হলেও তার ক্ষতি করার সম্ভাবনা তো রয়েছেই। সম্প্রদায়গত, রাজ্য বা ভাষাভিত্তিক, যে ধরনেরই দাঙ্গা, হাঙ্গামা, গৃহযুদ্ধ, হক না কেন, তার ফলে প্রাণহানি, সম্পত্তিনাশ, এ সব যদি হয়, তা হলেই তো থার্মোডাইনামিক্সের নীতি অনুযায়ী আনবিক বিশৃঙ্খলা বা এনট্রপির বৃদ্ধি ঘটল। আর তাকে বিনা দ্বিধায় পরিপূর্ণ জীবন-বিমুখতা, কি জীবন-বৈপরীত্য (anti-life) বলতে পারি। আর এ জিনিস, কোন সমাজ বা সভ্যতার পক্ষেই সমর্থন যোগ্য নয়। তাই যুদ্ধ তো অনেক দূরের কথা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এমনকি তা যদি খেলার মাঠের মারপিটের ব্যাপারও হয়, সেটা সভ্য মানুষের উপযুক্ত নয়।

নেতৃত্বের কথাও এই অধ্যায়ে বহু আলোচনা করেছি। তথাকথিত সংখ্যালঘু, বুদ্ধিমান মানুষই নেতৃত্ব দেয়। নেতৃত্ব আবার এককও হতে পারে। সেটা এককই হক, আর সংখ্যালঘু একটা সম্প্রদায়েরই হক, নেতার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, সংখ্যাগুরু অজস্র মানুষকে মুগ্ধ করতে পারা চাই। সেই মোহই মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। সত্যিকারের কোন গুণ না থাকলেও, নেতৃত্বকামী লোকেরা কেউ কেউ, কৃত্রিম উপায়ে মানুষের মনে ভয়, ভক্তি, মোহ ইত্যাদি

সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। মিশর দেশের পুরোহিতরা বিশেষ লুকানো পাইপের সাহায্যে, নিজেরা আড়াল থেকে কথা বলে, নিজেদের ইচ্ছাটাকেই পাথরের দেবতার আদেশ বলে চালিয়ে দিয়ে, মানুষকে ঠকিয়ে তাদের উপর নেতৃত্ব করে গেছে। এ ধরনের শঠ নেতাদের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে একটা দূরত্ব বজায় রাখতেও হয়েছে। কারণ সাধারণ মানুষের সমতলে নেমে এলেই তারা এই শঠদের ধাপ্পা ধরে ফেলতে পারে।

পরিচ্ছন্ন নেতৃত্ব কিন্তু একে বলে না। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফুল ফোটাতে হলে চাই পরিচ্ছন্ন নেতৃত্ব। পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বের প্রথম কথা হল যে তা জন্মাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে: থাকবে মাটির কাছাকাছি। যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি।"

সে তো শুধু কবি নয় সেই মহানায়ক। কিন্তু এই কাছাকাছি এসে পৌছান সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় তাই আবার বলা যায়,

"সব চে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।"

কিন্তু নেতাকে এই দুর্গমতা অতিক্রম করতে হবে। তাকে যেতে হবে সেই জায়গায় যেখানে, রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যায়,

"তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমগ্র সংসার।"

যাঁকে হতে হবে সত্যকার মহানায়ক তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কথাতে বলা যায়,

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

মহানায়ক তাই সকলের মনের মানুষ। সে সৎ, নিজের আদর্শকে সে বিশ্বাস করে। ভণ্ডামি করে, মন্দিরে গিয়ে, সে মূর্তির পিছন থেকে কথা বলে না।

যে পরিচ্ছন্ন নেতৃত্বের কথা বলছি, তা মানবজাতীর মোটেই অজানা নয়। বুদ্ধ, যিশু, গান্ধি কি লেনিন, লিঙ্কন, এই ধরনের নেতা।

ইতিহাস সন্ধানী বর্তমান অধ্যায়ে ইতিহাস খুঁজে দেখতে গিয়ে, একটি কথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি; তা হল এই যে, সভ্যতা যখনই কোন মানবতা বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যেমন মানুষের উপর অত্যাচার, অবিচার, অপমান, হত্যা, ভয় দেখানো; তখনই সভ্যতা হয় বিপন্ন হয়েছে, না হলে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। আর এর অপর দিকটাও ঠিক এমনিই সত্যি। অর্থাৎ প্রেম, প্রীতি, প্রত্যয়, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্যের সম্পর্ক, কেমন ভাবে মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতিকে বাঁচিয়েছে, এগিয়ে নিয়ে গেছে তাও আমরা দেখেছি। দাস প্রথার উচ্ছেদ থেকে সুরু করে, সামোয়া দ্বীপের মানুষ গুলির সম্পর্কে পর্যন্ত আলোচনা করতে গিয়ে এ সত্য উপলব্ধি করেছি। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক, ডাঃ মার্গারেট মিড থেকে সুরু করে, ইতিহাসের দিক-পাল ডঃ আর্ণলড টয়েনবির মতামত নিয়েও আলোচনা করেও পেয়েছি ওই এক সত্য। তাই এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। শুধু একটি কথাই তাই পুনরাবৃত্তি করতে হয়,

"শুনগো, শুনগো; শুনগো মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছি। অবশ্য প্রকৃতি কথাটি বলতে, প্রকৃতির সম্পদও সেইসঙ্গে ধরা হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, প্রকৃতিকে জয় করতে হবে, এটাই ছিল মানুষের অভিলাষ। অলডাস হাক্সলির মত দিকপাল লেখক ও পণ্ডিত, যখন তাঁর অনবদ্য প্রবন্ধ "Wordsworth in the Tropics" লিখেছেন, তখন তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রকৃতি, যেখানে তা পোষ মানানো নয়, সেখানে প্রকৃতি মানেই সংগ্রাম। নদী মানেই সাঁতার, কুমীর, জোঁক। এই রকম একটা মনোভাব, উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষের মনে ছিল বলে, মানুষ বন্য প্রাণীদের মেরে, গাছপালা কেটে একেবারে সব তছনছ করে দিয়েছে। তার ফলে' আজ শুধু বসে কপাল চাপড়াতে হচ্ছে, এ আলোচনা অনেক করেছি। এখানে শুধু যথেষ্ট জোর দিয়ে একটা কথা বলা দরকার; যে প্রকৃতি

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা হতে হবে বন্ধুর মত। দেয়া নেয়াটা সেখানে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা হতে হবে ঠিক বন্ধুদের মত, এক তরফা নয়।

বিভিন্ন অধ্যায়ে এ কথা অনেক বলেছি যে, গাছ যদি একটি কাটা হয়, তা হলে একাধিক গাছ লাগাতে হবে। একাধিক এই কারণে, যে দু একটি গাছ যদি গরু, ছাগলে নষ্ট করে ফেলে, তার পরিপূরক অবস্থাটা রাখতে হবে। যে অক্সিজেন প্রাণীরা ব্যবহার করছে, দেখতে হবে যে অন্তত তার চেয়ে একটু বেশী অক্সিজেন, গাছ ও সমুদ্রের প্ল্যাঙ্কটন তৈরি করে। তার উপর তেল বা ক্ষতিকর আবর্জনা জমা করা বন্ধ কর করতে হবে। সর্বতোভাবে ইকোলজির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে হবে।

ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে দেখলাম, মানবপ্রেম যেমন প্রয়োজন, সভ্যতার বাঁচার জন্য, ঠিক তেমনি প্রয়োজন সদাচার ও ন্যায়ধর্ম। মাৎস্য ন্যায় যখনই এসেছে, তা সবচে আগে পেটে পুরেছে সভ্যতাকে। আর এ সম্পর্কে কথা না বাড়িয়ে, পাঠককে শুধু মনে করিয়ে দেব, রবীন্দ্রনাথের যে বাণীটির উক্তি দিয়েছিলাম। পাঠকের মনে পড়বে, রবীন্দ্রনাথ সভ্যতাকে "সদাচার" বলেছেন।

মানুষের জানা সমস্ত ইতিহাসই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস, এ কথা মার্কস এঙ্গেলস বলেছেন আর আজ কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি, ভিন্ন রাজনৈতিক মতের হলেও এ মতের বিরোধিতা করেন না। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনবাদই আবার বলেছে যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে প্রোলেটারিয়েটদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে, তখন শ্রেণীহীন সমাজের জন্ম হবে। যদিও এই রাজনৈতিক বিবর্তনের ধারা, কয়েকটি পৃথিবীর কয়েকটি রাজনৈতিক দলই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেছে, তবু আজ বিশ্বজুড়ে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে সব মানুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে যদি সংগ্রাম চলতে থাকে, তা হলে সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিযে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই যে মানুষেরই সামান্য বিজ্ঞান চেতনা আছে, তিনিই বলবেন যে অচিরে শ্রেণী সংগ্রামের শেষ হওয়া প্রয়োজন। একদল লোক বলেন যে, আর শ্রেণী সংগ্রাম নয়। এবার শ্রেণীসহযোগীতা। কি করে তা সম্ভব, সে বিষয়ে কারো বক্তব্যই পরিষ্কার নয়; তবু শ্রেণী সংগ্রামের পরবর্তি শ্রেণীহীন সমাজ বিন্যাসে পৌছন দরকার এ ব্যাপারে সবাই একমত।

সভ্যতার মূলে সর্বমানবের একীভবন। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতা বা অনন্বয়, দূর না হলে একীভবন সম্ভব নয়। একীভবন সম্ভব করার জন্য, মানব পরিবারে অন্বয় আনতে, আজ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই সচেষ্ট। তাই বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্র বিচ্ছিন্নতা নিয়ে অজস্র গবেষণা হয়েছে, অগুণতি বই বের হয়েছে। আমাদের বাংলায় ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর "বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যত" বইটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। অবশ্য অন্য অনেক ব্যাপারের মত মার্কসই এ ব্যাপারেও পুরোধা। মার্কসের বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করেছি, কেমন করে তার নিজেরই হাতের সামগ্রিক শিল্পসৃষ্টি থেকে, লাভের সিংহভাগ থেকে, জীবনের নিম্নতম উপভোগের মান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ক্রমশঃ মানুষের বিচ্ছিন্নতা মারাত্মক হয়ে ওঠে। আজ মানব সমাজকে বাঁচাতে হলে অন্বয় সাধন করতেই হবে।

মানব সভ্যতাকে এক মানবসভ্যতা করতে হলে আগেকার দিনে মনে করা হত যে, সারা পৃথিবী জুড়ে একটি ভাষা হওয়া দরকার। এর জন্য একটি বিশ্বজনীন ভাষা বানাবারও চেষ্টা কম হয় নি। স্প্যানিস ভাষা অবলম্বন করে, এসপ্যারান্টো বিশ্বব্যাপী একটি ভাষা আন্দোলন হিসাবে দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া মাত্র ৮৫০টি শব্দ, সহজ বানান ও ব্যাকরণ নিয়ে "বেসিক ইংলিস" বিশ্বভাষা হবার দাবী জানিয়েছে। যদিও আজ ইংরেজি খুবই সার্বজনীন ভাষা, তবু কোন স্বীকৃত বিশ্বভাষার জন্ম হয় নি। আর মনে হয় এই গতি আর মাসমিডিয়ার যুগে তার প্রয়োজনও নেই। জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী, ফরাসী, রুশ, চীনা ও স্প্যানিশ ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে; যখন কেউ বক্তৃতা করছে, তখনই তা অন্য ভাষায় হেডফোন লাগিয়ে শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া গণিতের ভাষা তো আন্তর্জাতিক, আর বিজ্ঞানের ভাষাও প্রায় তাই। তাই ভাষার সমস্যাটা বড় হওয়া উচিত নয়। যদিও সম্পদহীন ছোট ছোট ভাষা নিয়ে আমাদের দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নেহাৎ মূর্খ বলেই মারপিট করে যাচ্ছে।

ভাষার পরে ধর্মের কথা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রতিটি ধর্মকে কেন্দ্র করে, বিরাট বিরাট সভ্যতা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে পৃথিবী জুড়ে। সেই সব সভ্যতা, আড়াই হাজার, দু হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক পতন-অভ্যুদয়ের মাঝখান দিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু দেখা যায়, এই চারিটি ধর্মের প্রেরণাজাত যে সভ্যতাগুলি, তারা আজও টিকে আছে। মূল কাঠামোর

পরিবর্তন হয়ত হয়েছে। আজকের জগতে বেঁচে আছে এমন সব সভ্যতার উপরেই পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব পড়েছে। তারই প্রভাবিত অন্য সভ্যতাগুলিরও চেহারা একটু একটু বদলে যাচ্ছে। ক্রমে দেখা যাচ্ছে, সংস্কৃতি-গত ও ধর্মগত কিছু, আর ভাষা ও প্রত্নতাত্ত্বিক কিছু বিশেষত্ব বাদ দিয়ে, বিশ্ব-ব্যাপী মানব সভ্যতার চেহারাটা এক হয়ে উঠছে। একই ধরনের টেকনোলজি ঘেঁষা শিক্ষা পাচ্ছে সকলে। তাদের যানবাহন, সংবাদপত্র সিনেমা, এমন কি ঘরের ফার্ণিচার, ইন্টিরিয়ার ডেকরেশান পর্যন্ত, এক জাতের। ধর্মীয় ব্যাপার শুধু বিয়ে উৎসব এগুলিতেই রয়েছে।

আজকে জাগতিক সভ্যতার চেহারাটা যখন এইরকম, তখন একদল চিন্তা-শীল ব্যক্তি বলছেন যে বর্তমান সঙ্কট থেকে যদি মানব সভ্যতাকে বাঁচতে হয়, তবে তার সন্ধান দিতে পারে ধর্মই। এই প্রেরণার বশবর্তি হয়ে দেখা যাচ্ছে, অনেকে নতুন করে আবার ধর্মের দিকে ঝুঁকছে। কিন্তু এ ধর্ম কোন ধর্ম? এ তো মহাজীবনের ধর্ম। এ ধর্মের দেবতা বিশ্বমানব। এর মন্ত্র প্রেম। কিন্তু এ ধর্মের সাধনায় আজো কি আত্মনিয়োগ করেছে মানবজাতি?

উপরের দশ পনেরোটি প্যারাগ্রাফে, সভ্যতাকে বাঁচাতে হলে কি কি করণীয়ের কথা ইতিহাসে পাই, তাই আলোচনা করলাম। কিন্তু বর্তমান মানব সভ্যতার সঙ্কট অতীতের অজানা। তাই উপরোক্ত করণীয়গুলি হয়ত সাহায্য কিছু কিছু করতে পারে, কিন্তু তাই একেবারে শেষ কথা, বা সব কথা নয়। এ সম্পর্কে অলোকপাত করবার মত উপযুক্ততা যে বর্তমান লেখকের নেই; এ বিষয়ে লেখক সচেতন। তবু আজ সারা পৃথিবী জুড়ে, যথোপযুক্ত সংখ্যায় না হলেও বেশ কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি তো এ ব্যাপারে ভাবতে সুরু করেছেন। তাঁদের সঙ্গে আমরাও চাইছি তাঁদের কাজে, তাঁদের চিন্তায় যোগ দিতে।

বর্তমান সঙ্কট মুহূর্তে, আমাদের প্রচলিত চিন্তার হয়ত একটু হের ফের করতে হবে। বাঁচবার খাতিরেই এর প্রয়োজন। এই গ্রন্থে আমরা শুধু সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ মাত্র করার সাধ্য রাখি। তার বেশী নয়। তবে একটিমাত্র পরমাণু ভেঙ্গে, তার ভিতরের একটি কণিকা, একটা চেন রিঅ্যাকশানের সূচনা করে। সেইটুকুই মাত্র আশা।

মানবজাতি এক ও অবিচ্ছেদ্য। জানি না, আর কোন কথা এতবার বলা হয়েছে কি না? কিন্তু এতবার বলা, এত লেখা সত্ত্বেও, কথাটা শুধুই কথা হয়ে

রয়েছে। তা আজও জীবনের সত্য হয়ে তো কই দাঁড়ায় নি। তার কারণ কি? মানুষের সমান অধিকারের কথা যখন বলি, তখন নিম্নতম তিনটি ক্ষেত্রে যে এই অধিকার দিতে হবে তা ভাবি না। এই তিনটি নিম্নতম ক্ষেত্র হল, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক। হয়ত তথাকথিত হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দেয়া হল, বিরাট উৎসব অনুষ্ঠান করে: কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাদের পেটে ভাত জুটছে কি না, এটা আমরা ইচ্ছা করেই, নিজেদের সুবিধার্থেই ভুলে থাকব। কারণ, অর্থনীতির সমীকরণটা এমনই, যে ওই দরিদ্র লোকটার যদি একটু টাকা-পয়সা, সুযোগ-সুবিধা বাড়ে: তাতে আমার একটু কম পড়ে যায়। অবশ্য এই সমীকরণই যে একমাত্র সমীকরণ তা নয়। তবে বর্তমানে এইটাই আমার সুবিধাজনক সমীকরণ। তাই এটা আমারা ছাড়তে চাইছি না।

এটা তো একটা সামাজিক অধিকারের কথাই বললাম, একটা উদাহরণ হিসাবে, এখন রাজনৈতিক অধিকার, ভোটাধিকারে কথা ধরা যাক। আমরা বলব, কেন সমস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের তো ভোটাধিকার দেয়া হয়েছে। জনগণই নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের শাসন করছে না? কিন্তু আমরা নিজেদের সুবিধার জন্যই বলছি না, যে ভোট দেবে সে লোকটার পেটে ভাত নেই, কোন জ্ঞানও নেই। না থাকার ঐ সুযোগটা আমি নিজের স্বার্থে ব্যবহারও করতে পারি। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সর্বাগ্রে অর্থনৈতিক, তারপর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমতা—শুধু সমানাধিকার নয়—প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যত কথাই বলি, আর যা করব বলেই ভাবি, সবই শুধু কথার কথা।

প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস ছিল মন্ত্রে। তারপর আমরা সেই প্রাচীনত্ব পার হয়েছি, সেটা একটা কিছু দেখিয়ে আমাদের আধুনিকত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে বলি, যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ প্রাচীনদের মত, আর মন্ত্রে বিশ্বাস করি না। কিন্তু এটাও আমাদের সেই কথার কথাই। আজো আমরা মন্ত্রমুগ্ধই, তবে মন্ত্রের নামটা বদলে হয়েছে, শ্লোগান। লাগসই গোছের শ্লোগানের জোরে আজকের মানুষকে অনেক কিছুই করিয়ে নেয়া যায়, আর তা হচ্ছেও। সুতরাং আজকে মানব জাতির ভবিষ্যতকে, মানব সভ্যতাকে বাচানর জন্য, যদি একটি শ্লোগানের কথা—মন্ত্রের কথা—ভাবা হয়, তাই হবে বোধ হয় সব চে সমীচিন কাজ। সেই

কথাটি, সেই মন্ত্রটি, সেই স্লোগানটি, হল ভালবাসা। আচ্ছা, ভালবাসা কি বর্তমান মানুষের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে ?

জানিনা কথাটি জার্মান ভাষাতে আগে থেকে ছিল কিনা ? উচ্চারিত কথাটি বাংলা হরফেই দি—উনগ্রীসিয়ান হাইপোকণ্ড্রিয়াক. অগ্রীকসুলভ ক্ষীণচিত্ত কথাটি এক জার্মান মহাকবি, তাঁর সমসাময়িকদের সম্পর্কে বলেছিলেন। বিশ্বদ্রষ্টা এই ঋষি কবি, কথাটা মোটেই হালকা ভাবে বলেন নি। তাই এই কথাটার সারবত্তা আজ আমরা পদে পদে অনুভব করি। গ্রীকদের, আমরা সে যুগে দেখিনি। তাদের সৃষ্টি আমাদের কাছে ভাস্কর্যে, শিল্পে, মহাকাব্য নাটকে ধরা রয়েছে। কি দেখি আমরা সেখানে ? গ্রীক নাটকের চরিত্রদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ক্রোধ, প্রেম সবই যেন বিরাট আকারের। আমরাও রাগ করি ; কিন্তু একিলিসের ক্রোধ, তা যেন এপিক ডাইমেনশানের। এমনি বিরাট আকারের যেন সমস্ত কিছুই। প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম, ভাইয়ের উপর বোনের ভালবাসা, সবই যেন গ্রীক মূর্তিগুলির মত বলিষ্ঠ, বিশাল।

সে যুগের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ধরা যাক না সেক্সপীয়ারের চরিত্রগুলি। রোমিও ও জুলিয়েটের প্রেম, শেষ হক না তার শেষ পরমতম ট্রাজেডিতে, কি অসাধারণ গভীরতা তার। এমনি গভীর ভাবে ওমনি নিবিড় ভালবাসা, বুঝি আজ চলে যেতে বসেছে। আজ আবার তাই নতুন করে সেই গভীর ভালবাসায়, পতি-পত্নীকে, ভাই-ভাইকে, মানুষ-মানুষকে, এক প্রাণ করে তুলুক।

ইঙ্গিতটুকু করলাম। কিন্তু কি ভাবে বিশ্বব্যাপী ভালবাসার এই মন্দাকিনীকে নামানো যাবে ? আজ এই প্রেমধারা নামাতে হলে, কোন একক ভগীরথের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সে কাজে নামতে হবে সকলকেই। সে কাজে লাগাতে হবে শিল্প, সাহিত্য, কবিতা, সব কিছুকেই। আমাদের সিনেমা, সংবাদপত্র, রেডিও টেলিভিশান, ইত্যাদি সব মাস মিডিয়ার মাধ্যমগুলিকে এই ভালবাসার গঙ্গাকে নামিয়ে আনার জন্য ভগীরথ হতে হবে। আজ আমাদের মাস মিডিয়াগুলি কি করছে ? সিনেমার কথাই ধরা যাক। আজকের সিনেমায় আমরা কি দেখি ? অবশ্যই একটা চলনসই গোছের মামুলি প্রেমের গল্প থাকে। কিন্তু সেটা পরিবেশন করা হয়, প্রচুর মারপিট, অর্থাৎ ক্রাইম ও সেক্সের মাধ্যমে। ফলে, এগুলোই বাড়ছে আর কমে যাচ্ছে বলিষ্ঠ ভালবাসা। এই জায়গায় অবক্ষয়কে

মেরামত করবার জন্য, উঠেছে আজ এই ভালোবাসার কথা। এমনি করে আমাদের সব চিন্তা, সব সৃষ্টি হয়ে উঠুক নতুন যুগের ভগীরথ।

এবার আসছি পৃথিবীর সম্পদের কথায়। সম্পদ সম্পর্কে এতদিন আমাদের যে ধারণা ছিল, আজ সেটাই বদলাতে হবে। ধরা যাক আমার ঘরে যে সূর্যের আলো আসছে তার কথা। আলোটা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এটা আমি ভাবি না। সূর্যের এ আলো প্রাণী উদ্ভিদ নির্বিশেষে, যার যতটা প্রয়োজন, তারই ততটা। কিন্তু এবার ধরা যাক, আমার বাড়ীর সামনে যে জমিটা, আমার জমি বলে মনে করি তার কথা। ধরা যাক এখানে ধান উৎপন্ন হয়েছে। এই ধানকে আমি ভাবি আমার ধান বলে। আর যদি এই জমির নিচে কয়লা পাওয়া যায় আমি সেটাকে বলি কয়লা খনি, আমি নিজেকে বলি সেই খনির মালিক। যদি ওই জমির নিচে সোনা পাওয়া যায়, তা হলে গভর্নমেণ্ট ওই জমির জন্য আমাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে, গভর্নমেণ্টই জমির মালিক হয়ে যায়। সূর্যের আলোকে ঠিক যে ভাবে দেখলাম, ওই জমিটা কি তার বুকে জন্মানো ফসল, আর তার গহ্বরের কয়লা বা সোনাটাকে কিন্তু যেন ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাবে দেখছি। কিন্তু সূর্যের আলো, জমির ফসল, ভূগর্ভের কয়লা, লোহা, সোনা, সবই সম্পদ। কার এই সম্পদ? পৃথিবীর। কে এই সব সম্পদের মালিক? বিশ্বমানব। হয়ত বলতাম সমগ্র প্রাণীজগৎ। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী, সব সম্পদ তো ব্যবহার করতে পারবে না। তাই মানুষকেই বিভিন্ন ইকো-সিস্টেমের সর্বাঙ্গীন সমাঞ্জস্য রক্ষার কাজে তা নিয়োগ করতে হবে। তাই এতদিন আমরা সম্পদকে যে ভাবে দেখে এসেছি, তা আজ অচল। আজ সূর্যের আলো আবহলোকের বাতাস, সমুদ্র-নদী-হ্রদের জল ও তার শক্তি, ভূগর্ভের উত্তাপ ও যাবতীয় খনিজ পদার্থ ও জলভাণ্ডার, ভূপৃষ্ঠের উপবের, বনসম্পদ ও সম্ভাব্য কৃষি-সম্পদ সব কিছুকেই সমগ্র মানবজাতির সম্পদ বলে মনে করতে হবে।

ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত রাষ্ট্রগত, কোন রকম মালিকানারই কোন প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্ন শুধু সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রন কি ভাবে হবে? যেমন কোন মারাত্মক ওষুধ যদি থাকে, তাকে কি ভাবে, কত ডোজে, কোন প্রয়োজনে, ব্যবহার করতে হবে, তার নির্দেশ দেন চিকিৎসক। তেমনি এখানেও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, যাঁরা আবার বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের লোক, তাঁরাই উপদেশ কি নির্দেশ দেবেন। একটি উন্নত দেশেও স্বাস্থ্যসম্পদ যাতে জনসাধারণ উপভোগ করতে

পারে, তার জন্ত প্রয়োজন হয় ছোটবেলা থেকে তাদের স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেয়া। এখানে তেমনি শিক্ষা দিতে হবে, কি ভাবে সম্পদ অপচয় না করে ব্যবহার করতে হয়। ব্যাপারটা খুব প্রয়োজনীয় বলে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের এক শিল্পী আত্মীয়ের প্রচুর অর্থাগম হত, খ্যাতিও যথেষ্ট ছিল। অর্থ, খ্যাতি, এ সব জিনিসগুলো মানুষকে একটু অহোমপ্রিয়, দাম্ভিক, এ সব করে তোলে। জানি না কি ধরনের মনোবৃত্তি থেকে তিনি অকারণে, ঘরের বৈদ্যুতিক আলো কি পাখা জালিয়ে রেখে চলে যেতেন। নিভিয়ে দেয়াটাকে কৃপণতা মনে করতেন। এ ধরণের মূর্খদের জন্ত পৃথিবীর সম্পদ কি ভাবে সুব্যবহার করা যাবে তার, সে শিক্ষা অত্যাবশ্যক। এ শিক্ষা হয়ত এরা সহজে নিতে পারবে না, কিন্তু সেই যাকে বলে, মাথায় পেরেক ঠুকেও আজ এ শিক্ষা এদের মাথাতে ঢোকাতে হবে।

সম্পদের ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে, পুনর্নবীকরণের দিকেও, বলাই বাহুল্য, বিশেষজ্ঞরা নজর রাখবেন ও জনসাধারণকে সেই দিকেই শিক্ষিত করে তুলতে চাইবেন। যেমন জমি থেকে ফসল বাবদ যে নাইট্রোজেন কার্বন ইত্যাদি তুলে নেয়া হল, তা আবার সার হিসাবে জমিকে ফেরৎ দিতে হবে। এ আলোচনায় আবার পরে আসছি।

সব সম্পদ সমগ্র মানবজাতীর, একথা বলা সহজ। বড়জোর মাথার মধ্যে এ সম্পর্কে একটা থিয়োরিগত বিচিন্তাও গড়ে তোলা যায়। কিন্তু এটা যে ঘটছে এটা দেখার গ্রহণশীল মনোভাবটা কিন্তু নয়া শিক্ষায় অর্জন করতে হয়। তা ছাড়া এ প্রশ্নের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সমাজিক, জাতিতাত্বিক অনেক দিকই আছে। সে সব কিছুর কি করে সমাধান হবে তা আলোচনার জায়গা এটা নয়। তবে একটা কথা মনে হয়, আজ পর্যন্ত বিশ্বমানবকে এক জাতি বলে চিন্তা করায়, বিশ্বের সব সম্পদ সেই মানব জাতিরই সম্পদ ও তা নিয়ন্ত্রণ, বণ্টন, রক্ষা, পুনর্নবীকরণ, এ সবই যৌথভাবে করতে হবে ; এ ধরনের কিছু করায় রাজনৈতিক বাধাটা খুব বড় ছিল। কিন্তু আজ মানব সভ্যতাই, সব সম্পদ শুকিয়ে গিয়ে একেবারে শেষ হয়ে যাবে কি না, এ প্রশ্নটা বড় হয়ে, হয়ে উঠেছে মানব অস্তিত্বের প্রশ্ন। আজ প্রশ্ন হল বাঁচা না নিজেদের কোলে ঝোলটানার রাজনীতি ? নেহাৎ যদি মানবজাতি আত্মহত্যায় দলবদ্ধভাবে ব্রতী না হয়, তা হলে তাদের আত্ম-সার্বভৌমত্বের অভিমান ত্যাগ করে, এক মানবপরিবারের অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

অবশ্য একথা ঠিকই, যে ১৯৮০ বা ৮১ সালকে যদি আমরা জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্বমানব বর্ষ বলে ঘোষণা করি, অমনি সেই বছর থেকে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। কিন্তু আমাদের ভাবনাটা অন্য জায়গায়। একটু দেরী হয় যদি হক, বড় বেশী দেরী, যাকে ইংরাজীতে too late বলে, তা না হয়ে যায়।

এই বইখানির শুরু থেকে বার বার, বিভিন্ন অধ্যায়ে পুনর্ণবীকরণ, পুনরাবর্ত্তন রিসাইক্লিং (recycling), পুনর্ব্যবহার এই সব কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এই কথাগুলি প্রকৃতি নিজে যে ভাবে কাজ করে, তারই পরিচায়ক। কেন, তাই একটু বলি। ধরা যাক সমুদ্রের কথা। সমুদ্র বক্ষ থেকে জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠে মেঘ হচ্ছে। মেঘ হাওয়াতে তাড়িত হয়ে ডাঙ্গায় পাহাড়ের বুকে জমছে। ডাঙ্গার সমতলে ও পাহাড়ের কোলে সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ে ও সমতলে নদী ও খাল দিয়ে, সেই জল আবার সমুদ্রে পৌছে, আবার সেই পুনরাবর্ত্তন।

ডাঃ উইলিয়াম হার্ভি, আবিষ্কার করলেন যে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত পাম্প হয়ে ধমনীর সাহায্যে সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়ে, আবার শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। রক্তসঞ্চালন ও রক্ত পরিশ্রুত হওয়া দু কাজই এই আবর্ত্তনের মাধ্যমে হয়। তা ছাড়াও প্রকৃতির সর্বত্রই দেখি এমনি আবর্ত্তন। এমনকি এই মহাবিশ্বের সূর্য-তারকা, গ্রহ-উপগ্রহ, এদের জন্ম মৃত্যুতেও প্রকৃতির কাজটি পুনরাবর্ত্তনমূলক। এই যদি হয় প্রকৃতির পদ্ধতি, তা হলে প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ আমরা পাচ্ছি তাও আবার পুনরাবর্ত্তন ও পুনর্ণবীকরণের মধ্যে ফেলে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করতে না পারলে, সব ফুরিয়ে যাবে। এই জন্য আমরা কোন কোন সম্পদে হাত লাগাব, আর কোনটা থাকবে রিসার্ভ, সেটা ভাল করে ঠিক করে নিতে হবে। আজকের অভিজ্ঞতা যদি আগেকার মানুষের থাকত, তা হলে পেট্রল অকারণে অপব্যবহার করে পৃথিবীকে আজকের অবস্থায় নিয়ে আসত না।

কি কি জিনিস কি উপায়ে পুনর্ণবীকরণ করা যায়, এ বইয়ে তা বলার নয়। তা ছাড়া বর্ত্তমান লেখকের সে যোগ্যতা থাকারও কথা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুনর্ণবীকরণের সেই এ্যাটিচিউড-দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা। এটা হলে, অদূর ভবিষ্যতে পুনর্ণবীকরণ কার্যক্রমই এক বৃহৎ শিল্পে, হয়ত বৃহত্তম শিল্পে পরিণত

হবে। আমরা পূর্ববর্ত্তি কোন কোন অধ্যায়ে দেখেছি ইংল্যাণ্ডে কি জাপানে এ প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। এখন তা ত্বরান্বিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের সময় নেই।

এবারে একটি ছোটদের গল্পের উল্লেখ করছি। লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর একটা মস্ত বড় বিশেষত্ব হল, যে তিনি তাঁর অনেক গল্পেই বিজ্ঞানের কথা পরিবেশন করেছেন ছোটদের জন্য। অনেক জায়গায় হয়ত এ বিজ্ঞান, সায়ান্স ফিকশান হয়ে গেছে। কিন্তু তা হক, কাঠামোতে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান চিন্তা থাকলেই হল। আলোচ্য গল্পটি পৃথিবী জুড়ে শক্তির দুর্ভিক্ষ নিয়ে। গল্পটির নায়ক, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই ঘনাদা। কিন্তু, পৃথিবীর শক্তি নিঃশেষ হয়ে এলেও তিনি খুব চিন্তিত নন। তাঁর শক্তি আমদানি হবে, পৃথিবীর বাইরে মহাবিশ্বের কোন "ব্ল্যাক হোলের" মাধ্যাকর্ষণের বিপুল শক্তি থেকে। পাঠকদের জন্য এই কিছু বিজ্ঞান, কিছু গাঁজাখুরি সায়ান্স ফিকশানের ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলি।

আমাদের সূর্যের যে আয়তন, ধরা যাক এর চে লক্ষ লক্ষ গুণ, কোটি কোটি গুণ বড় আয়তনের একটি সূর্য জন্মাল। এ রকম বিশাল আয়তনের শরীর হওয়ার জন্য, সে রকম একটি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ যে কি বিপুল হত, তা বলে শেষ করা যায় না। এই বিপুল মাধ্যাকর্ষণের ফল কি হত? উক্ত সূর্যের দেহ যে সব মৌলিক পদার্থে গঠিত, তাদের পরমাণু গুলি পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের চাপের বাইরে বার হয়ে আসতে পারত না। এটা যে শুধু থিয়োরির ব্যাপার তা নয়। মহাবিশ্বে, সেই যে গুলিকে বৈজ্ঞানিকরা ব্ল্যাক হোল বলেন, সে গুলি এই জিনিস।

গল্পটা অবশ্য গাঁজাখুরি সায়ান্স ফিকশান। কেন না, ব্ল্যাক হোলের সেই কল্পনাতীত শক্তিকে আমাদের ইচ্ছামত কাজে লাগান হল এটা তো সহজ নয়। কিন্তু বড় কথা হল, শক্তির নতুন উৎসের কথা ভাবা হচ্ছে। এই ভাবনাটা আরো বেশী করে ভাবেত হবে। সকলে মিলে ভাবতে হবে, পরস্পরের মধ্যে পূর্ণতম সহযোগীতা নিয়েই ভাবতে হবে। মানব পরিবার যখন এই ভাবনার রিলে রেস সুরু করবে তখন তাদের হাতে থাকা দরকার সেই পরম সাম্য, পরম মৈত্রী যা নতুন ইতিহাস তৈরী করবে।

শেষ কথা কে বলবে

আমাদের কথার শেষ করতেই হয়। অতি কথন বা বহুকথনের যত দোষ আমাদের থাক না কেন, তবু কোন এক জায়গায় তাও শেষ করতে হয়। শোনা যায় নিজের বহুকথন, বা বহুলিখন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছিলেন "তোমরা অনেক লেখাটাই দেখলে, কিন্তু কত যে লিখিনি তার বেলা? গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের সূচনা করতে বসে এই কথাগুলিই মনে পড়ছে। মানব সভ্যতা আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখানে চিরতরে বিলীন হবার সম্ভাবনা তার একেবারে সামনে। আবার এ থেকে বাঁচতে হলে, নতুন মোড় নিতে হবে। এ সব যদি বুঝতে হয়, এত বড় সমস্যার যদি সমাধান খুঁজতে হয়, তাহলে অনেক চিন্তা, অনেক লেখা, অনেক কথা, অনেক কাজের প্রয়োজন। সেখানে এই সামান্য লেখাটুকু কিছুই নয়। পাহাড়ের উপত্যকাভূমিতে দাঁড়িয়ে বড় রকমের কোন শব্দ করলে, তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সেই কথা মনে রেখে, বর্তমান গ্রন্থখানির কথা যদি ভাবি, তাহলে মনে হয়, এ যেন হিমালয়ের উপত্যকায় একটি পাতার ঝরে পড়ার শব্দ। তবু বোধ করি, পাতাটিও আশা করে, হিমালয়ের বুক থেকে প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনির আশা করব। হিমালয় সদৃশ সমস্যার বুকে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা প্রতিধ্বনি নয়। যে মানব পরিবারের এই সমস্যা তাদের আন্তরিকতা জাত প্রতিধ্বনি। কিন্তু তার আগে, বর্তমান লেখককে বোধ করি একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এতক্ষণ যা ভাবনা চিন্তা করা হল, তা থেকে কি মনে হয়? মানবজাতির ভবিষ্যৎ আছে কি? একটি মাত্র কথাতে যদি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তা হলে বলব,—হাঁ। আর সে বিশ্বাস যদি না থাকে, ত হলে কেন এ বইখানি লিখব? মানবজাতির ভবিষ্যৎ এখনও পুরো অন্ধকার হয়ে যায় নি। কিন্তু সে আলোটা জ্বালার পূর্ণ দায়িত্ব আজ আমাদের।

গত শতাব্দী থেকে, আমাদের বর্তমান শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত যে যুগটা ছিল, তা ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগ। প্রকৃতির ভিতরের কার্যকলাপের নিয়মনীতিগুলি; বস্তু, প্রাণী, উদ্ভিদ, এমনকি মানুষের মন পর্যন্ত বোঝার

চেষ্টায় যে বিবিধ পরীক্ষা, তা থেকে এমন জিনিস বার হয়ে এসেছে, যা অবাক করে দেবার মত, তাই মনে হয়েছে বিজ্ঞান একটা ম্যাজিকের বাক্স। আবার একটি নতুন ধরনের ম্যাজিকের বাক্স। বাক্সে হাত ঢুকিয়ে যা চাওয়া যাবে, তাই মিলবে। এটা মনে হবার কিছু কিছু কারণও বৈজ্ঞানিকরা ঘটিয়ে যাচ্ছিলেন। যেমন ধরা যাক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি ঘটনার কথা। যুদ্ধেরই কারণে বৃটেনের প্রয়োজন ছিল এসিটোন। কিন্তু তখন যে উপায়ে তা তৈরী হত, সেই কাঁচামাল মশলা ছিল শত্রুপক্ষের হাতে। এইজন্য সম্পূর্ণ সিনথেটিক বা সংশ্লেষণ মূলক উপায়ে, একবারে কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন ইত্যাদি অণুগুলিকে জোড়ে লাগিয়ে, এ্যাসিটোন তৈরির প্রয়োজন হল। বৈজ্ঞানিক বেন ওয়াইজম্যানকে অতি গোপনে এই অনুরোধ জানানো হল। তিনিও অনতিবিলম্বে করে দিলেন সিন্থেটিক এ্যাসিটোন।

এর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ফলাফল কিন্তু হল সুদূর প্রসারী। তা পাঠকের জানা আছে। ওয়াইজম্যানের ইচ্ছা অনুযায়ী, ইহুদী জাতির বাসভূমি ইজরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হল। আর বিজ্ঞানে এ রকম ঘটনা তো আর একটা নয়। সাধারণ মানুষের হাতে যদি এই রকম অলৌকিক আবিষ্কার, একটার পর একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলে, তা হলে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইনের হাতে পড়লে কি হবে?...এমনিভাবে বিজ্ঞানের যা দেবার সম্ভবনা আছে, সেই সম্ভাবনাটাকে দেখা হতে লাগল খুব বেশী বড় করে। সম্ভাবনা, সে তো ভবিষ্যতের গর্ভে। আর যেহেতু তাকে দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং তা কত বড় বা কত ছোট, তা কে বলতে পারে! তাই মানুষ ভাবে, সম্ভাবনার আকারে যা রয়েছে, আবার তা যখন বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা প্রাপ্তব্য, কাজেই তার বুঝি কিছুই অদেয় নেই। এটা অবশ্য একটা ছেলেমানুষী চিন্তা। তা ছাড়া অঙ্কশাস্ত্র, যা রয়েছে বিজ্ঞানের ভিত্তিমূলে, তার সাহায্য নিলে, সম্ভাবনারও একটা বিমূর্ত্ত মডেল পাওয়া সম্ভব। কতকটা অনুরূপ মডেলই বানাবার চেষ্টা ক্লাব অফ রোম করেছে ও সে সম্পর্কে পূর্ব অধ্যায়ে আমারা আলোচনাও করেছি। পাঠকের মনে পড়বে, বিশ্বের অনেক বৈজ্ঞানিক আবার ক্লাব অফ রোমকে, অন্তত তাঁদের প্রথম বইখানির জন্য সমালোচনা করে বলেছেন, যে এখানে সম্ভাবনাকে অনেক ছোট করে দেখা হয়েছে।

ঠিক যেমন, বিজ্ঞান মানেই সব অসম্ভবকেই পরাস্ত করার সম্ভাবনা নয়;

তেমনিই অঙ্কশাস্ত্রের মডেল হলেই, তাকে ফুল, বেলপাতা, চন্দন দিয়ে পুজো করতে হবে, এটাও কাজের কথা নয়। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, যুক্তিশাস্ত্রবিদ্ ও দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল এক জায়গায় বলেছেন, "All mathematics is tautology." অর্থাৎ অঙ্কশাস্ত্রের সব জায়গাতেই একটা কথাকে একটু ঘুরিয়ে অন্যরকম ভাবে দেখা হচ্ছে! কথাটা অনবদ্য; সত্যি এর কোন জবাব নেই। কিন্তু মানুষ মানুষ হয়ে যে উঠেছে, তাও কি এই "টটোলজির" পদ্ধতিতে নয়? শিশু দেখে ও শুনে শেখে, এইটা পুতুল, এইটা গুলি। সেটাও একরকমের টটোলজি। আবার ওয়াটার মানে জল, এও সেই একই ব্যাপার। মানুষের শিক্ষা, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুর মধ্যেই একটা কথাকে একটু নাড়াচাড়া করে অন্য ভাবে নেয়া। কিন্তু ওই নাড়াচাড়া করতে গিয়েই অনেক কিছুই ঘটে যায়। যেমন খনির ভিতরের কয়লা ও আমার উনানের কয়লা, সেই একই কয়লার একটু নাড়াচাড়া; যাকে বলতে পারি এক কয়লারই টটোলজি। এই টটোলজিসুলভ নাড়াচাড়াই মানুষের সভ্যতা। নাড়াচাড়াটা ঠিক ভাবে করলে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি; আর তা এলোমেলো হলে সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যে যায়, তাও দেখলাম ইতিহাসে বার বার।

ওই যে ঠিকভাবে কথাটি বললাম, ইংরাজীতে যাকে বলে optimum, প্রাণীতত্ত্বে এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা। গণিতে কি পদার্থবিজ্ঞানে আমাদের ঝোঁকটা হল, সব চেয়ে যা বেশী যাকে বলে maxima, আর সব চেয়ে যা কম, minima-র দিকে। কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞানে ঝোঁক যে দিকেই থাক, প্রাণীর বেঁচে থাকা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য চাই optimum। প্রাণীর সম্বন্ধে যেটা সত্য সামগ্রিক বিচারে মানুষ ও মানব সভ্যতা সম্পর্কেও ঠিক ওই কথা। সভ্যতায় যখন যেখানে চিড় খেয়েছে, সে একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে মানুষ, এই তথাকথিত অপটিমামের সামঞ্জস্যটুকু রেখে চলতে পারে নি, তাই বিপন্ন হয়েছে সভ্যতা। এই জন্যই বোধকরি বুদ্ধ দিয়েছিলেন মধ্যপন্থার নির্দেশ জৈবিক পদার্থবিদ্যার থার্মোডাইনামিকসে তাই, পাঠকের মনে থাকার কথা, এনট্রপি বা আনবিক বিশৃঙ্খলার পরিমাণ, প্রাণীকুলের জন্য একটা উপযুক্ত মাঝামাঝি বা অপটিমামে থাকতে হবে। পাঠকদের মধ্যে যাবা বিজ্ঞান জানেন না, তাঁদের মনে করিয়ে দেবার জন্য তাই পুনরাবৃত্তির হলেও বলছি যে বরফ জমার ২৭৩ ডিগ্রি নিচের যে তাপহীনতা, সেখানে এনট্রপি শূন্য! জীবন

যেমন সেখানেও অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব ১০০ ডিগ্রি কাছাকাছি গিয়ে এনট্রপি একটু বেড়ে গেলেও। তার উপরে তো কথাই নেই।

সভ্য মানুষের কিন্তু ওই যে কথাটা maxima, ওর দিকে ঝোঁকটা বেশী। এর জন্য বোধহয় আমাদের শৈশবই দায়ী। ছোটবেলায় আমরা যখন পাঁচজনের সঙ্গে খেলা করি, তখন আমাদের সবচে বড় ইচ্ছা হল, যা কিছুই করি, অন্য সবাইকে হারিয়ে, তাদের পিছনে ফেলে, আমাকে এগিয়ে যেতে হবে। ছোট-বেলা থেকে সর্বক্ষেত্রে অকারণ প্রতিযোগিতাকে আমরা আমাদের সভ্যতার জীবনদর্শন করে তুলেছি। তাই আমাদের গ্রোথরেট ক্রমাগতই বাড়িয়ে যেতে হবে। এমনকি পরিশ্রুত জল ফেলে দিয়েও আমাদের দেখাতে হবে, যে আমরা বেশী পরিশ্রুত জল ব্যবহার করি, কাজে কাজেই আমরা বেশী সভ্য।

অথচ মানুষের যাত্রা, এমন কি সভ্যতার যুগের আগের যাত্রাও সুরু হয়েছিল, প্রতিযোগিতায় নয়, সহযোগিতায়। সহযোগিতা করার অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, অন্য প্রাণীদের তুলনায়, মানুষের মধ্যে ছিল বলেই মানুষ হতে পেরেছে সভ্য। শুধু সভ্য কেন, মানুষ যা কিছু হয়ে উঠেছে, সবই সে সহযোগিতা করতে পারে বলেই অর্জন করেছে। কিন্তু তবু নিজেদের স্বার্থপরতায়, ইচ্ছা করে মানুষ এই মূল্যবোধ হারিয়ে, সহযোগিতার বদলে প্রতিযোগিতার মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে। নৃতত্ত্বের জিজ্ঞাসায় এটা আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন সভ্যতায় প্রতিযোগিতা-সহযোগিতার অনেকখানিই কমবেশী আছে। যেমন গ্রীক—রোম্যান—ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রতিযোগিতা বেশী। ভারতীয় ও চীনা সভ্যতায় তা অনেক কম। আবার ডঃ মার্গারেট মিড দেখিয়েছেন যে কোন কোন সভ্যতায়, সেগুলি বিশ্বসভ্যতা হয়ে না উঠলেও, তাদের প্রতিযোগিতার বদলে সবটাই প্রায় সহযোগিতা।

প্রতিযোগিতার ভাবটা কম থাকলে যে সহযোগিতা ঠিক ততটাই বেশী থাকবে, এটা সত্য নয়। যেমন ভারতীয় সভ্যতায় প্রতিযোগিতাও যেমন কম, তেমনি সহযোগিতাও কম। আবার দক্ষিণ সাগরের কোন কোন দ্বীপে প্রতি-যোগিতা কি, তাই যেন তারা জানে না। বর্তমানের দুজন দিকপাল নৃতত্ত্ববিদ ডঃ এ্যাসলে মণ্টেগু ও ডঃ মার্গারেট মিড এ ব্যাপারে যে আলোকপাত করেছেন তা প্রায় অমূল্য। অজস্র গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও পুস্তকে এই দুই বিজ্ঞানী, প্রমাণ করেছেন যে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিযোগীতার নয়, সহযোগিতার

সহযোগিতার এন্টিথিসিস হিসাবে যেটুকু প্রতিযোগিতা আবশ্যক, তা ছিল খেলাধূলা ইত্যাদিতে। তাই এই ডাইলেকটিকসের ফলে, সামগ্রিক সিন্থিসিসে মানব সভ্যতার সহযোগিতাজাত শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান এইসব সুকুমার বৃত্তিগুলি গড়ে উঠেছে।

ডঃ মার্গারেট মিড, দক্ষিণ মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপের, ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মানুষের সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখিয়েছেন, যে ওই অঞ্চলে এমন ছোট দ্বীপও আছে যেখানের মানুষরা সহযোগিতা জানে না বললেই হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সহযোগিতা জানে না যারা সেই সব মানুষরা একেবারে বর্বর। আরো একটা লক্ষণীয় বিষয় হল, এইসব বর্বর মানুষদের সংখ্যা আজ এত কম হয়ে গেছে, যে আজ আমেরিকা সাহায্য করেও তাদের আসন্ন বিলুপ্তি রোধ করতে পারছে না। এ থেকে বোঝা যায়, যে সব জাতের মানুষ সহযোগিতা করতে শেখে নি, তারা সভ্যতাই সৃষ্টি করতে পারে নি, ও তারা অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

শেষ করতে গিয়ে, সহযোগিতার কথা বললাম, তার কারণ আজ মানব সভ্যতা এমন এক সন্ধিক্ষণে উপনীত, যে এক নতুন পর্যায়ের সহযোগিতা ভিন্ন মানব সভ্যতাকে বাঁচান অসম্ভব। এতদিন আমরা যে সহযোগিতার কথা জেনে ও শুনে এসেছি, তা থেকে ভিন্ন, এ সহযোগিতাকে হতে হবে আরো অনেক ব্যাপক, আরো অনেক গভীর, অনেক আন্তরিক। এই নতুন সহযোগিতার নতুন বর্ণমালা আজ মানুষকে নতুন করে শিখতে হবে।

সমস্ত মানুষকে এক মানব পরিবারভুক্ত মনে করে, সহযোগিতাটা অবশ্য সুরু করতে হবে সর্বক্ষেত্রে। তবু যদি একটা পূর্বাপরতা বা প্রায়োরিটির কথা ভাবি, তা হলে কোন ক্ষেত্রটির উল্লেখ করতে হবে প্রথমে? কথাটা বলতে গিয়ে ১৯৭৯ সালের শেষের দিকে প্রকাশিত ক্লাব অফ রোমের একটি রিপোর্টের কথা মনে পড়ছে। বইটি "Energy: The Count Down": Pergamon Press: 1979. পাঠককে বইটির নামটাই লক্ষ্য করতে বলছি। ক্লাব অফ রোমের মত প্রতিষ্ঠান, শক্তিকে প্রথম স্থান দিলেন। বোঝা শক্ত নয় সূর্য, যে সূর্যে জড় বস্তু হাইড্রোজেন, শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তারই দেহের অংশবিশেষ এই পৃথিবী আর মানুষ সভ্যতা সব। কাজেই শক্তিটা প্রথম।

এই বইখানিতেই দেখানো হয়েছে, যে সূর্যের মডেলে হাইড্রোজেন ফিউশানে

শক্তি পেতে পেতে ২০২৫ সালের কম নয়। আবার তাও যদি সম্ভব হয়, তা হলে তার একটি কি বড় জোর দুটি প্ল্যান্ট, সারা বিশ্বে ওই সময়ের মধ্যে হয়ত হয়ে উঠবে। তা হলে? তা হলে সৌরশক্তির উপরই নির্ভরতা বাড়াতে হয়। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে প্রচুর সূর্যালোক থাকায়, এ সব দেশে তা ব্যবহার করা হক। জমিয়ে খুব কমই রাখা যাচ্ছে বলে সৌরশক্তির একটা অসুবিধা, তা দূর করার জন্য ক্যাডমিয়াম বা অন্য সেমিকণ্ডাকটারের কাজ—যার আলোচনা পূর্ব অধ্যায়ে করেছি—সেগুলো পুরাদমে চলতে থাকুক। এই সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে, সমাজ ও সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্ত্তনের কাজ। এরও চার পাঁচটি পরস্পর বিরোধী মডেল রয়েছে। দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার অধ্যায় গুলিতে, এগুলির কিছু আলোচনা করেছি। আজ এই দুর্দিনে, মতবাদগুলির মধ্যেও কতটা সহযোগিতা করা যায় তাও দেখতে হবে। পাঠক বুঝতে পারছেন এর মধ্যে আমাদের পূর্বালোচিত জিরো গ্রোথরেট, থেকে সাম্যবাদ সবই আসছে। কিন্তু ঐ আলোচনাগুলি বিস্তারিত ভাবে করা হয়েছে, তাই এখানে তার পুনরাবৃত্তি করব না।

একটু পপুলার ভাবে লেখা পরিবেশ সংক্রান্ত একটি বইয়ের কথা বলছি। ম্যাথুস দম্পত্তির (ব্রেন ও পলিন) লেখা বইটির নাম, "Happily Ever After : People and World Problems." পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে এই বইটিতে যে দুটি কার্টুন ছবি আছে, তার উল্লেখ না করে পারছি না। এর মধ্যে একখানি কার্টুনে দেখা যাচ্ছে যে একপাশে, ম্যাপ আঁকা একটি গোল বল, পৃথিবী জলছে, আর একদিকে দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ভগবান বলছেন, "রবিবারে বিশ্রাম না করে, ঘর কি করে রক্ষে করতে হয়, সেটাই ওদের শেখালে হত।" অন্য কার্টুনটিতে আছে দুটি উটপাখী। তার মধ্যে একটি পাখীর চোখ দুটি বাঁধা। চোখ বাঁধা পাখীটি অন্যটিকে বলছে, "এতে একটা সুবিধে; বালিতে মাথা গোঁজার পোকা বোকা ইচ্ছেটা আর হয় না।"

কার্টুন দুটির সম্পর্কে কোন মন্তব্যের প্রয়োজন হয় না। মানবজাতীর বর্ত্তমান অবস্থাটা এ দুটি কার্টুনে অনবদ্য ভাবে দেখান হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি পেতে হবে তো। সেটা কি করে পাবে? কি করে পাবে, সেই মহৌষধ? একজনের পক্ষে এক কথায় বলে দেয়া সম্ভব নয়। তবে আজ যদি মানব পরিবার "করবই" বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে, আর সবরকম ভেদ

বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসে এখনই, তাতে যদি কিছু হয়। এ সম্পর্কে বৃটেনের মহামান্য প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অফ এডিনবরা একটি বক্তৃতায় যা বলেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন, "In fact the crux of the modern human problem is to achive an organisation in government as well as in industry commerce and defence services which allows the human beings involved to co-operate with greatest efficiency and with the least friction." H. R. H. The Prince Philip: The Environmental Revolution: Andre Deutshe Limited: কথাটা অবশ্য সেই মানব পরিবারের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার কথা, তবু তা মহামান্য প্রিন্স ফিলিপ বললে, অন্ততঃ বৃটিশ কমনওয়েলথের মানুষরা যদি তাতে কান দেয়।

মানুষ যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার অর্জন করেছিল, তখন সেই অধিকারের সঙ্গে অলিখিত হলেও আরো কয়েকটি অধিকারও তার ছিল। এ গুলি হল পরিচ্ছন্ন বাতাস ও আবহাওয়া, শান্তি ইত্যাদি। ব্যক্তি মানুষ লোভে আত্মপ্রচারে, পরশ্রীকাতরতায় আজ যে ভাবে সেই অধিকারের অপব্যবহার করছে, তার ফলে আজ তার সে অধিকার বিলুপ্ত হওয়া উচিত। আজ সেই অধিকার ব্যক্তি মনুষ্যেরই সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সমগ্র মানব জাতির উপরে বর্তানো আবশ্যক। এ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নয়। এ হল সর্বমানবের সহজ স্বাভাবিক সামাজিক লজিক। পৃথিবীর সব সম্পদের অধিকার, আজ যদি সমস্ত মানুষেও উপরে বর্তায়, তা হলে সেই মানব পরিবারের একজন হিসাবে ব্যক্তিগত মানুষের কোন ক্ষতি তো দূরের কথা, বরং আখেরে লাভই হবে। শুধু হয়ত স্বেচ্ছতন্ত্রী ব্যক্তি মানুষ, মানব সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। সেটা ভালই হবে, খারাপ নয়।

একটা কথা আছে, যে মানুষ যখন ছোট থাকে, তখন সময় যেন চলতেই চায় না, আর যখন বুড়ো হয়, তখন সময়ের গতি হয়ে ওঠে যেন বিদ্যুতের মত। সময়ের গতি চিরকাল সেই একই, কিন্তু তবু এই উপলব্ধির যে তারতম্য ঘটে, তা হয় আমাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে। আজ মানব সভ্যতা যেখানে এসে হাজির হয়েছে, সেখানে সময়ই যেন তার বিরুদ্ধে। এ কথাটা আমার কথা নয়। এ কথা ক্লাব অফ রোমের। তাঁরা একটি উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে ধরা

যাক, ২০২৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ, বিশ্বমানব অনেক কষ্ট ও চেষ্টা করে, ২০০০ সালে তার যতটা শক্তি ব্যবহার করার কথা ছিল, ততটুকুই ব্যবহার করল। এতে তার পঁচিশ বছর মোট লাভ হল। কিন্তু তবু পরবর্তি পঞ্চাশ বছরের হিসাব যদি ধরা যায়, তা হলে আমাদের যে শক্তির প্রয়োজন, তা হবে ১৯৫০ থেকে ৭৫ সালে ব্যবহার বা খরচ করা শক্তির পাঁচগুণ। তবু যে চেষ্টার কথা বলা হল, তার উপযুক্ত হতে হলেই মানুষের একটা নতুন বিবর্ত্তন হতে হবে।

কিছু দিন থেকে, মানুষের আর কোন বিবর্ত্তন হবে কি না, আর হলেও তা কোন দিকে, এটাই ছিল আলোচ্য। জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ও জীববিজ্ঞানী, যেমন জুলিয়ান হাক্সলি, জে—বি—এস্ হলডেন, এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। বিবর্ত্তনটা শারীরিক দিকে যে হবে না এটা বোঝা যায়। আর এ বিষয়ে তাঁরাও একমত। কাজেই মানুষের পরবর্ত্তি বিবর্ত্তন হতে হবে তার চিন্তায়। তাও যে ঠিক কোন পথে, এটার সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করাটা বেশ দুরূহ ছিল। কিন্তু আজ তা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে উঠেছে। আজ মনে হয়, তা একটা অচিন্ত্যপূর্ব সহযোগিতায় মানবসমাজকে গাঁথার পথে চলেছে। আর সেই মানবসমাজ যাতে বাইরের সম্পদের নিম্নতম ব্যবহার করে, তাদের অন্তরের সম্পদেই তাদের সভ্যতা চালু রাখে তা করবে। ক্লাব অফ রোম যে কতকটা এই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন, এটা উপরের প্যারাগ্রাফে এই মাত্র আলোচনা করেছি।

যে অচিন্ত্যপূর্ব সহযোগিতার কথা কথা বললাম, তার একটু আলোচনা করা দরকার। ধরা যাক মৌমাছি বা পিপিলিকা সমাজের কথা। প্রাণী হিসাবে এরা ছিল মানুষের অগ্রজন্মা। প্রকৃতির হাতে এদেরও বিবর্ত্তন ঘটেছে। কিন্তু এদের লাইনটা ভিন্ন। বিবর্ত্তন এদের এমন দিকে ঘটল যে, বাসা করা, খাদ্য সংগ্রহ, জাতিগত রক্ষণাবেক্ষণ, প্রজনন, সন্তান পালন, এইরকম প্রতিটি আলাদা কাজের জন্য সেই কাজের একদল স্পেশালিষ্ট প্রাণী বিবর্ত্তিত হল। তাই প্রাণীবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, যে মানুষ বা অনুরূপ প্রাণীর যেমন দেহের এক একটি অঙ্গ হাত, পা, মস্তিষ্ক জরায়ু, ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গ এক একটি বিশেষ ধরণের কাজ করে, তেমনি মৌমাছি বা পিঁপড়েদের বিভিন্ন কর্মগোষ্ঠি এক একটি অঙ্গ বিশেষ। ঠিক কাজ হক বা না হক, এদের সহযোগীতার কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। আজ অনুরূপ ভাবে জীবনের গভীর স্তর পর্যন্ত শিকড় পৌছন সহযোগীতাতেই মানুষের সভ্যতা বাঁচতে পারে।

মানুষকে পিঁপড়ে বা মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, এর জন্তেই অনেকে খুব বিরক্ত হবেন। যদিও এই পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ প্রাণীকুলের মধ্যেই মানুষও ওমনিই একটি প্রাণী, তবু আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা, যে মানুষ যেন ভগবানের কাছে থেকে বিশেষ সনদ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেছে। কিন্তু অবতীর্ণ যেখান থেকেই হক না কেন, আজ মানুষ নিজেদের এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে, যে তার সভ্যতা তো বটেই, তার নিজের অস্তিত্বই হয়ত বিপন্ন ভুল বোঝার জন্য, এ বিপদ হয়ত মানুষ নিজেই ডেকে এনেছে। এটা কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতাও রয়েছে শুধু তারই হাতে। কিন্তু দেরী করলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই দেরী করার উপায় নেই এ যেন সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ানো যাকে ইংরাজিতে বলে, racing against time.

এই মাত্র যে উদাহরণটি দিয়ে কথাগুলি বললাম, তাতে স্বাভাবিক ভাবেই বিকেন্দ্রীকরণের কথাটাও এসে যায়। শুধু শক্তি উৎপাদন, ও শক্তি ব্যবহারের প্রশ্নটাই নয়, মানব সমাজের পুরা নিয়ন্ত্রণটাই আরো বিকেন্দ্রীকৃত হবে কি না? এটাই প্রশ্ন। গান্ধিজি ক্ষমতা, উৎপাদন, বণ্টন সবেরই বিকেন্দ্রীকরণ চাইতেন। কিন্তু তাঁর শিষ্যরাই অনেকে এর বিরোধিতা করতেন। ১৯৭৫ সালে সুইডেনে Swedish Secretariat for Future Studies, প্রধানতঃ শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের উপরেই একটি রিপোর্টে বলেছেন, যে বিকেন্দ্রীকরণকে সফল ভাবে কাজে লাগাতে হলে জনসাধারণের মধ্যে যে গভীর শৃঙ্খলা প্রয়োজন, সেটা সহজে বা নিজে থেকে আসা খুবই শক্ত, যদি সুইডেনের মত দেশে এই অবস্থা হয়, তা হলে অন্য দেশের অবস্থাটা কি হবে? এখানে গান্ধিজির সম্পর্কেও একটা কথা বলা যায়। মানুষের উপর তাঁর বিশ্বাস এত বেশী ছিল, যে তিনি মনে করতেন যে এ শৃঙ্খলা ভিতর থেকেই আসবে।

যাই হক, আমাদের ভবিষ্যত পদক্ষেপে, বিকেন্দ্রীকরণ যে একটা বড় প্রশ্ন এটা মনে রাখতে হবে। আর শৃঙ্খলা বজায় রেখে বিকেন্দ্রিকরণ কি ভাবে করা হবে এটা এখনই ভাবা প্রয়োজন। শৃঙ্খলার কথাটা উঠল বলে, এ সম্পর্কে একটু বলে নেয়া দরকার। শৃঙ্খলা আর স্বাধীনতা, যেন পরস্পর বিরোধী, এ রকম একটা ধারনা চলে আসছে। আজ যখন মানব সভ্যতার এক চরম সঙ্কটে, তখন শৃঙ্খলাবোধ যেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বিপন্ন দেখতে পাচ্ছি, অন্ততঃ কিছু তরুণদের মধ্যে। আজকের পরিস্থিতিতে এটা যে কত মারাত্মক, তা আর

বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সামগ্রিক ভাবে শৃঙ্খলাবোধ জাগাতে কি করা দরকার, এ সম্পর্কে যাঁরা বিশেষজ্ঞ তাঁদের তা ভাবতে হবে। আনবিক শক্তির মত যদি কোন শক্তির ব্যবহার হয়, তা হলে তা স্বাভাবিক কারণেই বিকেন্দ্রিক হতে পারবে না। আনবিক জ্ঞান, তার নিয়ন্ত্রণ, রেডিয়েশান বিকিরণ সমস্যা ও বিকিরক বস্তু কি ভাবে কোথায় রাখলে মানবজাতির বিপদ এড়ানো যাবে, এ সব সমস্যা বিকেন্দ্রিক ভাবে সমাধান করা সম্ভব নয়। কাজে কাজেই যদি আনবিক শক্তির ব্যবহার ব্যাপক হয়ে ওঠে, তার আনুষঙ্গিক সামাজিক পরিবর্ত্তনও ব্যাপক হবে। কিন্তু পাঠকের মনে পড়বে, পূর্ব অধ্যায়ে এর অসুবিধা-গুলির উল্লেখ করেছি। কাজেই আনবিক শক্তির পথই একমাত্র কাম্য পথ নয়।

আমরা এই বইখানির বিভিন্ন জায়গায়, আন্তর্জাতিক সহযোগীতা ও বিশ্ব-জগতে এক নতুন সমাধিকার ও সাম্যের অর্থনীতি চালু করতে হবে: এ কথা বলেছি। কথাটা এত প্রয়োজন, যে তা এক বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত করার জন্য, ভাষান্তর করে পুনরুক্তিও করেছি। বিদগ্ধ পাঠক, পুনরুক্তির কারণটা উপলব্ধি করবেন। লেখকের কথায় না বলে ক্লাব অফ রোমের কথাতেই বলি, "For each nations and group of nations, recognising these conditions and accepting the support is equivalent to accepting an indispensible compromise between essential finalities and vital interests, on the one hand, and ulterior motives, prejudices, positions and relations of a political nature on the other. It probably means advancing towards a new international economic order. Such a desirable and far reaching transformation of all international relations has generated opposition between those who consider it to be possible and those who feel it as an illusion on a scale only equally by the vast change involved."

১৯৭৬ সালে একজন আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী, এমোরি লভিনস একটি প্রবন্ধে "Soff energy"—বাংলায় যাকে হয়ত বলা চলে, "নরম শক্তি"—শব্দটি ব্যবহার করেন। সৌরশক্তি বোঝাতেই অবশ্য তিনি শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

পূর্ববর্তি অধ্যায়ে আমরা দেখছি অধ্যাপক ব্যারি কমনারও সৌরশক্তির একজন বড় প্রবক্তা। তবু এমোরির নাম করতে হয়, শুধু নরমশক্তি শব্দটি ব্যবহার করার জন্য। যে শক্তির জন্য মাটি খুঁড়তে হয় না, পরিষ্কার করার পাট নেই, জ্বালাতে হয় না, ব্যবহারের পর ব্যবহার করা জিনিস ফেলব কোথায় ভাবতে হয় না, তাকে যদি নরম শক্তি না বলব তো, কোন জিনিসকে বলব? কিন্তু এখানে কথাটা তুললাম, অন্য একটা কারণে। এই শব্দটি ব্যবহার হওয়ায় শক্তি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গিরই বদল হয়ে গেল। এইটাই দরকার। এইটাই যেন কিছুতে হয়ে উঠছে না। নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। প্রদর্শনীতে সৌর উনান তো হরদমই দেখি। কিন্তু পাড়ার ষ্টেশনারি দোকানে কি তা কিনতে পাওয়া যাচ্ছে? অথচ এমোরি লভিনের বক্তব্য হল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সৌর শক্তির ব্যবস্থাপনা দরকার, যাতে নিজের ঘরের উত্তাপ ও ইলেকট্রিসিটিটা পাওয়া যায়।

এই তো গেল রাজনীতি। অর্থনীতির দিক থেকেও দুটি জোট। একটি সাম্যবাদী ও অপরটি ধনতান্ত্রিক। এর মধ্যে আবার চীন ধনতন্ত্রী নয়, সাম্যবাদী। তবু তারা রাশিয়ার সঙ্গে মন কষাকষি থাকায়, আমেরিকার সঙ্গে জোট বেঁধেছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিশ্ব-ব্যবস্থা খুবই জটিল। এই জটিল বিশ্বব্যবস্থাটা মাঝখানে রেখে, পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্তরে, পৃথিবীর সম্পদ, শক্তি, যা কিছু আছে, আর যা কিছু করতে হবে, এ সব সমানভাবে দেয়া নেয়া করা কি সম্ভব হবে? হবে বলে মনে হয় না। অথচ কখন সেই কাঠিন্যে বরফগলা স্থরু হবে, তার জন্য অপেক্ষা করার সময় আছে কি? তা হলে কি বা করা যাবে?

আমাদের সময় যে নেই, আর একটুও সময় নষ্ট করলে যে ক্ষতি হবে, সে ক্ষতি যে কোন যুদ্ধের চেয়ে বেশী। এত ক্ষতি সাম্যবাদও ধনতন্ত্রের করতে পারে না। না ধনতন্ত্র সাম্যবাদের। রুশ-চীন কেউ কারুরই এত ক্ষতি করতে পারবে না। দেরী করলে মানবজাতির ক্ষতি হবে। অথচ ছেলেমানুষের মত, নিজেদের আধা-কাল্পনিক, আধা-বাস্তব, বিরোধগুলো মিটিয়ে নিতে পারছি না।

বিরোধের যেটুকু বাস্তব, এক বৃহত্তর বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে তা অনায়াসে মিটিয়ে নেয়া যায়; শুধু ছেলেমানুষিটাকে দূর করতে পারলে। কিন্তু মনুষ্য-জাতির সাবালোকত্ব পেতে আর দেরী হবে কতদিন? বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের

মত, মানুষের মধ্যে যাঁরা ছিলেন পরিণত মানস, পরিণত বুদ্ধি, তাঁরা নিজেদের অজস্র লেখায় মানবজাতি ও তার নেতাদের পরিণত চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা তো আর কম করেন নি, কিন্তু কোথায় কি ? অনেক সময় দেখা যায়, একটা আদুরে, ছেলে হয়ত বুড়ো বয়স অবধি খোকা হয়েই রইল। হঠাৎ বাবা চোখে বুঝলে দেখা যায়, সেই ছেলেই যেন রাতারাতি বড় হয়ে উঠে, সব ভার, সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। মানবসমাজ যদি এ দায় কাঁধে তুলে নিতে চায়, বাধা দেবে হয়ত আত্মসর্বস্ব নেতৃত্ব। কিন্তু সে বাধাও দূর করতে হবে।

পূর্ববর্ত্তি কোন কোন অধ্যায়ে পাঠকের মনে পড়বে, আনবিক বিশৃঙ্খলার পরিমাপ, অর্থাৎ এনট্রপি বেশী হবার কথা যখন বলেছি। তখন বলেছি যে জগতে এনট্রপি সহজে বৃদ্ধি পায়, সেই জগতে সীমিত এনট্রপিতে অধিষ্ঠিত, প্রাণী ও উদ্ভিদকুল এক বিস্ময়। এর উপর আবার প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে, এনজাইম বা অনুঘটকের সাহায্যে যে অল্প তাপে আনাজিকে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা হয়: এও আর এক অতুলনীয় ব্যাপার। অনুরূপ প্রক্রিয়াতে জলা জায়গায় মিথেন গ্যাস তৈরি হয়ে, তা আলো ও উত্তাপ দিতে পারে, এ কথা আলেয়া যে দেখেছে, সেই জানে। বর্তমানে মিথেনকে কাজে লাগানোর প্ল্যান হয়েছে। খুবই ভাল কথা ; কিন্তু এহোপি বাহ্য। প্রাণের জগৎ কি আমাদের শুধু মিথেন তৈরি করতেই শেখাবে ? আর কিছু নয় ? আজ পদার্থবিদ, রাসায়নিক, উদ্ভিদ ও জীববিদ্যাবিদ, সকলকে শিখতে হবে প্রাণী জগতের কাছে। আশা করা যেতে পারে, এ জগৎ থেকে শক্তি বা যা পাব, হয়ত আবার তার পুনরাবর্তন করা সম্ভব হবে। এ কাজ সহজ হবে না ; তবু পরমাণু কিউশানের চেয়ে হয়ত সহজ হবে। টেকনিকের চে এতে হয়ত বুদ্ধি বেশী লাগবে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীদের মধ্যে বুদ্ধির অভাব আছে কি ? এর মধ্যে অনেকেই আইনস্টাইনের মত হয়ত নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বলতে পারবেন—এই আমার ল্যাবরেটারি ! পারবেনই অন্ততঃ কেউ।

স্রোডিঙ্গার থেকে সুরু করে বহু পদার্থবিদ ও রাসায়নিক, জীববিজ্ঞানে নিজেদের বিজ্ঞানকে লাগাতে ও নিজেদের বিজ্ঞানে জীববিদ্যাকে লাগাতে চেয়েছেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের উন্নতি। কিন্তু আজকের এই পূর্ণ সহ-যোগিতা মানব সভ্যতাকে বাঁচাতে পারে।

ইকোলজির অধ্যায়ে খাদ্য শৃঙ্খল সম্পর্কে অনেক কথা বলেছি। উদ্ভিদ ও

প্রাণী, বিবর্তনের স্তর অনুযায়ী, এক একটি খাদ্য শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখেছি যে মানুষ আজ বিবর্তনের যে পর্যায়ে, সেখানে তারা বিচিত্রপৌষ্টিক। তবু আজ সবুজবিপ্লব, শ্বেতবিপ্লব, এ সব সত্ত্বেও খাদ্যাভাব যেন আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সমাধানের একটি পথ অবশ্যই পরিবার পরিকল্পনা। পরিবার পরিকল্পনার উপর আজ সারা বিশ্ব জুড়ে, চরম মনোযোগ দিতে হবে। এ কথা আজ সকলেরই জানা।

তারপর যা প্রয়োজন, তা হল খাদ্য এককণাও যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করা। কত বিবিধ ও বিচিত্রভাবে খাদ্য নষ্ট হয়, তা পূর্ববর্তি এক অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। র‍্যাচেল কারসনের নীরব বসন্ত ও তার ফলে, সমগ্র বিশ্বের ইকোসিস্টেমের একটু পালটের কথা ভেবেও, খাদ্যবিজ্ঞানী বুবলাক বললেন, যে যা হবার হক ইকোলজির, উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য নষ্ট হওয়া বাঁচাতে, ডি ডি-টি ব্যবহার করে যেতেই হবে। ঠিক কোনখানে এ দুই মতের সামঞ্জস্য, ও কিভাবে খাদ্য নষ্ট হওয়া বন্ধ করা যাবে, সেটা বিজ্ঞানীদের একযোগে ভেবে ঠিক করতে হবে।

বিচিত্রপৌষ্টিক মানুষকে তার খাদ্যশৃঙ্খলে আরো নতুন নতুন খাদ্য সংযোজন করতে হবে। এ ধরনের বিপ্লব নীরবে ঘটতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় সয়াবীনের ব্যবহার তো দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছে। এমনি করে বৈজ্ঞানিকরা হয়ত আমাদের উপহার দেবেন, অনেক নতুন খাদ্য যা উৎপন্ন হবে বিবিধ ফাঙ্গাস, বীজাণু, কি সামুদ্রিক প্ল্যাঙ্কটন থেকে। এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা অতি দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে যেতে পারে, এইটাই সুবিধা। খাদ্য হিসাবে উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য যদি প্রজাতাগত কোন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রয়োজন হয়, তাও আজ বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে খুব একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

যে কথাগুলি বললাম, শুধু এই অধ্যায়ের কথাগুলি কেন, এই বইয়ে যা বলেছি, তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল মানুষদের করণীয় রয়েছে অজস্র। কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষ যারা, তাদেরও করার আছে। বিশ্বজোড়া এই নতুন বিপ্লবে সহযোগিতা করাও বড় কম কাজ নয়। তা ছাড়া ইতিহাসে কখনো কখনো এ ও হতে দেখা গেছে যে, নেতৃত্ব যথেষ্ট প্রগতিশীল না হলেও হয়ত জনগণ তাদের টেনে নিয়ে গেছে। আজকের এই এতবড় সমস্যায় জনগণকে তাও করতে হতে পারে।

বইটি শেষ করতে গিয়ে, পিছনদিকে ফিরে সেই প্রশ্নটিই করছি : তা হলে আমাদের সামনে কি? আশা? না নিরাশা? নিরাশা বলব না। আশাই। কিন্তু সে আশা দুরন্ত, রঙিন আশা নয়। এ এক সম্ভাবনা। সে সম্ভাবনাকে যদি আশা হয়ে উঠতে হয়, তা হলে তার প্রতিটি কণিকায় থাকতে হবে বহু ভেবে চিন্তে করা কাজ, বহু গবেষণা, বহু ভুল ঠিক করে নেয়া, ইত্যাদি। এসব তো গেল। আর একটি দিক মনের দিক। তার কথায় এবার আসছি। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি, হয়ত ব্যক্তিমানুষ অত্যাচারিত হয়েছে, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে কিন্তু তাঁর বাণী মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নিয়ে গেছে নবজীবনের পথে। হয়ত তখন,

"পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে?
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে আমরা তাকে অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেন না, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের
জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
তাই সে মহামৃত্যুঞ্জয়।
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।"

রবীন্দ্রনাথ : শিশুতীর্থ

তথাকথিত বস্তুতান্ত্রিকতার সুবিধায় মানুষ, ভুলে গেছে তার ধ্যান-মনন-চিন্তনের ঐশ্বর্য। দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছুরই উদ্ভব যে মননে, তা কত অনায়াসে আমরা ভুলেছি। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী, পরলোকগত মাত্র কিছুদিন আগে মানুষকে সাবধান করে দিতে বলেছিলেন যে, আজ টেকনোলজির যে উন্নতি হয়েছে, তা সম্ভব হয়েছে শুধু, তথাকথিত থিয়োরিটিক্যাল ফিসিক্স ও অন্য বিজ্ঞান যা মননের দ্বারাই লব্ধ, তা এতখানি উচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত ছিল বলেই। বিজ্ঞানও মননের ও চর্চার মধ্যেও কিন্তু প্রতিটি ক্লাসিক্যাল বিজ্ঞানী, তিনি গ্যালিলিও,

নিউটন যেই হন না কেন, তাঁদের মনের মধ্যে ছিল, মানুষের উপর কতটা ভালবাসা, তা তাঁদের জীবনী পড়ে জানা যায়। সেই একই ভালবাসার প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

"সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর ;
তার পরে ছুটি নিব।"

শুধু কয়েকটি নয় তাঁদের কল্যাণে বহু কাঁটাই দূর হয়েছে বলে দীর্ঘ দিন ধরে, সভ্য মানুষ অনেক আরাম ভোগ করে এসেছে। সেই নরম গদিতে শুয়ে আমরা ভুলে যেতে বসেছিলাম ভালবাসা। আবার মার্গারেট মিড, এ্যাসলে মোন্টেগুর মত বৈজ্ঞানিকরা মনে করিয়া দিলেন যে মানব সভ্যতা বেঁচে থাকবে, যদি মানুষের মনে থাকে, প্রেম-প্রীতি-প্রত্যয়।

শেষ